অর্গানন অব মেডিসিন
Organon of Medicine

ডি.এইচ.এম.এস

দ্বিতীয় বর্ষ

ডাঃ জে. এম. নুরুল হক

বি.এইচ.এম.এস (ঢাঃ বিঃ)

এম. এসসি ইন মাইক্রোবায়োলজি (প্রা.এ.ইউ)

১। "প্রত্যেক ক্রিয়ার একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে"-ব্যাখ্যা কর। ২০

"প্রত্যেক ক্রিয়ার একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে"-ব্যাখ্যা ঃ

সুস্থ মানবদেহে কোন ঔষধ প্রয়োগ করলে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, সে সমস্ত লক্ষণ বিশিষ্ট কোন রোগীতে ঐ ঔষধ সূক্ষ্মমাত্রার প্রয়োগ করলে রোগী আরোগ্য লাভ করে। হোমিওপ্যাথিক আরোগ্য নীতি নিউটনের গতি বিষয়ক তৃতীয় সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ নীতিটি হল প্রতিটি ক্রিয়ার একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। সুস্থ জীবনীশক্তি যদি রোগশক্তি দ্বারা আক্রান্ত হয় তা হলে জীবনীশক্তির বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং বিভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ করে, তাকে রোগ বলে। আবার সদৃশ বিধান মতে সুস্থ দেহে যদি ঔষধ প্রয়োগ করা হয় তা হলে ঔষধের রোগাৎপাদিকা শক্তি সজীব সত্তার সংস্পর্শে এসে প্রাকৃতিক রোগের অনুরূপ অথচ প্রবলতর এক কৃত্রিম রোগ সৃষ্টি করে। যেহেতু সদৃশ বিধান মতে প্রয়োগকৃত ঔষধ শক্তিশালী, তাই ঔষধ দ্বারা সৃষ্ট লক্ষণারাজিও প্রাকৃতিক রোগ লক্ষণ অপেক্ষা প্রবলতর হবে।

অতএব ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে প্রবলতর সদৃশ রোগ লক্ষণের দুর্বলতর লক্ষণগুলি বিলীন হয়ে যায়। দুর্বলতর রোগ লক্ষণসমূহ বিলীন হয়ে যাওয়ার পর জীবনীশক্তি রোগশক্তির প্রভাব মুক্ত হয় ঠিকই কিন্তু ঔষধ শক্তির প্রভাবে আচ্ছন্ন থাকে। যেহেতু ঔষধ সূক্ষ্মমাত্রায় প্রয়োগ হয় তাই এটির ক্রিয়া যদিও প্রবলতর কিন্তু ক্রিয়াকাল ক্ষণস্থায়ী। ঔষধের ক্রিয়াকাল শেষ হলেই ঔষধজাত সমস্ত লক্ষণ তিরোহিত হয় এবং জীবনীশক্তি এর প্রভাব মুক্ত হয়ে সুস্থ হয়ে উঠে।

২। আরোগ্যের পথে বাধাসমূহ লিখ। ২০

আরোগ্যের পথে বাধাসমূহ ঃ

যখন সুনির্বাচিত ঔষধ প্রয়োগের পরও রোগী আরোগ্য হয় না, তখন চিকিৎসক ব্যর্থ হন। এর কারণ আরোগ্যের পথে কিছু বাধা কাজ করে। ঔষধের সাথে খাদ্যের ও কিছু পারিপার্শ্বিক অবস্থার সম্পর্ক রয়েছে।

১। পথ্যাপথ্য - যে সব উৎস থেকে ঔষধ প্রস্তুত হয়, তা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করলে আরোগ্যের পথে বাধার সৃষ্টি হয়। যেমন- পেঁয়াজ হতে এলিয়াম সেপা ঔষধটি প্রস্তুত করা হয়, সুতরাং এলিয়াম সেপা ঔষধটি সেবনের সময় কাঁচা পেঁয়াজ গ্রহণ বন্ধ রাখতে হবে। থুজা ঔষধের ক্রিয়া নষ্ট করে চা ও পেঁয়াজ ইত্যাদি।

২। **উত্তেজক কারণ**- কিছু উত্তেজক দ্রব্য কারণ রোগের আরোগ্যতে বাধা প্রদান করে। যেমন- বিয়ার, হুইসকি, এলকোহল জাতীয় পানীয়, চা, কফি ইত্যাদি এবং বয়স, আবহাওয়া, পরিবেশ, সামাজিক অবস্থা, বংশগত প্রভাব ইত্যাদিও রোগের আরোগ্য পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

৩। পরিপোষক কারণ- কিছু পরিপোষক কারণ রোগের আরোগ্যতে বাধা প্রদান করে। যেমন- হজমে গোলযোগে অতিরিক্ত মশলাযুক্ত বা চর্বিযুক্ত খাদ্য গ্রহণ। ঠান্ডা গরমে অত্যানুভূতি রোগের ক্ষেত্রে উপযুক্ত নিষেধ না দিলে আরোগ্য পথে বাধা সৃষ্টি হয় ইত্যাদি।

৪। ধাতুগত লক্ষণ বা ধাতু প্রকৃতি- প্রকৃত আরোগ্যর জন্য রোগীকে ধাতুগত লক্ষণের উপর গুরুত্ব দিয়ে চিকিৎসা করতে হয়। অন্যথা ধাতু প্রকৃতি অনুসারে ঔষধ প্রয়োগ না করলে সহজে রোগী আরোগ্য হয় না।

৫। রোগ প্রবণতা- বিভিন্ন মায়াজম ও মিশ্র মায়াজম রোগ প্রবণতা সৃষ্টিতে সহায়তা করে, ফলে রোগারোগ্যে বাধা সৃষ্টি হয়।

প্রথম অধ্যায়

অর্গানন অব মেডিসিনের ভূমিকা

(Introduction of Organon of Medicine)

১। অর্গানন শব্দের আভিধানিক অর্থ কি?

অর্গানন শব্দের আভিধানিক অর্থ ঃ

অর্গানন (Organon) গ্রীক শব্দ। এর অর্থ অনুসন্ধান বা গবেষণা প্রণালী (Method of investigation)। গ্রীক দার্শনিক এরিস্টেটল তাঁর যুক্তি শাস্ত্রের নাম রাখেন Organon। অর্থাৎ তাঁর চিন্তার ফসল তিনি এ বইতে লিপিবদ্ধ করেন।

ডাঃ স্যামুয়েল হ্যানিম্যান হোমিওপ্যাথির নীতিমালা সম্বলিত বইটির নাম এরিস্টেটলের Organon শব্দটি একই অর্থে ব্যবহার করেছেন। অর্গাননের আভিধানিক অর্থ হল "Independent Part of body which performs special functions" অর্থাৎ দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যা সুনির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন করা।

২। অর্গানন অব মেডিসিনের সংজ্ঞা দাও।

বা, অর্গানন অব মেডিসিন বলতে কি বুঝ ?

বা হোমিওপ্যাথিতে অর্গানন অব মেডিসিনের সংজ্ঞা লিখ।

অর্গানন অব মেডিসিনের সংজ্ঞা ঃ

অর্গানন অব মেডিসিন বলতে রোগী, ঔষধের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অনুসন্ধান বা গবেষণা প্রণালীকে বুঝায়। অর্থাৎ যে চিকিৎসা পদ্ধতি সুস্থ মানবদেহে ভেষজ ও অসুস্থ দেহে ঔষধের ক্রিয়াস্থান ও ধরণ ইত্যাদি সম্পর্কে পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে বিস্তারিত তত্ত্ব জানা যায়, তাকে অর্গানন অব মেডিসিন বলে।

অথবা,

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রবর্তক ডাঃ ক্রিশ্চিয়ান ফেড্রিক স্যামুয়েল হ্যানিম্যান (Dr. Christian friedrick samuel Hahnemann) কর্তৃক প্রণীত যে গ্রন্থে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, আদর্শ আরোগ্য, চিকিৎসকের গুণাবলী, রোগের কারণ, রোগ লক্ষণ ও লক্ষণ সমষ্টি, জীবনীশক্তি, রোগ সম্বন্ধে, ঔষধ সম্বন্ধে, ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ সম্বন্ধে, সদৃশ নীতি, আরোগ্য ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও চিকিৎসা কর্ম পরিচালনা সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, তাকে অর্গানন অব মেডিসিন বলে।

অথবা,

সুস্থ মানবদেহে ভেষজ এর ক্রিয়া অর্থাৎ সৃষ্ট কৃত্রিম রোগ লক্ষণ এবং ঐ ভেষজকে ফার্মাকোপিয়া মতে ঔষধে রূপান্তরপূর্বক উক্ত সৃষ্ট কৃত্রিম রোগ লক্ষণ সদৃশ প্রাকৃতিক রোগ লক্ষণ সম্বলিত অসুস্থ দেহে সূক্ষ্মমাত্রা প্রয়োগপূর্বক আরোগ্য সাধন সম্পর্কে পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ পূর্বক অনুসন্ধান বা গবেষণার মাধ্যমে নিশ্চিত হয়ে যে সকল নির্দেশনা, উপদেশ ও কার্যধারা একটি সহজ ও সুনির্দিষ্ট নীতিতে রোগীর আরোগ্য সাধন ও তাঁর স্বাস্থ্যে পুনঃস্থাপন করে যে নির্দেশ, উপদেশ ও কার্যধারাকে সম্মিলিতভাবে অর্গানন অব মেডিসিন বলে।

অর্গানন অব মেডিসিন ডাঃ হ্যানিম্যান কর্তৃক আবিষ্কৃত হোমিওপ্যাথির চিকিৎসা বিজ্ঞান ও আরোগ্য কলা সম্বলিত একটি গ্রন্থ। যার মধ্যে হোমিওপ্যাথির যাবতীয় বিধিবিধান অত্যন্ত সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ আছে। এতে ২৯১টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ১-৭০ নং অনুচ্ছেদে চিকিৎসা বিজ্ঞান ও ৭১-২৯১ নং অনুচ্ছেদে আরোগ্য কলার যুক্তি ভিত্তিক বিশদ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছে। তাই এটির প্রথম অংশকে আরোগ্য বিজ্ঞান এবং দ্বিতীয় অংশকে আরোগ্য কলা বলা হয়।

৩। চিকিৎসাক্ষেত্রে অর্গানন অব মেডিসিন পাঠের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

অথবা, হোমিওপ্যাথিতে অর্গাননের প্রভাব আলোচনা কর। ১৭

চিকিৎসাক্ষেত্রে অর্গানন অব মেডিসিন পাঠের প্রয়োজনীয়তা ঃ

অর্গানন অব মেডিসিন ডাঃ হ্যানিম্যান কর্তৃক আবিষ্কৃত হোমিওপ্যাথির চিকিৎসা বিজ্ঞান ও আরোগ্য কলা সম্বলিত একটি গ্রন্থ। যার মধ্যে হোমিওপ্যাথির যাবতীয় বিধিবিধান অত্যন্ত সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ আছে। এতে ২৯১টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ১-৭০ নং অনুচ্ছেদে চিকিৎসা বিজ্ঞান ও ৭১-২৯১ নং অনুচ্ছেদে আরোগ্য কলার যুক্তি ভিত্তিক বিশদ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছে। তাই এটির প্রথম অংশকে আরোগ্য বিজ্ঞান এবং দ্বিতীয় অংশকে আরোগ্য কলা বলা হয়।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রবর্তক ডাঃ ফেড্রিক স্যামুয়েল হ্যানিম্যান কর্তৃক প্রণীত অর্গানন অব মেডিসিন গ্রন্থ পাঠ করলে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতিতে একজন আর্দশ চিকিৎসকের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, আদর্শ আরোগ্য, চিকিৎসকের গুণাবলী, রোগের কারণ, রোগ লক্ষণ ও লক্ষণ সমষ্টি, জীবনীশক্তি, রোগ সম্বন্ধে, ঔষধ সম্বন্ধে, ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ সম্বন্ধে, সদৃশ নীতি, আরোগ্য ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা এবং চিকিৎসা কর্ম পরিচালনা সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান অর্জিত হয় যা চিকিৎসককে সফলতার দ্বার প্রান্তে পৌঁছায়।

অতএব, চিকিৎসাক্ষেত্রে অর্গানন অব মেডিসিন পাঠের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

৪। অর্গানন অব মেডিসিন হোমিওপ্যাথির পরম দিশারী ব্যাখ্যা কর।
বা, অর্গানন অব মেডিসিনকে হোমিওপ্যাথির সংবিধান বলা হয় কেন?

অর্গানন অব মেডিসিন হোমিওপ্যাথির পরম দিশারী ঃ

অর্গানন অব মেডিসিন হোমিওপ্যাথির মৌলিক নিয়ম-নীতি সম্বলিত গ্রন্থ যা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞানের সকল শাখার বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া আছে। যেমন-

(i) চিকিৎসকের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে।
(ii) আর্দশ আরোগ্য ধরন ও প্রকৃতি সম্বন্ধে।
(iii) একজন আর্দশ চিকিৎসককের গুণাবলী যথা- রোগ, ঔষধ, ঔষধের প্রস্তুত প্রণালী, ঔষধের শক্তি ও মাত্রা, প্রয়োগ পদ্ধতি, আরোগ্য পথে বাঁধা ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান।
(iv) রোগ কি? এর প্রকারভেদ, কারণ ও লক্ষণাবলী, চিকিৎসা সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা।
(v) হোমিওপ্যাথি ও এলোপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে।
(vi) সুস্থ মানবদেহে ঔষধ পরীক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে।
(vii) ঔষধের শক্তিকরণ পদ্ধতি।
(viii) মানসিক রোগ, সবিরাম, অবিরাম, একদৈশিকরোগ প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা।
(ix) মেসমেরিজম, চুম্বক, মেসেজ ও খনিজ পানিতে গোসল প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা।

উপরিউক্ত আলোচনা হতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, আর্দশ চিকিৎসকের চিকিৎসাকার্য পরিচালনা করার জন্য অর্গানন অব মেডিসিন একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ নীতি সম্বলিত চিকিৎসক আইন বিদ্যা। সুতরাং উপরিউক্ত কারণে অর্গানন অব মেডিসিন হোমিওপ্যাথির পরম দিশারী বা অর্গানন অব মেডিসিনকে হোমিওপ্যাথির সংবিধান বলা হয়।

৫। অর্গানন অব মেডিসিন গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণের প্রকাশ কাল, স্থান, শিরোনাম, অনুচ্ছেদ কয়টি উল্লেখ কর।

অর্গানন অব মেডিসিন গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণের প্রকাশ কাল, স্থান, শিরোনাম, অনুচ্ছেদ ঃ

অর্গানন অব মেডিসিনের মোট ৬টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম ৫টি সংস্করণ ডাঃ হ্যানিম্যানের জীবদ্দশায় এবং ৬ষ্ঠ সংস্করণ তাঁর মৃত্যুর ৭৮ বছর পর প্রকাশিত হয়েছে। তা নিম্নরূপঃ

সংস্করণ	প্রকাশকাল	শিরোনাম	অনুচ্ছেদ সংখ্যা	স্থান/ভাষা
১ম সংস্করণ	১৮১০ খৃষ্টাব্দ	অর্গানন অব দি রেসন্যাল হিলিং সাইন্স	২৫৯	ড্রেসডেন, জার্মান
২য় সংস্করণ	১৮১৯ খৃষ্টাব্দ	অর্গানন অব দি হিলিং আর্ট	৩১৮	ড্রেসডেন, জার্মান
৩য় সংস্করণ	১৮২৪ খৃষ্টাব্দ	অর্গানন অব দি হিলিং আর্ট	৩১৮	ড্রেসডেন, জার্মান
৪র্থ সংস্করণ	১৮২৯ খৃষ্টাব্দ	অর্গানন অব দি হিলিং আর্ট	২৯২	ড্রেসডেন, জার্মান
৫ম সংস্করণ	১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ	অর্গানন অব দি হিলিং আর্ট	২৯৪	ড্রেসডেন, জার্মান ও ইংরেজী
৬ষ্ঠ সংস্করণ	১৮৪২ খৃষ্টাব্দ (পাভুলিপি) ১৯২১খৃ:প্রকাশ	অর্গানন অব মেডিসিন	২৯১	ষ্টাটগার্ট, জার্মান

৬। অর্গানন অব মেডিসিনের ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য লিখ। (Show the differences between fifth and sixth edition of Organon.)

অর্গাননের ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংস্করণের পার্থক্য নিম্নরূপ ঃ

৫ম সংস্করণ		৬ষ্ঠ সংস্করণ
পঞ্চম সংস্করণের নাম "অর্গানন অব হিলিং আর্ট "।	১	৬ষ্ঠ সংস্করণের নাম "অর্গানন অব মেডিসিন"।
এটি ডাঃ হ্যানিম্যানের জীবদ্দশায় প্রকাশিত।	২	এটি ডাঃ হ্যানিম্যানের মৃত্যুর ৭৮ বছর পর প্রকাশিত হয়।
৫ম সংস্করণে ২৯৪টি অনুচ্ছেদ আছে।	৩	৬ষ্ঠ সংস্করণে ২৯১টি অনুচ্ছেদ আছে।
এতে জীবনীশক্তিকে "Vital Force" নামে অভিহিত করা হয়েছে	৪	এতে জীবনীশক্তিকে Vital principle নামে অভিহিত করা হয়েছে।
এটিতে দশমিক শততমিক রীতির অবতারনা করা হয়েছে।	৫	এটিতে সহস্রতমিক রীতির কথা বলা হয়েছে।
এটি ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে Dr. Dudgeon জার্মান ভাষা হতে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করেন।	৬	এটি ১৯২১ খৃষ্টাব্দে Dr. willium Boerick জার্মান ভাষা হতে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করেন।
এতে তরুণ রোগে শততমিক শক্তি ঔষধ পুনঃপুনঃ ও ঘনঘন প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে এবং চিররোগে একবার একটি শক্তির মাত্রা প্রয়োগের জন্য বলা হয়েছে।	৭	এতে চিররোগ এবং অচির উভয় রোগেই পঞ্চম সহস্রতমিক ঔষধ পুনঃপুনঃ প্রয়োগের জন্য বলা হয়েছে।
এতে এক সময়ে একাধিক ঔষধ প্রয়োগের উপর তেমন গুরুত্ব দেয়া হয় নাই।	৮	এতে এক সময়ে একাধিক ঔষধের ব্যবহারের নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৭। প্রশ্ন ঃ অর্গাননের ৬ষ্ঠ সংস্করণে ডাঃ হ্যানিম্যান কি কি পরিবর্তন করেন ?

অর্গাননের ৬ষ্ঠ সংস্করণে ডাঃ হ্যানিম্যান নিম্নলিখিত বিষয় পরিবর্তন করেন ঃ

(i) ৬ষ্ঠ সংস্করণের নাম "অর্গানন অব মেডিসিন"।

(ii) ৬ষ্ঠ সংস্করণে ২৯১টি অনুচ্ছেদ আছে।

(iii) এতে জীবনীশক্তিকে Vital principle নামে অভিহিত করা হয়েছে।

(iv) ইহাতে পঞ্চাশ সহস্রতমিক রীতির কথা বলা হয়েছে।

(v) ইহাতে চিররোগ এবং অচির উভয় রোগেই পঞ্চম সহস্রতমিক ঔষধ পুনঃপুনঃ প্রয়োগের জন্য বলা হয়েছে।

(vi) ইহাতে এক সময়ে একাধিক ঔষধের ব্যবহারের নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৮। প্রশ্ন ঃ অর্গানন অব মেডিসিনকে কয়টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে এবং কি কি ?

অর্গানন অব মেডিসিনকে নিম্নোক্ত ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে ঃ

অর্গানন অব মেডিসিন ডাঃ হ্যানিম্যান কর্তৃক আবিষ্কৃত হোমিওপ্যাথির চিকিৎসা বিজ্ঞান ও আরোগ্য কলা সম্বলিত একটি গ্রন্থ। যার মধ্যে হোমিওপ্যাথির যাবতীয় বিধিবিধান অত্যন্ত সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ আছে। এতে ২৯১টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ১-৭০ নং অনুচ্ছেদে চিকিৎসা বিজ্ঞান ও ৭১-২৯১ নং অনুচ্ছেদে আরোগ্য কলার যুক্তি ভিত্তিক বিশদ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছে। তাই ইহার প্রথম অংশকে আরোগ্য বিজ্ঞান এবং দ্বিতীয় অংশকে আরোগ্য কলা বলা হয়।

৯। প্রশ্ন ঃ আরোগ্য নিয়ে যে তিনটি জ্ঞাতব্য বিষয় রয়েছে উহা আলোচনা কর।

আরোগ্য নিয়ে জ্ঞাতব্য তিনটি বিষয় ঃ

(i) আরোগ্যের বিশ্বজনীন নিয়ম ঃ সিমিলিয়া সিমিলিবাস কিউরেন্টার। "জীবন্ত দেহতন্ত্রের একটা দুর্বলতর সক্রিয় রোগ আক্রান্তির দিক থেকে অত্যন্ত সদৃশ ধর্মী হলে অন্য একটা বলবত্তর সক্রিয় রোগ কর্তৃক স্থানীয়ভাবে ধ্বংস হয়।" (অর্গানন অব মেডিসিন অনুচ্ছেদ- ২৬)।

(ii) শক্তিকৃত ঔষধ ঃ হোমিওপ্যাথিতে আদর্শ আরোগ্যের জন্য শক্তিকৃত ঔষধ ব্যবহার করা হয়।

(iii) একক ঔষধ ও পরিবর্তিত মাত্রা ঃ একই সাথে একাধিক ঔষধ হোমিওপ্যাথিতে ব্যবহৃত হয় না এবং প্রত্যেকবার ঔষধ সেবনের পূর্বে পরিবর্তিত মাত্রা রোগীর সেবন করতে দিতে হয়।

১০। প্রশ্ন ঃ কখন কার দ্বারা অর্গানন অব মেডিসিনের ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হয়?

অর্গানন অব মেডিসিনের ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ঃ

অর্গানন অব মেডিসিনের ষষ্ঠ সংস্করণের পান্ডুলিপি তৈরি হয় ১৮৪২ সালে। ১৮৪৩ সালে ডাঃ হ্যানিম্যান মৃত্যুবরণ করেন। ডাঃ হ্যানিম্যানের জীবনদ্দশায় ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই। এ ষষ্ঠ সংস্করণের পান্ডুলিপি প্রথমবার ফ্রাঙ্কো প্রুসিয়ান যুদ্ধের সময় ১৮৭০-৭১ সালের এবং দ্বিতীয় বার ১৮৯৪-১৯১৮ সালের বিশ্বযুদ্ধের সময় হারিয়ে যাবার উপক্রম হয়।

পুস্তকটি জার্মান ভাষায় ১৯২০ সালে ডাঃ আর হেল কর্তৃক এবং ১৯২১ সালে আমেরিকা হতে ডাঃ উইলিয়াম বোরিক কর্তৃক ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করে এটি প্রকাশিত হয়।

১১। প্রশ্ন ঃ সর্বোচ্চ আদর্শ আরোগ্য বলতে কি বুঝ ?
বা আদর্শ আরোগ্য কাকে বলে ?

(Question: What do you mean by the highest ideal cure?)

আদর্শ আরোগ্য এর সংজ্ঞা ঃ

মহাত্মা ডাঃ হ্যানিম্যান "অর্গানন অব মেডিসিন" এ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আদর্শ আরোগ্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

দ্রুত, বিনাকষ্টে, সামগ্রীক ও স্থায়ীভাবে, অল্প সময়ের মধ্যে রোগীকে কোন রূপ কষ্ট না দিয়ে স্থায়ীভাবে বিশ্বাসযোগ্য এবং নির্দোষ উপায়ে রোগীর হারানো অর্থাৎ রোগাক্রান্ত হবার পূর্বে যে রূপ স্বাস্থ্য ছিল সে রূপ স্বাস্থ্যের পুনঃরুদ্ধার করাকে, আদর্শ আরোগ্য বলে।

১২। প্রশ্ন ঃ আদর্শ আরোগ্যের শর্তসমূহ কি কি? আলোচনা কর।

(Question: What do you mean by the highest ideal cure ? Describe the condition of its.)

আদর্শ আরোগ্যের শর্তসমূহ ঃ

আদর্শ আরোগ্য সাধনের জন্য শর্তসমূহ নিম্নরূপ -

১। রোগের কারণ নির্ণয় করে ইহার মূলোচ্ছেদ সাধন ঃ

রোগী যে রোগ কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছে সে রোগকে মূলোচ্ছেদ করতে হবে। অর্থাৎ ইহার আংশিক নিরসন করা বা ইহাকে ধামাচাপা দিলে চলবে না। রোগকে সমূলে বিনাশ করতে হবে। স্থায়ীভাবে অপসারণের জন্য রোগীকে এন্টিমায়াজমেটিক ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে।

২। রোগ দ্রুত নিরাময় ঃ

রোগীকে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে আরোগ্য করতে হবে। রোগের প্রকৃত কারণ উদঘাটন করে সর্বাধিক লক্ষণসমষ্টি নিয়ে উপযুক্ত

ঔষধ নির্বাচন করে, সঠিক মাত্রা ও শক্তি প্রয়োগ করে রোগীকে রোগ নিরাময় করতে হবে।

৩। কষ্টবিহীনভাবে চিকিৎসা ঃ

চিকিৎসা এমনভাবে করতে হবে যাতে রোগী কোন প্রকার কষ্ট না পায়। সম্পূর্ণ বিনাকষ্টে চিকিৎসা করতে হবে। কোন অঙ্গ আরোগ্য করতে গিয়ে সমস্ত অঙ্গ কেটে ফেলার মত কষ্টকর চিকিৎসা করা যাবে না। মানসিক রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে শারীরিক ও মানসিক আঘাত করা যাবে না। শারীরিক আঘাত করে রোগীকে নিরাময় করে চিকিৎসা হোমিওপ্যাথি নীতি বিরুদ্ধে।

৪। অত্যন্ত বিশ্বস্ত উপায়ে ঃ

আরোগ্য সম্পাদনের জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে তা যেন সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য হয়। অর্থাৎ যে পদ্ধতিতে চিকিৎসা করলে রোগী আরোগ্য লাভ করবে বলে নিশ্চিতরূপে জানা যায় সে পদ্ধতিতে চিকিৎসা করতে হবে। রোগী রোগ সম্পর্কিত সকল তথ্যাদি গোপন রাখতে হবে। রোগীর রোগ সম্পর্কিত কোন তথ্য তাঁর অনুমতি ছাড়া প্রকাশ করা যাবে না।

৫। সহজবোধ্য নীতি অনুসারে ঃ

সহজবোধ্য বিধানমতে রোগের দূরীকরণ বা আরোগ্য সকল অর্থাৎ সিমিলিয়া সিমিলিবাস কিউরেন্টার মতে চিকিৎসা করতে হবে।

৬। স্বাস্থ্যের স্থায়ী পুনঃসংস্থাপন ঃ

চিকিৎসা এমনভাবে করতে হবে যাতে রোগীর স্বাস্থ্যের পুনঃসংস্থাপিত হয়। শুধুমাত্র রোগশক্তিকে পরাভূত করলেই চিকিৎসা কর্ম শেষ হল না, রোগীর স্বাস্থ্যকে রোগাক্রান্ত হবার পূর্বে যেমন ছিল আরোগ্যের পর স্বাস্থ্যকে ঠিক ঐ পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে। রোগীর স্বাস্থ্যকে স্থায়িভাবে পুনঃসংস্থাপন করার মধ্যেই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার চরম ও পরম সার্থকতা রয়েছে।

১৩। প্রশ্ন ঃ স্বাস্থ্য সংরক্ষক বলতে কি বুঝ ?
বা, আদর্শ চিকিৎসক কাকে বলে ?
(Question: What do you mean by the true or ideal physician?
প্রকৃত স্বাস্থ্য সংরক্ষক/আদর্শ চিকিৎসক এর সংজ্ঞা ঃ

মানব স্বাস্থ্য বিকৃত করে রোগ উৎপাদনকারী অবস্থা সমূদয়কে অপসারিত করে মানুষকে সুস্থ রাখার উপায় যিনি অবগত আছেন, তিনিই স্বাস্থ্য-রক্ষক। অর্থাৎ যিনি ডাঃ হ্যানিম্যানের অর্গানন অব মেডিসিনের ৩ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত রোগ সম্বন্ধে জ্ঞান, ঔষধ সম্বন্ধে জ্ঞান, ঔষধ প্রয়োগ সম্বন্ধে জ্ঞান, ঔষধের মাত্রা ও শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান এবং আরোগ্য পথে বাধা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকে, তাঁকে প্রকৃত স্বাস্থ্য সংরক্ষক/ আদর্শ চিকিৎসক বলা হয়।

১৪। প্রশ্ন ঃ আরোগ্য বলতে কি বুঝ ? কিভাবে তুমি বুঝিবে যে, রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে ?

আরোগ্যের সংজ্ঞা ঃ

রোগীর রোগাক্রান্ত হবার পূর্বের স্বাস্থ্যকে ফিরে এনে পুনঃসংস্থাপন করাকেই আরোগ্য বলে। ডাঃ হ্যানিম্যান অর্গানন অব মেডিসিনের ২নং অনুচ্ছেদে আদর্শ আরোগ্যের সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা দিয়েছেন।

"সত্বর, স্বচ্ছন্দ ও স্থায়ীভাবে স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনাই আরোগ্যের চুড়ান্ত আদর্শ। স্বল্পতম সময়ের মধ্যে, সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য ও নির্দোষ উপায়ে সর্বতোভাবে রোগকে নির্মূল এবং ধ্বংস করাও সেই লক্ষ্যেরই অন্তর্ভূক্ত। সহজবোধ্য নীতিই হবে এই চিকিৎসার ভিত্তি।"

আরোগ্য লাভ বুঝার উপায় ঃ

রোগীলিপি নিয়ে ঔষধ প্রয়োগের পর রোগাক্রান্ত ব্যক্তি সর্বপ্রথম মনে প্রফুল্লতা প্রকাশ পায়। যদি রোগীর মনে প্রফুল্লতা আসে তখন বুঝতে পারব ঔষধের ক্রিয়া শুরু হয়েছে। রোগী রোগের যন্ত্রনা কমার সাথে সাথে দেহেও আরামবোধ করবে। রোগীকে প্রকৃতভাবে নিরোগ করা এবং তাঁর পূর্বের স্বাস্থ্য পুনঃস্থাপন করার জন্য পরবর্তীতে আবার রোগীলিপি নিয়ে পরিবর্তিত মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে। যেমন- রোগীর জ্বর ভাল হয়েছে বললেই রোগীকে সুস্থ বলা যাবে না। জ্বর ভাল হবার সাথে সাথে তাঁর মন প্রফুল্ল হওয়া, খাবারের রুচি ফিরে পাওয়া এবং বমি বমিভাব কমে যাওয়া, শারীরিক দুর্বলতা না থাকা অর্থাৎ রোগীর জ্বর হবার পূর্বের স্বাস্থ্য ফিরে আনা জন্য বার বার লক্ষণ সদৃশ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থা করে আরোগ্যের পথকে সুনির্দিষ্ট করতে হবে।

১৫। প্রশ্ন ঃ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় রোগীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতার গুরুত্ব কি?

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় রোগীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতার গুরুত্ব ঃ

হোমিওপ্যাথির একটা অনন্য নিয়মনীতি হচ্ছে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসককে ঔষধ ও রোগীর সদৃশতম বস্তুসমূহের প্রকৃতির তুলনা, স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য নির্ণয় এ বিষয়সমূহ অবশ্যই সতর্কভাবে বিচার করতে হবে।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতিতে এক ঔষধের পরিবর্তে অন্য ঔষধ প্রয়োগের চিন্তা অথবা সমর্থন করা অন্যায়। হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক স্বাতন্ত্র্য নির্ণয় ও পার্থক্য নির্ণয় করতে বাধ্য। একদিকে বিশাল পার্থক্য অথচ অন্যান্য দিকে সাদৃশ্য সমন্বিত বস্তুসমূহের স্বাতন্ত্র্য নির্ণয় কার্যে তাকে অবশ্যই পারদর্শী হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ সিকেলি কর এবং আর্সেনিক অ্যালবাম এ দুটো ঔষধকে ধরা যেতে পারে। ঔষধ দুটোর মধ্যে অত্যন্ত জ্বালা দেখা যায়। কিন্তু সিকেলি কর রোগী তার গাত্রাবরণ উন্মুক্ত করতে চায়, শীতল বায়ুপ্রবাহ আকাংখা করে এবং গরম কাতর। পক্ষান্তরে আর্সেনিকের রোগী সকল বস্তুতেই উষ্ণতা চায়, গাত্রাবরণ চায়, শীতকাতর। যদিও মাথায় ঠান্ডা চায়। এভাবে ঔষধ দুইটি তৎক্ষনাৎ পৃথক হয়ে এগুলোর সামগ্রিক অবস্থায় ঔষধ দুটো সম্পূর্ণ বিসদৃশ, অথচ বিশেষ অবস্থায় এ দুটো সম্পূর্ণ সদৃশ সমগ্র রোগ ক্ষেত্রটা পরীক্ষা করতে হবে এবং সমস্ত ঔষধের মধ্যে কোন ঔষধটা রোগীর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের সাথে অধিকতর সদৃশ, তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। আদি হতে অন্ত পর্যন্ত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসককে রোগীর অবস্থা অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। রোগীর বিশেষ লক্ষণ সমূহের জ্ঞান না থাকলে তিনি সাফল্য লাভ করতে পারবেন না।

উপরিউক্ত আলোচনায় ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় রোগীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যতার গুরুত্ব অপরিসীম।

১৬। প্রশ্ন ঃ অর্গানন অব মেডিসিনকে হোমিওপ্যাথির সংবিধান বলা হয় কেন?

অর্গানন অব মেডিসিনকে হোমিওপ্যাথির সংবিধান বলা কারণ ঃ

ইহা হোমিওপ্যাথির মৌলিক নিয়ম-নীতি সম্বলিত গ্রন্থ যা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞানের সকল শাখার বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া আছে। যেমন-

(i) চিকিৎসকের উদ্দেশ্য লক্ষ্য সম্বন্ধে।

(ii) আর্দশ আরোগ্য ধরন ও প্রকৃতি সম্বন্ধে।

(iii) একজন আর্দশ চিকিৎসককের গুণাবলী যথা- রোগ, ঔষধ, ঔষধের প্রস্তুত প্রণালী, ঔষধের শক্তি মাত্রা, প্রয়োগ পদ্ধতি, আরোগ্য পথে বাধা ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান।

(iv) রোগের কি? ইহার প্রকারভেদ, কারণ ও লক্ষণাবলী, চিকিৎসা সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা।

(v) হোমিওপ্যাথি ও এলোপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে।

(vi) সুস্থ মানবদেহে ঔষধ পরীক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে।

(vii) ঔষধের শক্তিকরণ পদ্ধতি।

(viii) মানসিক রোগ, সবিরাম, অবিরাম, একদৈশিকরোগ প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা।

(ix) মেসমেরিজম, চুম্বক, মেসেজ ও খনিজ পানিতে গোসল প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা।

উপরিউক্ত আলোচনা হতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, আর্দশ চিকিৎসকের চিকিৎসাকার্য পরিচালনা করার জন্য অর্গানন অব মেডিসিন একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ নীতি সম্বলিত চিকিৎসক আইন বিদ্যা। সুতরাং উক্ত কারণে অর্গানন অব মেডিসিনকে হোমিওপ্যাথির সংবিধান বলা হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়
জীবনীশক্তি

১। প্রশ্ন ঃ জীবনীশক্তি কি? বা জীবনীশক্তি কাকে বলে ?

জীবনীশক্তি ঃ মহাত্মা ডাঃ হ্যানিম্যান জীবনীশক্তি সম্বন্ধে 'অর্গানন অব মেডিসিন' গ্রন্থের ৯ ও ১০নং অনুচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, মানবের সুস্থ অবস্থায় আত্মস্বরূপ জীবনীশক্তি, যে শক্তি স্থূল মানবদেহকে জীবিত রাখে, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে অপ্রতিহত শক্তিকে শাসন করে এবং দেহতন্ত্রের সকল অংশকেই পরস্পরের সাথে জীবনকার্য পরিচালনায় রত রাখে যে মানুষের অন্তর্স্থিত বিচারশক্তিসম্পন্ন মন, অবাধে এ সচেতন ও সুস্থ দেহতন্ত্রকে জীবনের মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনে নিযুক্ত করতে সমর্থ হয়।

জীবনীশক্তি ব্যতীত মানুষের জড় শরীর অনুভব করতে পারে না, নিজ কার্যাবলী করতে অক্ষম এবং আত্মরক্ষা বিষয়ে অপারগ হয়। যে শক্তির প্রভাবে মানবের জড় দেহ জীবিত থাকে, তাকেই জীবনীশক্তি বলে। মহাত্মা ডাঃ হ্যানিম্যান অর্গানন অব মেডিসিনের ষষ্ঠ সংস্করণে জীবনীশক্তিকে ভাইটাল প্রিন্সিপল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

২। প্রশ্ন ঃ জীবনীশক্তি সম্বন্ধে ডাঃ হ্যানিম্যানের মতামত কি ?

জীবনীশক্তি সম্বন্ধে ডাঃ হ্যানিম্যানের মতামত ঃ

ডাঃ হ্যানিম্যান জীবনীশক্তিকে বলেছেন Immaterial being, the vital principle অর্থাৎ ইহা একটি অভৌতিক (অজড় অর্থাৎ জীবিত) সত্ত্বা বা অভৌতিক প্রাণ সম্পদ। জীবনীশক্তি অদৃশ্য, ইন্দ্রিয়শক্তি দ্বারা অনুভব করা যায়। একে আমরা চোখে দেখি না কিন্তু প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি। ইহা জড়দেহে অবস্থান করে ঠিক কিন্তু ইহার অস্তিত্ব স্বতন্ত্র। মানবদেহের সমস্ত কার্যাবলী ও অনুভূতি প্রভৃতি দেহে জীবনীশক্তি আছে বলেই সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়।

জীবনীশক্তি ব্যতিত বস্তুগত দেহ অনুভব করতে, কাজ করতে বা আত্মরক্ষা করতে পারে না। একমাত্র এই অশরীরী সত্ত্বা হতেই জীবনের সর্বপ্রকার অনুভূতি ও কার্যকলাপ উদ্ভূত হয়। সুস্থ এবং অসুস্থ-উভয় অবস্থাতে ইহাই এই বস্তুগত শরীরতন্ত্রকে সঞ্জীবিত রাখে।

৩। প্রশ্ন ঃ "জীবনীশক্তির বিশৃঙ্খলাই রোগ"- ব্যাখ্যা কর। ১৪, ১৭

(Question: 'Disorder of vital force is disease' – Explain.

জীবনীশক্তির বিশৃংখলাই রোগ ঃ

মহাত্মা ডাঃ হ্যানিম্যান জীবনীশক্তি বিশৃংখলাই রোগ এ সম্বন্ধে 'অর্গানন অব মেডিসিন' গ্রন্থের ১১ থেকে ১৬ নং অনুচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

জীবনীশক্তি সূক্ষ্মশক্তি, ইহা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। তাই আমরা তা দেখতে পাই না, ধরতে পারি না কেবল মাত্র অনুভব করতে পারি। জীবনীশক্তি সম্পর্কে ধারণা সর্বপ্রথম প্রকাশ পায় ১৮২৯ খ্রিঃ। অর্গানন অব মেডিসিনের ৪র্থ সংস্করণ, প্রকাশিত হওয়ার কয়েক বছর পূর্বে ডাঃ হ্যানিম্যান যখন কোথেন নামক স্থানে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছিলেন সে সময় তার চিন্তায় জীবনীশক্তির বিষয় উদয় হয়। ডাঃ হ্যানিম্যান তাঁর বর্ণনা জীবনীশক্তিকে Vital Force, vital principle, spirital force বলেছেন। ইহা একটি শুভ শক্তি যার প্রভাবে দেহ সজীব থাকে সুশৃংখলভাবে পরিচালিত হয়। জীবনীশক্তি সূক্ষ্মশক্তি বিশেষ। জীবনীশক্তি সূক্ষ্ম রোগশক্তি দ্বারা আক্রান্ত হলে রোগের আবির্ভাব হয়। প্রাকৃতিক রোগ দ্বারা আক্রান্ত জীবনীশক্তিকে রোগমুক্ত করার উদ্দেশ্যে ঔষধ প্রয়োগ করা হয়।

অতএব অদৃশ্য জীবনীশক্তির সহিত মানবদেহের সম্পর্ক সুদৃঢ়। জীবনীশক্তি মানবদেহকে সতেজ ও রোগমুক্ত রাখে এবং কর্ম উদ্দীপনা বৃদ্ধি করে।

৪। প্রশ্ন ঃ রোগ আরোগ্য জীবনীশক্তির ভূমিকা আলোচনা কর। ১২
বা, রোগ আরোগ্যে জীবনীশক্তির ভূমিকা লিখ। ১৩
বা রোগ আরোগ্য জীবনীশক্তির ক্রিয়া বর্ণনা কর।

• রোগ ও আরোগ্যে জীবনীশক্তির ভূমিকা ঃ

মহাত্মা ডাঃ হ্যানিম্যান রোগ ও আরোগ্যে জীবনীশক্তির ভূমিকা সম্বন্ধে 'অর্গানন অব মেডিসিন' গ্রন্থের ১১ থেকে ১৬নং অনুচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

মানবের সুস্থ অবস্থায় আত্মস্বরূপ জীবনীশক্তি, যে শক্তি স্থূল মানব দেহকে জীবিত রাখে, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে অপ্রতিহত শক্তিকে শাসন করে এবং দেহতন্ত্রের সকল অংশকেই পরস্পরের সাথে জীবনকার্য পরিচালনারত রাখে, যে মানুষের অন্তরস্থিত বিচার শক্তিসম্পন্ন মন, অবাধে এ সচেতন ও সুস্থ দেহতন্ত্রকে জীবনের মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনে নিযুক্ত করতে সমর্থ হয়।

অশরীরী জীবনীশক্তি সমস্তদেহ ব্যাপী অত্যন্ত সুশৃংখলভাবে অবস্থিত। অশরীরী জীবনীশক্তি ইহার বিরোধী অশরীরী রোগশক্তি দ্বারা আক্রান্ত হয়। রোগশক্তিটি যদি জীবনীশক্তি অপেক্ষা প্রবল হয় তবে জীবনীশক্তির সুশৃংখল কর্মকান্ডে বিশৃংখলা দেখা দেয়। জীবনীশক্তি বিশৃংখলাহেতু দেহ ও মনে প্রকাশিত লক্ষণের মাধ্যমে রোগ প্রকাশ পায়। আক্রান্ত জীবনীশক্তি রোগশক্তি হতে মুক্তি পাবার জন্য প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। জীবনীশক্তি প্রতিরোধে ব্যর্থ হলে রোগশক্তি দেহকে গ্রাস করে। তখন জীবনীশক্তি বিশৃংখলা হতে মুক্তি পাওয়া লক্ষ্যে ঔষধ শক্তির সাহায্য কামনা করে।

৫। প্রশ্ন ঃ অদৃশ্য জীবনীশক্তির সহিত মানবদেহের সম্পর্ক আলোচনা কর।

অদৃশ্য জীবনীশক্তির সহিত মানবদেহের সম্পর্ক ঃ

জীবনীশক্তি সূক্ষ্মশক্তি এটা আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব যোগ্য। তাই আমরা তা দেখতে পাই না, ধরতে পারি না কেবল মাত্র অনুভব করতে পারি। জীবনীশক্তি সম্পর্কে ধারনা সর্বপ্রথম প্রকাশ পায় ১৮২৯ খ্রিঃ। অর্গানন অব মেডিসিনের ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার কয়েক বছর পূর্বে ডাঃ হ্যানিম্যান যখন কোথেন নামক স্থানে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছিলেন সে সময় তার চিন্তায় জীবনীশক্তির বিষয় উদয় হয়। ডাঃ হ্যানিম্যান তাঁর বর্ণনা জীবনীশক্তিকে Vital Force, vital principle, spirital force বলেছেন। ইহা একটি শুভ শক্তি যার প্রভাবে দেহ সজীব থাকে সুশৃংখলভাবে পরিচালিত হয়। জীবনীশক্তি সূক্ষ্ম শক্তি বিশেষ। জীবনীশক্তি সূক্ষ্ম রোগশক্তি দ্বারা আক্রান্ত হলে রোগের আবির্ভাব হয়। প্রাকৃতিক রোগ দ্বারা আক্রান্ত জীবনীশক্তিকে রোগমুক্ত করার উদ্দেশ্যে ঔষধ প্রয়োগ করা হয়।

অতএব অদৃশ্য জীবনী শক্তির সহিত মানবদেহের সম্পর্ক সুদৃঢ়। জীবনীশক্তি মানব দেহকে সতেজ ও রোগমুক্ত রাখে এবং কর্ম উদ্দীপনা বৃদ্ধি করে।

৬। প্রশ্ন ঃ ঔষধ পরীক্ষা ও রোগী পরীক্ষার মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর।

ঔষধ পরীক্ষা ও রোগী পরীক্ষার মধ্যে সম্পর্ক ঃ

ঔষধ পরীক্ষা ও রোগী পরীক্ষার মধ্যে সর্ম্পক অত্যন্ত নিবিড়। ডাঃ হ্যানিম্যান "অর্গানন অব মেডিসিন" গ্রন্থের ১২০-১২৫ নং অনুচ্ছেদে ঔষধ পরীক্ষা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং ৮৪-১০২ নং অনুচ্ছেদের রোগীলিপি সংগ্রহ অর্থাৎ লক্ষণ সমষ্টি সংগ্রহের

নিয়মাবলী যেমন রোগীর বর্ণনা হতে, সেবাকারীর বর্ণনা হতে, আত্মীয়-স্বজনের বর্ণনা হতে এবং চিকিৎসক নিজে রোগী সম্বন্ধে যা পর্যবেক্ষণ (৯০ নং অনুচ্ছেদে) করেন তার বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া রয়েছে।

সুস্থদেহে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ পরীক্ষা করলে ঔষধ কি কি রোগ লক্ষণ উৎপন্ন করতে সক্ষম তা জানা সম্ভব হয়। সুস্থ মানবদেহে পরীক্ষিত ঔষধ সমূহের পরীক্ষালব্ধ লক্ষণসমূহ হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকাতে লিপিবদ্ধ আছে। সদৃশ বিধানে অর্থাৎ হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বিশেষ সুবিধা এই যে, সুস্থদেহে ঔষধ যে সকল রোগ লক্ষণ উৎপন্ন করে, কোন রোগীতে যদি অনুরূপ সদৃশ প্রকাশিত রোগ লক্ষণ দৃষ্ট হয় তবে সদৃশ লক্ষণ সম্পন্ন ঔষধ প্রয়োগে প্রাকৃতিক রোগ নিরাময় সম্ভব। তাই কোন রোগীর প্রাকৃতিক রোগের সৃষ্ট লক্ষণাবলী ঔষধের লক্ষণাবলীর সঙ্গে সদৃশ হলে তা প্রয়োগ করা হয়।

অতএব বলা যায়, ঔষধ পরীক্ষা সুস্থ মানব দেহে বিশুদ্ধ লক্ষণাবলী পাওয়ার উপায় এবং রোগী পরীক্ষা অসুস্থ দেহের প্রকাশিত লক্ষণাবলী দ্বারা সদৃশ ঔষধ পাওয়ার উপায়। সুতরাং ঔষধ পরীক্ষা ও রোগী পরীক্ষা একে অন্যের পরিপূরক বা সম্পূরক।

৭। প্রশ্ন ঃ আরোগ্য শিল্পে যে তিনটি জ্ঞাতব্য বিষয় রয়েছে উহা আলোচনা কর।

আরোগ্য শিল্পে জ্ঞাতব্য তিনটি বিষয় ঃ-

(i) **আরোগ্যের বিশ্বজনীন নিয়ম ঃ** সিমিলিয়া সিমিলিবাস কিউরেন্টার।"জীবন্ত দেহতন্ত্রের একটা দুর্বলতর সক্রিয় রোগ অভিব্যক্তির দিক থেকে অত্যন্ত সদৃশ ধর্মী হলে অন্য একটি বলবত্তর সক্রিয় রোগ কর্তৃক স্থানীয়ভাবে ধ্বংস হয়।" (অর্গানন অব মেডিসিন অনুচ্ছেদ- ২৬)।

(ii) শক্তিকৃত ঔষধ ঃ হোমিওপ্যাথিতে আদর্শ আরোগ্যের জন্য শক্তিকৃত ঔষধ ব্যবহার করা হয়।

(iii) একক ঔষধ ও পরিবর্তিত মাত্রা ঃ একই সাথে একাধিক ঔষধ হোমিওপ্যাথিতে ব্যবহৃত হয় না এবং প্রত্যেকবার ঔষধ সেবনের পূর্বে পরিবর্তিত মাত্রা রোগীর সেবন করতে দিতে হয়।

৮। প্রশ্ন ঃ হোমিওপ্যাথিতে রোগী পরীক্ষা পদ্ধতি বর্ণনা কর।

হোমিওপ্যাথিতে রোগী পরীক্ষা পদ্ধতি বর্ণনা ঃ

মহাত্মা ডাঃ হ্যানিম্যান "অর্গানন অব মেডিসিন" গ্রন্থের ৮৪-১০২ নং অনুচ্ছেদের রোগীলিপি সংগ্রহ এবং এর ৯০ নং অনুচ্ছেদে রোগী পরীক্ষা অর্থাৎ চিকিৎসক নিজে রোগী সম্বন্ধে যা পর্যবেক্ষণ করেন তার বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎকের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কর্তব্য হল চিকিৎসার উদ্দেশ্যে রোগী পরীক্ষা করে লক্ষণ সমষ্টি সংগ্রহ করা। রোগীলিপি সংগ্রহ অর্থাৎ লক্ষণ সমষ্টি সংগ্রহের নিয়মাবলী যেমন রোগীর বর্ণনা হতে, সেবাকারীর বর্ণনা হতে, আত্মীয়-স্বজনের বর্ণনা হতে এবং চিকিৎসক নিজে রোগী সম্বন্ধে যা পর্যবেক্ষণ করবেন তার বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া রয়েছে।

চিকিৎসক রোগীর দেহের তাপমাত্রা, রক্তের চাপ, এনিমিয়া, জন্ডিস, চেহারা, ধাতুগত লক্ষণ, অংগ-প্রত্যংগের সাধারণ চিত্র, সার্বদৈহিক লক্ষণাবলী, মায়জমেটিক অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যবেক্ষণ করে মেটেরিয়া মেডিকা হতে উক্ত রোগ সদৃশ ঔষধ নির্বাচন হবে।

সুতরাং হোমিওপ্যাথিতে রোগী পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

তৃতীয় অধ্যায়
মায়াজম (Miasm)
অনুচ্ছেদ – ৫

উত্তেজক ও মূল কারণসমূহ (Exciting & fundamental Causes) ঃ

অচির রোগের একান্ত সম্ভাব্য উত্তেজক কারণ এবং চির রোগের সমগ্র রোগীলিপির গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ লক্ষণসমূহ রোগের মূলকারণ নির্ধারণে চিকিৎসককে সহায়তা করে। কোন একটি চির রোগ-বিষই (Chronic miasm) সাধারণতঃ চির-রোগ উৎপত্তির কারণ। রোগ আরোগ্য করার জন্য চিকিৎসককে এইসব জেনে নিতে হবে। এইগুলি অনুসন্ধান করার সময় রোগীর শারীরিক গঠন (বিশেষতঃ চিররোগে), তাঁর নৈতিক ও বুদ্ধিগত চরিত্র, পেশা, জীবন-যাপন পদ্ধতি, অভ্যাস, সামাজিক ও পারিবারিক সম্বন্ধ, বয়স, যৌন বিষয়ক কার্যকলাপ প্রভৃতি নির্ণয়ের বিষয়ের দিকে নিশ্চিতভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

১। প্রশ্ন ঃ মায়াজম বলতে কি বুঝ ?
বা, মায়াজম কাকে বলে? ইহা কত প্রকার ও কি কি ?
বা, উপবিষ বলতে কি বুঝ ?

উপবিষ (মায়াজম) ঃ মায়াজম একটি গ্রীক শব্দ। এর অর্থ দাগ, অপবিত্রতা, দূষিত অবস্থা। যে সকল প্রাকৃতিক সূক্ষ্ম শক্তি বা কারণসমূহ হতে রোগ উৎপত্তি হয়, সে সকল সূক্ষ্ম শক্তি বা কারণসমূহকে, উপবিষ বা মায়াজম বলে। সুতরাং উপবিষ বা মায়াজম হচ্ছে এমন একটি অবস্থা যা মানবদেহে প্রবেশ করে এবং দেহের বিশৃংখলা সৃষ্টি করে রোগ লক্ষণাবলী উৎপন্ন করে।

মায়াজম তিন প্রকার। যথা – (i) সোরা, (ii) সিফিলিস ও (iii) সাইকোসিস।

অথবা,

মায়াজমের সংজ্ঞা ঃ

মায়াজম হল এমন একটি অবস্থা যা মানবদেহে রোগ উৎপত্তি ও রোগ প্রবণতা সৃষ্টি করে থাকে। অর্থাৎ যে সকল অদৃশ্য কারণসমূহ হতে রোগ সৃষ্টি হয়, তাদেরকে মায়াজম বলে। মায়াজম তিন প্রকার। যথা- সোরা, সিফিলিস ও সাইকোসিস। মায়াজম একবার মানবদেহে প্রবেশ করলে উহা সুচিকিৎসিত না হলে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করে যা সারা জীবন ধরে চলতে থাকে এবং বংশ পরম্পরায় চলতে থাকে।

২। প্রশ্ন ঃ মিশ্র মায়াজম বলতে কি বুঝ?

মিশ্র মায়াজম এর সংজ্ঞা ঃ

দুই বা ততোধিক মায়াজম একত্রে একই দেহে মিলিত হয়ে যে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাকে মিশ্র মায়াজম বলে। মায়াজম তিন প্রকার। সোরা, সিফিলিস ও সাইকোসিস। মিশ্র মায়াজম হচ্ছে এরূপ অবস্থা যা সোরা + সাইকোসিস, সোরা + সিফিলিস, সোরা + সিফিলিস + সাইকোসিস সংমিশ্রনে উৎপন্ন হয়। যেমন – স্ক্রোফিউলা, সিউডো-সোরা ইত্যাদি।

৩। প্রশ্ন ঃ মায়াজম চাপা পড়ার কারণগুলি লিখ।

মায়াজম চাপা পড়ার কারণগুলি ঃ

(i) বিসদৃশ বিধান মতে কোন প্রকার চর্মরোগে মলম বা অন্য কোন প্রলেপাদি প্রয়োগ করা।

(ii) বিসদৃশ প্যাথির অতিরিক্ত ঔষধ সেবন।

(iii) ভুল ঔষধ সেবন করা।

(iv) রোগের গতি বহির্মূখী হতে অন্তর্মূখী চাপা পড়ার ফলে।

(v) বিনা কারণে বা ত্রুটিপূর্ণ অপারেশন।

(vi) চিকিৎসকের ভুল চিকিৎসার ফলে।

(vii) বার বার চিকিৎসক পরিবর্তন করা।

৪। প্রশ্ন ঃ মায়াজম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের প্রয়োজনীয়তা লিখ।

মায়াজম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের প্রয়োজনীয়তা ঃ

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা একটি লক্ষণ ভিত্তিক চিকিৎসা। মহাত্মা ডাঃ হ্যানিম্যান দেখলেন যে রোগী চিকিৎসার কিছুদিন পর আবার রোগ যন্ত্রণা নিয়ে ফিরে আসে। তখন তিনি দুর্চিন্তায় পড়লেন এবং কারণ অনুসন্ধান করতে শুরু করলেন। তিনি দীর্ঘ ১২ বছর গবেষণার পর রোগের কারণ হিসাবে মায়াজম এর আবিষ্কার করলেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় প্রাকৃতিক নিয়মে আরোগ্য সাধিত হয়, অর্থাৎ সিমিলিয়া সিমিলিবাস কিউরেন্টার। মহাত্মা ডাঃ হ্যানিম্যান হোমিওপ্যাথির আইন সম্বলিত গ্রন্থ "অর্গানন অব মেডিসিন" এর ৫নং অনুচ্ছেদে রোগের কারণ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মহাত্মা ডাঃ হ্যানিম্যান রোগের কারণ বলতে মায়াজমকে বুঝিয়েছেন। সমগ্র পৃথিবীতে যত প্রকার দূরারোগ্য রোগ সৃষ্টি হচ্ছে তার পিছনে কিছু না কিছু কারণ রয়েছে, আর এ কারণকে মহাত্মা ডাঃ হ্যানিম্যান মায়াজম হিসাবে নামকরণ করেছেন। মায়াজম তিন প্রকার। যথা– ১। সোরা ২। সিফিলিস ও ৩। সাইকোসিস। সোরা আদি মায়াজম যা সকল রোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। তাহলে সোরা বংশগতভাবে মানুষের দেহে সংক্রমিত হয়ে চলে আসে। আবার সাইকোসিস ও সিফিলিস এক দিকে বংশানুক্রমিক চলে আসছে এবং অন্যদিকে ব্যক্তিগতভাবে কুকর্মের দ্বারা অর্জিত হতে দেখা যাচ্ছে। প্রত্যকটি মায়াজম এক একটি রোগের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। প্রতিটি রোগীর ক্ষেত্রে সঠিক রোগীলিপি প্রণয়ন করে, বিশুদ্ধ মেটেরিয়া মেডিকা হতে প্রকৃত এন্টিমায়াজমেটিক ঔষধ সেবনে আদর্শ আরোগ্য হয়। প্রত্যেকটি মায়াজমের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, নির্দেশক লক্ষণাবলী, গঠনগত ও মানসিক লক্ষণ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, হ্রাস-বৃদ্ধি প্রভৃতি আলাদা। সুতরাং প্রত্যকেটি মায়াজম সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে জ্ঞান অর্জন করলে রোগী চিকিৎসা সহজতর হবে।

অতএব, মায়াজম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

৫। প্রশ্ন ঃ মায়াজম কি? তৎকালীন সময়ে ইহা নামকরণের তাৎপর্য কতটুকু? ব্যাখ্যা কর। ১৬, ১৭

মায়াজমের সংজ্ঞা ঃ

মায়াজম হল এমন একটি অবস্থা যা মানবদেহে রোগ উৎপত্তি ও রোগ প্রবণতা সৃষ্টি করে থাকে। অর্থাৎ যে সকল অদৃশ্য কারণসমূহ হতে রোগ সৃষ্টি হয়, তাদেরকে মায়াজম বলে। মায়াজম তিন প্রকার। যথা- সোরা, সিফিলিস ও সাইকোসিস। মায়াজম একবার মানবদেহে প্রবেশ করলে উহা সুচিকিৎসিত না হলে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করে যা সারা জীবন ধরে চলতে থাকে এবং বংশ পরম্পরায় চলতে থাকে।

তৎকালীন সময়ে মায়াজম নামকরণের তাৎপর্য - ব্যাখ্যা ঃ

ডাঃ হ্যানিম্যানের সম-সাময়িককালে রোগোৎপাদক শক্তি বা পদার্থ-যা রোগ সৃষ্টির কারণের সাথে সম্পর্কিত তাকে 'মায়াজম' বা 'মায়াজমা' নামে অভিহিত করা হতো। সে সময় পচা জৈব পদার্থ, প্রাণীজ বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ এবং কখনও কোনও রোগাক্রান্ত গলিত বা বিকৃত শরীর নির্গত দূষিত বাষ্প ইত্যাদি থেকে উদ্ভব রোগোৎপাদককে বুঝাতে এ শব্দকে অবাধভাবে ব্যবহার করা হতো। সে সময়ে সদ্য সংযোজিত চিকিৎসা সংক্রান্ত রচনা থেকে মহাত্মা ডাঃ হ্যানিম্যান এ শব্দটি গ্রহন করেছেন। কিন্তু বিশেষ ভাবার্থে ও অর্থ-নির্দেশে শব্দটিকে তিনি সাজিয়েছেন এবং ব্যবহার করেছেন।

সুতরাং ডাঃ হ্যানিম্যান তৎকালীন সময়ে মায়াজম নামকরণের তাৎপর্য অত্যন্ত যুগোপযুগী এবং সুদূরপ্রসারী চিন্তা ছিল। এই নামকরণ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

৬। প্রশ্ন ঃ পীড়ার প্রধান কারণ কি কি ? ০৮

পীড়ার প্রধান কারণসমূহ ঃ

(i) সোরা, (ii) সিফিলিস, (iii) সাইকোসিস, (iv) টিউবারকুলার ডায়াথেসিস, (v) মিশ্র মায়াজম।

৭। প্রশ্ন ঃ কিভাবে ডাঃ হ্যানিম্যান উপবিষতত্ত্ব আবিষ্কার করেন ? ১১

ডাঃ হ্যানিম্যান উপবিষতত্ত্ব আবিষ্কার করেন ঃ

ডাঃ হ্যানিম্যান রোগী আরোগ্য করার পর কিছু দিন পরে আবার রোগী পূর্বের রোগ লক্ষণ নিয়ে ফিরে আসে। তখন তিনি দূর্চিন্তায় পড়লেন এবং ভাবতে শুরু করলেন এর পিছনে প্রকৃত কারণ কি? এই প্রশ্নের সঠিক জবাব খোঁজার জন্য ডাঃ হ্যানিম্যান ১২ বছর অক্লান্ত শ্রমবহুল গবেষণা করেন। কেন যে হোমিওপ্যাথির পরিচিত ঔষধসমূহের দ্বারা উক্ত রোগগুলি নিরাময় হয়নি এবং এই অভ্রান্ত চিকিৎসা নীতি অনুসারে চিকিৎসিত হওয়া সত্ত্বেও কেনইবা জঘন্য চিররোগ আরোগ্য না হয়ে তার অবস্থাতেই রয়েছে। এর কারণ নির্ণয়ে ডাঃ হ্যানিম্যান ১৮১৬ এবং ১৮১৭ খ্রীঃ এই দুই বছর নানাভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম ও গবেষণা করেন। কোথেনে নির্বাসিত জীবন-যাপনের শেষের দিকে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ হ্যানিম্যান তাঁর ১২ বছরের গবেষণার ফসল " The chronic disease, their peculiars nature and their homoeopathic cure" নামে প্রকাশ করেন। ডাঃ হ্যানিম্যান তাঁর গবেষণায় দুই ধরনের রোগে কারণের সন্ধান পান। একটি অরতিজ এবং অন্যটি রতিজ। অরতিজ হচ্ছে সোর এবং রতিজ হচ্ছে সিফিলিস ও সাইকোসিস।

এইভাবেই ডাঃ হ্যানিম্যান উপবিষতত্ত্বের আবিষ্কার করেন।

৮। প্রশ্ন ঃ সোরা কি ? মায়াজম অর্জিত না বংশানুক্রমিক ? আলোচনা কর। অথবা, মায়াজম অর্জিত না বংশগত? আলোচনা কর।

সোরার সংজ্ঞা (Psora) ঃ ডাঃ রবার্টেসের মতে সোরা, হিব্রু শব্দ 'সোরাট' (Tsorat) হতে উৎপন্ন হয়েছে। ইহা পরবর্তীকালে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার মধ্য দিয়ে রূপান্তরিত হয়ে Psora হয়েছে। 'সোরাট' (Tsorat) শব্দের অর্থ খাদ, ভুল বা দোষ, অপবিত্রতা, কলঙ্ক বা দাগ ইত্যাদি। সোরা আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- (i) চুলকণা বা সদৃশ কিছু চর্মরোগ এবং (ii) কুচ্ছুকীট বা কোষের পোকা।

সোরা হল রোগ উৎপাদনের এমন একটি কারণ যা মানবদেহে রোগ উৎপত্তি ও রোগ সংক্রমণ সৃষ্টি করে থাকে। অর্থাৎ যে সকল অদৃশ্য কারণসমূহ হতে রোগ সৃষ্টি হয়, সোরা তাদের মধ্যে অন্যতম প্রাচীন রোগবীজ। ডাঃ হ্যনিম্যান এর মতে সোরা হল মানুষের দেহে রোগ সৃষ্টিকারী

আদি মায়াজম। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, ব্যাপক এবং মারাত্মক মায়াজম সোরা। যা মানবদেহে প্রবেশ করলে উহা সুচিকিৎসিত না হলে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করে যা সারা জীবন ধরে চলতে থাকে এবং বংশ পরম্পরায় চলতে থাকে।

মায়াজম অর্জিত না বংশগত ঃ

মহাত্মা ডাঃ হ্যানিম্যান হোমিওপ্যাথির আইন সম্বলিত গ্রন্থ "অর্গানন অব মেডিসিন" এর ৫নং অনুচ্ছেদে রোগের কারণ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মহাত্মা ডাঃ হ্যানিম্যান রোগের কারণ বলতে মায়াজমকে বুঝিয়েছে। সমগ্র পৃথিবীতে যত প্রকার দূরারোগ্য রোগ সৃষ্টি হচ্ছে তার পিছনে কিছু না কিছু কারণ রয়েছে, আর এ কারণকে মহাত্মা ডাঃ হ্যানিম্যান মায়াজম হিসাবে নামকরণ করেছেন। মায়াজম তিন প্রকার। যথা– (i) সোরা (ii) সিফিলিস ও (iii) সাইকোসিস। সোরা আদি মায়াজম যা সকল রোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। তাহলে সোরা বংশগতভাবে মানুষের দেহে সংক্রমিত হয়ে চলে আসে। আবার সাইকোসিস ও সিফিলিস এক দিকে বংশানুক্রমিক চলে আসছে এবং অন্যদিকে ব্যক্তিগতভাবে কুকর্মের দ্বারা অর্জিত হতে দেখা যাচ্ছে। মায়াজম রোগের অন্যতম কারণ।

সুতরাং মায়াজম অর্জিত ও বংশগত উভয় প্রকারের হতে পারে।

৯। প্রশ্ন ঃ চিররোগের কারণ কি ? ১২

চিররোগের কারণ ঃ মহাত্মা ডাঃ হ্যানিম্যান হোমিওপ্যাথির আইন সম্বলিত গ্রন্থ "অর্গানন অব মেডিসিন" এর ৫নং অনুচ্ছেদে চির রোগের কারণ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

ক) মুল কারণ ঃ- (i) সোরা, (ii) সিফিলিস, (iii) সাইকোসিস, (iv) টিউবারকুলার ডায়াথেসিস, (v) মিশ্র মায়াজম।

খ) উত্তেজক/আনুসঙ্গিক কারণসমূহ নিম্নরূপ ঃ (i) বংশগত কারণে, (ii) বয়স, (iii) লিঙ্গ (পুরুষ/মহিলা), (iv) ঋতু, (v) আবহাওয়া, (vi) পেশা, (vii) পারিবারিক অবস্থা, (viii) সামাজিক অবস্থা, (ix) ব্যক্তিগত অভ্যাস, (x) শারিরীক গঠন (xi) পুষ্টির অবস্থা, (xii) বাসস্থান,(xiii) বিভিন্ন ধরনের মাইক্রোঅর্গানিজম।

সোরা (Psora)

১। প্রশ্ন ঃ সুপ্ত সোরা কি ?

সুপ্ত সোরা ঃ

মানবদেহে সোরা মায়াজম সংক্রমনের পর তা সমগ্র জীবন সত্ত্বায় ছড়িয়ে পড়ে। তারপর ইহা সংক্রমনের অনুকূল পরিবেশে পেলে আত্মপ্রকাশ করে। সংক্রমনের ও আত্মপ্রকাশের মধ্যবর্তী অবস্থাকে সুপ্ত সোরা বলে।

২। প্রশ্ন ঃ সুপ্ত সোরার বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখ।

বা, সুপ্ত সোরার লক্ষণাবলী লিখ।

সুপ্ত সোরার লক্ষণাবলী ঃ

(i) মাথায় ঘাম, রাতে শোয়ার পর। ঘন ঘন এমনকি সামান্য আবেগ জনিত মানসিক উত্তেজনায় একপার্শ্বিক মাথার ব্যথা।

(ii) চুল শুকনো, প্রচুর পরিমাণে মাথার চুল উঠে যায়। মাথায় প্রচুর খুস্কি।

(iii) প্রায়ই চোখের প্রদাহ হয়।

(iv) অল্প বয়স্কদের প্রচুর পরিমাণে নাক হতে রক্তক্ষরণ হয়।

(v) তীব্র ঠান্ডা আবহাওয়ায়ও কোনও সর্দি লাগে না বা যতদিন এ রকম আবহাওয়া থাকে ঘন ঘন বা ক্লান্তিকর শুকনো অথবা প্রচুর পরিমাণে সর্দিস্রাব বা শ্লেষ্মাসহ লাগাতর অসুস্থতা।

(vi) ক্রমান্বয়ে অনেকদিন যাবৎ এক বা উভয় নাসারন্ধ্র বন্ধ থাকে। নাসারন্ধ্রের ক্ষততা, ন্যাজাল পলিপ, নাকে অস্বস্তিকর শুষ্কতা অনুভূতি।

(vii) মুখমন্ডল ফ্যাকাশে, চর্ম কুচকানো। আকস্মিক তাপ প্রবাহে মুখমন্ডল রক্তিম হয়ে উঠে, এতই লাল হয়ে যায় যে উৎকণ্ঠায়ও এতটা লাল হয় না।

(viii) রাতে বা সকালে মুখ শুকনো ও টক স্বাদযুক্ত থাকে।

(ix) জিহ্বা সাদা বা খুব ফ্যাকাশে এবং প্রায়ই ফাটা ফাটা থাকে।

(x) ঘন ঘন গল প্রদাহ ও স্বরভঙ্গ। গলায় প্রচুর গয়ের উঠে। থাইরয়েড গ্রন্থির স্ফীতিভাব।

(xi) ঘন ঘন শ্বাসকষ্টের আক্রমণ।

(xii) পেটে খালি খালি অনুভূতি। অতৃপ্ত ক্ষুধা- কিছুক্ষণ পর ক্ষুধাহীনতা। সকালে বমি বমিভাব। প্রায়ই পেট ফাঁপা। প্রায়ই বা প্রতিদিন সকালে (বিশেষত শিশুদের) পেটে কেটে যাবার মত ব্যথা।

(xiii) রান্না করা খাদ্যে, গরম খাবারে বিশেষত মাংসে অনিচ্ছা এবং দুধে অভক্তি।

(xiv) প্রায়ই গোলকৃমি বা অন্যান্য কৃমির উৎপাত, বিশেষত শিশুদের। পরবর্তীতে মলদ্বারে অসহ্যকর চুলকানি হয়।

(xv) মলদ্বারের শিরাগুলি জট পাকিয়ে যায়, মলের সাথে রক্ত পরে। মলসহ বা মল ছাড়াই আম যায়। মলদ্বারে চুলকানি। শক্ত মল, প্রায়ই আমযুক্ত থাকে।

(xvi) প্রস্রাব ঘন ঘন হয়ে থাকে।

(xvii) তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ খুবই ক্লান্তিকর। ঘুমের পর অবসন্নতা। স্বপ্ন- অস্বস্তিকর, আতঙ্কময় বা খুব প্রাণবন্ত স্বপ্ন।

(xviii) সকালে ঘুমের মধ্যে ঘাম। দিনের বেলায় একটুতেই, এমনকি সামান্য চলাফেরাতেও ঘাম বা ঘামহীনতা।

(xix) দুর্বল চর্ম, অতিসামান্য ক্ষতে পুঁজ হয়। হাত ও নিচের ঠোঁটের চর্ম ফাটে। হাত-পা, বাহু, উরু এবং সময়ে সময়ে বুকের চর্মের শুষ্কতা থাকে।

(xx) বৃদ্ধি- বিশ্রামে, রাতে, উত্তর ও উত্তর-পূর্ব বায়ু প্রবাহে, শীতকালে ও বসন্ত কালে বৃদ্ধি।

হ্রাস- চলাফেরায়, গ্রীষ্মকালে।

৩। প্রশ্ন ঃ সোরা বলতে কি বুঝ?

সোরার সংজ্ঞা ঃ

সোরা (Psora) শব্দটি মূল হীব্রু শব্দ 'সোরাট (Tsorat) থেকে উদ্ভব হয়ে গ্রীক এবং ল্যাটিন এর মাধ্যমে এসেছে। সোরার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে – চুলকনা বা সদৃশ কিছু চর্মরোগ, কোষ পোকা, খাদ, দোষ, অপবিত্রতা ইত্যাদি।

সোরা হচ্ছে একটি মায়াজম, যা রোগ সৃষ্টিতে সাহায্য করে বা রোগ প্রবণতা তৈরি করে।

৪। প্রশ্ন ঃ সোরার নির্দেশক লক্ষণ কি কি ? ১২, ১৪

বা, সোরার নির্দেশক লক্ষণ লিখ। ১০

সোরার নির্দেশক লক্ষণ ঃ

(i) অত্যন্ত সংবেদনশীল, অনুভূতিশীল, সতর্ক, চটপটে, নানা কল্পনায় মন পরিপূর্ণ কিন্তু কাজে পরিণত করার প্রবণতা নাই।

(ii) সামান্য পরিশ্রমে মানসিক ও শারীরিক ক্লান্তি আসে, দুঃখ ও শোক থেকে রোগের উৎপত্তি হয়।

(iii) স্মৃতিশক্তি দুর্বলতা, ভয়, হতাশা, উদ্বেগ, বিষন্ন।

(iv) চটপটে, ভীষণ চঞ্চলতা, সবসময় ব্যস্তবাগিস সময় খুব তাড়াতাড়ি বা খুব ধীরে কাটে।

(v) সহজেই আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়ে, আত্মবিশ্বাস প্রত্যাশা করে কিন্তু অক্ষম।

(vi) উদরাময়, প্রচুর পরিমাণ প্রস্রাব ও ঘাম নির্গত হলে রোগীর আরামবোধ।

(vii) চোখ বুজলে, হাঁটার সময়, যানবাহনে চড়লে, সমুদ্র ভ্রমণকালে বমি বমিভাব ও বমি এবং মাথাঘোরা।

(viii) খুস্কি, মাথার চর্মে শুষ্কতা সহ অত্যন্ত চুলকানি, চুল শুষ্ক, সহজে জট বাঁধে, মাথায় স্থানে স্থানে সাদা হয়ে যায়।

(ix) জিহ্বা সাদা বা খুব ফ্যাকাশে এবং প্রায়ই ফাটা ফাটা থাকে।

(x) ঘন ঘন গল প্রদাহ ও স্বরভঙ্গ। গলায় প্রচুর গয়ের উঠে। থাইরয়েড গ্রন্থির স্ফীতিভাব।

(xi) ঘন ঘন শ্বাসকষ্টের আক্রমণ।

(xii) পেটে খালি খালি অনুভূতি। অতৃপ্ত ক্ষুধা- কিছুক্ষণ পর ক্ষুধাহীনতা। সকালে বমি বমিভাব। প্রায়ই পেট ফাঁপা। প্রায়ই বা প্রতিদিন সকালে (বিশেষত শিশুদের) পেটে কেটে যাবার মত ব্যথা।

(xiii) রান্না করা খাদ্যে, গরম খাবারে বিশেষত মাংসে অনিচ্ছা এবং দুধে অভক্তি।

(xiv) প্রায়ই গোলকৃমি বা অন্যান্য কৃমির উৎপাত, বিশেষত শিশুদের। পরবর্তীতে মলদ্বারে অসহ্যকর চুলকানি হয়।

(xv) মলদ্বারের শিরাগুলি জট পাকিয়ে যায়, মলের সাথে রক্ত পরে। মলসহ বা মল ছাড়াই আম যায়। মলদ্বারে চুলকানি। শক্ত মল, প্রায়ই আমযুক্ত থাকে।

(xvi) প্রস্রাব ঘন ঘন হয়ে থাকে।

(xvii) তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ খুবই ক্লান্তিকর। ঘুমের পর অবসন্নতা। স্বপ্ন- অস্বস্তিকর, আতঙ্কময় বা খুব প্রাণবন্ত স্বপ্ন।

(xviii) সকালে ঘুমের মধ্যে ঘাম। দিনের বেলায় একটুতেই, এমনকি সামান্য চলাফেরাতেও ঘাম বা ঘামহীনতা।

(xix) দুর্বল চর্ম, অতিসামান্য ক্ষতে পুঁজ হয়। হাত ও নিচের ঠোঁটের চর্ম ফাটে। হাত-পা, বাহু, উরু এবং সময়ে সময়ে বুকের চর্মের শুষ্কতা থাকে।

(xx) বৃদ্ধি- বিশ্রামে, রাতে, উত্তর ও উত্তর-পূর্ব বায়ু প্রবাহে, শীতকালে ও বসন্ত কালে বৃদ্ধি।

হ্রাস- চলাফেরায়, গ্রীষ্মকালে।

৩। প্রশ্ন ঃ সোরা বলতে কি বুঝ?

সোরার সংজ্ঞা ঃ

সোরা (Psora) শব্দটি মূল হীব্রু শব্দ 'সোরাট (Tsorat) থেকে উদ্ভব হয়ে গ্রীক এবং ল্যাটিন এর মাধ্যমে এসেছে। সোরার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে – চুলকনা বা সদৃশ কিছু চর্মরোগ, কোষ পোকা, খাদ, দোষ, অপবিত্রতা ইত্যাদি।

সোরা হচ্ছে একটি মায়াজম, যা রোগ সৃষ্টিতে সাহায্য করে বা রোগ প্রবণতা তৈরি করে।

৪। প্রশ্ন ঃ সোরার নির্দেশক লক্ষণ কি কি ? ১২, ১৪

বা, সোরার নির্দেশক লক্ষণ লিখ। ১০

সোরার নির্দেশক লক্ষণ ঃ

(i) অত্যন্ত সংবেদনশীল, অনুভূতিশীল, সতর্ক, চটপটে, নানা কল্পনায় মন পরিপূর্ণ কিন্তু কাজে পরিণত করার প্রবণতা নাই।

(ii) সামান্য পরিশ্রমে মানসিক ও শারীরিক ক্লান্তি আসে, দুঃখ ও শোক থেকে রোগের উৎপত্তি হয়।

(iii) স্মৃতিশক্তি দুর্বলতা, ভয়, হতাশা, উদ্বেগ, বিষন্ন।

(iv) চটপটে, ভীষণ চঞ্চলতা, সবসময় ব্যস্তবাগিস সময় খুব তাড়াতাড়ি বা খুব ধীরে কাটে।

(v) সহজেই আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়ে, আত্মবিশ্বাস প্রত্যাশা করে কিন্তু অক্ষম।

(vi) উদরাময়, প্রচুর পরিমাণ প্রস্রাব ও ঘাম নির্গত হলে রোগীর আরামবোধ।

(vii) চোখ বুজলে, হাঁটার সময়, যানবাহনে চড়লে, সমুদ্র ভ্রমণকালে বমি বমিভাব ও বমি এবং মাথাঘোরা।

(viii) খুস্কি, মাথার চর্মে শুষ্কতা সহ অত্যন্ত চুলকানি, চুল শুষ্ক, সহজে জট বাঁধে, মাথায় স্থানে স্থানে সাদা হয়ে যায়।

(ix) সূর্যের আলো অসহ্য, খুব সংবেদনশীল তাতে চোখের ব্যথা হয় এবং চোখ বুজে যায়, প্রদাহ চোখের কোণে পুঁজের মত স্রাব, চুলকানি ও জ্বালা।

(x) কান থেকে অবিরত পাতলা দূর্গন্ধযুক্ত পুঁজ পড়ে, কর্ণমূলগ্রন্থি ফোলা, নানা রকম শব্দ, গুরগুরানি ও চুলকানি ইত্যাদি।

(xi) নাকে শুষ্কতা অনুভূতি, রক্তস্রাব, নাক বন্ধ, ঘ্রাণশক্তি অতি প্রবল বা দুর্বল ও লুপ্ত, সর্দি ঝরে, হাঁচি, ব্যথাপূর্ণ ফোঁড়া।

(xii) চেহারা মলিন, বিমর্ষ, মেটে বর্ণেরসহ চোখ কোটরাগত, ঠোঁট দুটি লাল বর্ণের, ফোলা জ্বালা করে।

(xiii) জ্বরে মুখমন্ডল খুব লালচে দেখায়, উত্তপ্ত ও উজ্জ্বল দেখায়।

(xiv) মুখের ভিতরের শ্লৈষ্মিকঝিল্লীতে প্রদাহ, দূর্গন্ধযুক্ত টক, মিষ্টি, পচা পুতিগন্ধময়, তিক্ত স্বাদ। রাতে বা সকালে মুখে শুষ্কতা অনুভূতি।

(xv) মিষ্টি, অম্ল, টকজাতীয় খাদ্যে আকাংখা, গরম খাদ্য ও পানীয়ে, ভাজা জাতীয় ও পাকা ফলের ইচ্ছা, সিদ্ধ খাদ্যে অনিচ্ছা।

(xvi) সমস্ত শরীরে ঝাঁকুনিসহ প্রচন্ড হৃদস্পন্দন, দুর্বলতা উদ্বেগ, ভীতি, পূর্ণতা ও ভার ভার অনুভূতি।

(xvii) সব সময় ক্ষুধার্ত, এমনকি পেট ভর্তি থাকলেও, পেটের মধ্যে পাথরের মত চাপবোধ, আহারের পর পেটের মধ্যে কম্প, ধড়ফড়ানি, গুড়গুড় কলকল শব্দ।

(xviii) মলদ্বারে চুলকানি, মলশক্ত, শুষ্ক, কোষ্ঠবদ্ধতা, নির্গমনে কষ্ট।

(xix) চর্মের বিশেষত্ব হল তীব্র চুলকানি ও জ্বালা, চুলকানি মধ্যরাতের আগে, বিছানার গরমে, পোশাক পরিবর্তনে তা খুব অসহনীয় হয়।

(xx) স্বপ্ন–দুঃখদায়ক, আতংকজনক, উদ্বেগপূর্ণ, কামোদ্দীপক দেখে।

(xxi) দাঁড়ালে, ঘরের উত্তাপে, খাওয়ার পর, পূর্ণিমায়, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত, চর্মরোগ ও স্রাব চাপা পড়লে বৃদ্ধি।

(xxii)হ্রাস- হাঁটলে, শুয়ে থাকলে, বিশ্রামে, ধীরে সঞ্চালনে, তাপে, চর্মরোগ ও স্রাব পুনঃপ্রকাশিত হলে।

৫। প্রশ্ন ঃ সোরার মানসিক লক্ষণ বর্ণনা কর।

মানসিক লক্ষণাবলী ঃ (i) অনুভূতিশীল, সতর্ক, চটপটে, নানা কল্পনায় পরিপূর্ণ কিন্তু তা কাজে পরিণত করার প্রবণতা নেই।

(ii) ভ্রান্ত বা বন্ধ্য দার্শনিক, সামান্য পরিশ্রমে মানসিক ও শারীরিক ক্লান্তি আসে।

(iii) দুঃখ ও শোক থেকে রোগের উৎপন্ন হয়, উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ, আত্মবিশ্বাসহীন এবং মৃত্যু, অন্ধকার, একাকীত্ব ও ব্যর্থতার ভয়।

(iv) বর্তমান অবস্থা, পরিবেশ, আর্থিক অবস্থা ও বিবাহিতা জীবনে অতৃপ্ত। (v) অস্থিরতা বর্তমান।

৬। প্রশ্ন ঃ সোরার ধাতুগত লক্ষণসমূহ লিখ।

সোরার ধাতুগত লক্ষণসমূহ ঃ

(i) চেহারা মলিন, বিমর্ষ, মেটে বর্ণেরসহ চোখ কোটরাগত, ঠোঁট দুটি লাল বর্ণের, ফোলা জ্বালা করে।

(ii) অত্যন্ত সংবেদনশীল, অনুভূতিশীল, সতর্ক, চটপটে, নানা কল্পনায় মন পরিপূর্ণ কিন্তু কাজে পরিণত করার প্রবণতা নাই।

(iii) সামান্য পরিশ্রমে মানসিক ও শারীরিক ক্লান্তি আসে।

(iv) চটপটে, ভীষন চঞ্চলতা, সবসময় ব্যস্তবাগিস সময় খুব তাড়াতাড়ি বা খুব ধীরে কাটে।

(v) খুস্কি, মাথার চর্মে শুষ্কতা সহ অত্যন্ত চুলকানি, চুল শুষ্ক, সহজে জট বাঁধে, মাথার চুল স্থানে স্থানে সাদা হয়ে যায়।

(vi) কান থেকে অবিরত পাতলা দূর্গন্ধযুক্ত পুঁজ পড়ে, কর্ণমূলগ্রন্থি ফোলা, নানা রকম শব্দ, গুরগুরানি ও চুলকানি ইত্যাদি।

(vii) নাকে শুষ্কতা অনুভূতি, রক্তস্রাব, নাক বন্ধ, ঘ্রাণশক্তি অতি প্রবল বা দুর্বল ও লুপ্ত, সর্দি ঝরে, হাঁচি, ব্যথাপূর্ণ ফোঁড়া।

(viii) চর্মের বিশেষত্ব হল তীব্র চুলকানি ও জ্বালা, চুলকানি মধ্যরাতের আগে, বিছানার গরমে, পোশাক পরিবর্তনে তা খুব অসহনীয় হয়।

৭। প্রশ্ন ঃ সোরা কি? কেন ইহাকে সকল রোগ সৃষ্টির জননী বলা হয়? ১৬, ১৭

বা, "সোরা সকল রোগের জননী"- আলোচনা কর। ০৮

বা, প্রবণতা সৃষ্টিতে সোরার ভূমিকা আলোচনা কর।

সোরা সকল রোগের জননী ঃ

মহাত্মা ডাঃ হ্যানিম্যান অর্গানন অব মেডিসিন গ্রন্থের ৫নং অনুচ্ছেদে রোগের কারণ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তিনি রোগের কারণকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। (i) মূল কারণ অর্থাৎ সোরা, সিফিলিস, সাইকোসিস। (ii) উত্তেজক বা আনুসাঙ্গিক কারণ। তিনি সকল দুরারোগ্য রোগের মূলকারণ হিসাবে সোরাকে চিহ্নিত করছেন। সোরা প্রথমে মানুষের মনকে কলুষিত করে তারপর চর্ম রোগ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। সোরা মানুষের মনকে বিকৃত করে, কুমনন সৃষ্টি করে এবং খারাপ কাজের জন্য মানসিকতা সৃষ্টি করে। ফলে সিফিলিস, সাইকোসিস মায়াজম দেহে প্রবেশ করার সুযোগ করে দেয়। যেমন বিকশিত সোরা কোন ব্যক্তির মানসিকতা কুলষিত করে দূষিত সঙ্গমের জন্য আকাংখা সৃষ্টি করে এবং দূষিত সঙ্গমের ফলে দেহে জননতন্ত্রে গনোরিয়ার জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়। জীবাণু সংক্রমণের পর গনোরিয়ার লক্ষণাবলী প্রকাশিত হয়। এ গনোরিয়াকে বিসদৃশ পদ্ধতিতে চিকিৎসার ফলে জীবাণু চাপা পড়ে সাইকোসিস মায়াজম সৃষ্টি হয়। অনুরূপভাবে সিফিলিস রোগ চাপা পড়ে সিফিলিস মায়াজম সৃষ্টি হয়। সোরা, সিফিলিস এর সাথে মিলিত হয়ে অথবা সোরা সাইকোসিসের সাথে মিলিত হয়ে মিশ্র মায়াজম সৃষ্টি করে এবং সোরা, সিফিলিস ও সাইকোসিস একত্রে মিলিত হয়ে টিউবারকুলার মায়াজম সৃষ্টি করে। এ মিশ্র মায়াজম অত্যন্ত ভয়ংকর এবং বংশ পরম্পরায় পৃথিবীতে যুগযুগ ধরে মানবের ক্ষতি সাধন করে। সুতরাং সোরা মায়াজম যদি মানুষের মানুষিকতা পরিবর্তন না করত তা হলে সিফিলিস ও সাইকোসিস কখনও মানব দেহে সংক্রমিত হতে পারত না।

অতএব উপরিউক্ত আলোচনা থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায়, সোরা সকল রোগের জননী।

৮। প্রশ্ন ঃ কিভাবে সোরার উৎপত্তি হয় ?
বা, সোরার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ কিভাবে হয়?

(i) সংক্রমণ ঃ চুলকনার ছোট ছোট ফুস্কুড়িসমূহের রসের মধ্যেই সোরার জীবাণু থাকে। এ রস যদি চর্মের সংস্পর্শে আসে তবে চুলকনা জীবাণু ঐ শরীরের ভিতরে প্রবেশ করে। প্রায় সব ধরনের পারিপার্শ্বিকতায় যে কোনও মানুষ এই রসের সংস্পর্শে আক্রান্ত হতে পারে।

(ii) আভ্যন্তরীণ বিকাশ ঃ
চর্মের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে এরা স্থানিক হিসাবে থাকে না। প্রথমে কিছুদিন চর্মের উপর কোনও ফুস্কুড়ি বা চুলকানি থাকে না। চর্ম অপরিবর্তনীয় ও স্বাভাবিক স্বাস্থ্যব্যঞ্জক থাকে। কিছুদিন পর যখন তার ক্রিয়া সমগ্র সত্ত্বার উপর আভ্যন্তরিক বিকাশ লাভ করে তখনই স্থানীয় লক্ষণ প্রকাশ করে থাকে।

(iii) বাহ্যিক রোগের বিকাশ ঃ
প্রাথমিক বিন্যাস- চুলকনা জীবাণুর পরিপূর্ণ আভ্যন্তরীণ বিকাশ লাভের পর তা চর্মের উপরে, ফুস্কুড়িযুক্ত চুলকনা হিসাবে বিকাশ লাভ করে। সোরা মায়াজমের রোগ লক্ষণ প্রকাশকাল ৬ থেকে ১৪ দিন। এ সময় কাল অতিবাহিত হবার পর সামান্য বা খুব বেশি হলে বিকালের দিকে শীত শীতভাব করে এবং রাতে সামান্য তাপ দিয়ে ও ঘাম হয়ে এই চুলকনার ফুস্কুড়িসমূহ চর্মে প্রকাশ পায়। একদম শুরুতে খুব অল্পই দেখা দেয়- যেন ত্বকের উত্তাপের জন্য হয়েছে। ধীরে ধীরে চর্মের উপর ছড়িয়ে পরে। প্রথম দিকে সংক্রামিত স্থানেই প্রকাশ পায়। এসব উদ্ভেদগুলিতে যে চুলকানি হয় তা ইন্দ্রিয়সুখের মত অনুভূতিযুক্ত। রোগীকে বাধ্য করায় খুব জোরে ঘষতে বা নখ দিয়ে চুলকাতে। এভাবে চুলকানোর পর কিছুক্ষণ রোগী উপশম পায় বটে কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাতে জ্বালা থাকে। সন্ধ্যা থেকে প্রায় মাঝরাত পর্যন্ত ঘন ঘন চুলকানি হয় এবং আরও বেশি অসহ্যকর করে তোলে।

প্রথমদিকে চুলকনার ফুস্কুড়িগুলিতে পাতলা পানির মত রস থাকে যা অচিরেই পুঁজে পরিণত হয়ে ফুস্কুড়ির আগায় জমা হতে থাকে। অসম্ভব চুলকানির জন্য ফস্কুড়িগুলি ফেটে গিয়ে রস বেরিয়ে গিয়ে রোগীর চারপাশকে, এমনকি অন্যান্য সুস্থ মানুষদেরও সংক্রমিত করে তোলে। যতদিন পর্যন্ত এসব
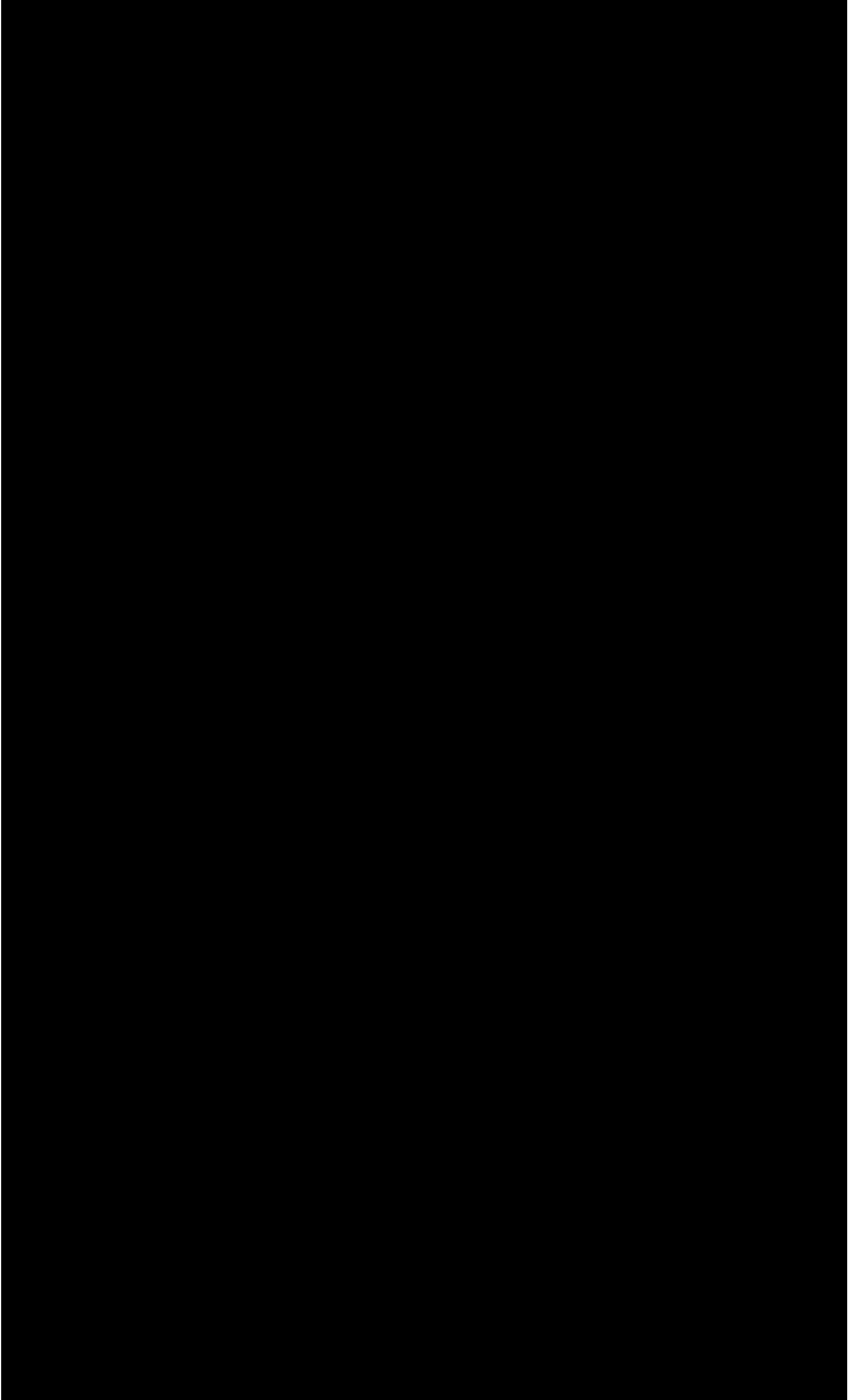
সিফিলিস
(Syphilis)

১। প্রশ্ন ঃ সিফিলিস কি ? ১০

সিফিলিস এর সংজ্ঞা ঃ

সিফিলিস রোগ বিসদৃশ প্রক্রিয়া চাপা দেয়ার ফলে দেহের মধ্যে যে প্রভাব সৃষ্টি হয়, তাকে সিফিলিস মায়াজম বলে।

২। প্রশ্ন ঃ কিভাবে সিফিলিস মায়াজম সৃষ্টি হয়।

বা, কিভাবে সিফিলিটিক মায়াজম সৃষ্টি হয় ?

ট্রিপোনেমা প্যালিডাম (Treponema pallidum) নামক ব্যাকটেরিয়া পুরুষ বা মহিলা জননতন্ত্রে সংক্রামিত হয়ে সিফিলিস রোগ উৎপন্ন করে। ইহা দ্বারা জননতন্ত্রে পুঁজ উৎপত্তিসহ বিভিন্ন রোগ লক্ষণ প্রকাশিত হয়। এ সিফিলিস রোগকে বি-সদৃশ চিকিৎসা পদ্ধতির সাহায্যে চাপা দিলে সিফিলিস মায়াজম সৃষ্টি হয়। চিররোগের কারণ ও প্রকৃত আরোগ্য জন্য গবেষণা করতে গিয়ে মহাত্মা ডাঃ হ্যানিম্যান ইহা আবিষ্কার করেন।

৩। প্রশ্ন ঃ সিফিলিস মায়াজমের মানসিকতা লিখ।

বা, সিফিলিস দোষের মানসিক লক্ষণাবলি লিখ।

সিফিলিস দোষের মানসিক লক্ষণাবলি ঃ

(i) বোকা, স্থুলবুদ্ধির, একগুঁয়ে, বিষন্ন, বদ্ধমূল ধারনা, কোন উদ্দেশ্য বা যুক্তি খুঁজে পায় না কারও সঙ্গে মেলামেশার।

(ii) আত্মহত্যার প্রবণতা, নিজেকে ধ্বংস করতে চায়।

(iii) পাপী, সমাজের ক্ষতিকারক মস্তিষ্ক বিকৃতি।

(iv) ঠান্ডা মাথায় মূল্যবান বস্তু ধ্বংস করে। ধর্মমত ধ্বংসকারী।

৪) প্রশ্ন ঃ সিফিলিসের পরিচায়ক লক্ষণ লিখ। ১০
বা, সিফিলিসের কয়েকটি প্রধান চরিত্রগত লক্ষণ লিখ। ১৬, ১৭
সিফিলিস মায়াজমের পরিচায়ক লক্ষণ ঃ

(i) বোকা, স্থুলবুদ্ধি, একগুয়ে, বিষন্ন, বদ্ধমূল ধারনা, কোন উদ্দেশ্য বা যুক্তি খুঁজে পায় না কারও সাথে মেশায়।

(ii) ঠান্ডা মাথায় মূল্যবান দ্রব্য ধ্বংস করে, নিজেকে ধ্বংস করতে চায়, আত্মহত্যার প্রবণতা।

(iii) ধীর প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন, জড়বুদ্ধি সম্পন্ন, দয়ামায়াহীন, ঈর্ষাপরায়ন।

(iv) মুখমন্ডল তৈলাক্ত দেখায়, মুখে ধাতব স্বাদ, বিশেষতঃ তামাটে ধাতুর ন্যায় স্বাদ।

(v) চুলকানিবিহীন চর্মোদ্ভেদ ও পচনের প্রবণতারূপে চর্মের উপর আত্মপ্রকাশ করে, ইহার মামড়ি বা শক্ত সর্বদা পুরু ও ভারী থাকে।

(vi) ইহার রোগীর নখ কাগজের মত পাতলা, দেখতে ঠিক চামচের ন্যায় এবং সহজেই বেঁকে যায়।

(vii) চোখের অস্বাভাবিক গঠন বা বিকৃতি, লেন্সের ক্ষত, পাতার ক্ষত, কৃত্রিম আলো সহ্য করতে পারে না। গ্রন্থিবাতজনিত চোখে রোগ। রাত্রে, উত্তাপে লক্ষণাবলী বৃদ্ধি।

(viii) নাক দিয়ে রক্ত পড়ে, সবুজ বা কালো চাপচাপ মামড়ি ঘ্রাণশক্তি ও নাকের হাড় নষ্ট হয়ে যায়।

(ix) কানের ছিদ্র পথে ক্ষত, পুরু দূর্গন্ধযুক্ত পূঁজ, ইহার পাশে ফাটা ও পিছনে একজিমা।

(x) ঠান্ডা খাবার খেতে ভালবাসে, মাংসে অনীহা।

(xi) উদরাময়ে যেন শরীরের সব কিছু নিংড়ে বেরিয়ে যায়, বিশেষতঃ শিশু কলেরায়। রাতে বৃদ্ধি।

সাইকোসিস (Sycosis)

১। প্রশ্ন ঃ সাইকোসিস কি? ১৩

সাইকোসিস (Sycosis) ঃ

সাইকোসিস হচ্ছে ডাঃ হ্যানিম্যানের আবিষ্কৃত ক্রণিক তিনটি মায়াজমের একটি যা সর্বাপেক্ষা মারাত্মক। ইহার ধ্বংশাত্মক প্রকৃতি মানুষের বিস্মৃতি, ভুলো মন, অমনোযোগী। কথা ধীরে বলে, দ্রুত উত্তর দিতে অক্ষম, কথা খুজে পায় না। ব্যবহারেও অসমন্বয় যথা– সত্যকথা বলে না। অত্যধিক সন্দেহ পরায়ন হিংসটে, রাগী। রুক্ষ ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির। গোপন করা স্বভাব।

২। প্রশ্ন ঃ গণোরিয়া হতে কিভাবে সাইকোসিসের উৎপত্তি হয় ?

গনোরিয়া হতে সাইকোসিস এর উৎপত্তি ঃ

নাইসেরিয়া গনোরি (*Neisseria gonorrhoeae*- A gram negative diplococcus) নামক ব্যাকটেরিয়া পুরুষ বা মহিলা জননতন্ত্রে সংক্রমিত হয়ে গনোরিয়া রোগ উৎপন্ন করে। ইহা দ্বারা জননতন্ত্রে পুঁজ উৎপত্তিসহ বিভিন্ন রোগ লক্ষণ প্রকাশিত হয়। এ গনোরিয়া স্রাবকে বি-সদৃশ চিকিৎসা পদ্ধতির সাহায্যে চাপা দিলে সাইকোসিস মায়াজম সৃষ্টি হয়। চিররোগের কারণ ও প্রকৃত আরোগ্য জন্য গবেষণা করতে গিয়ে মহাত্মা ডাঃ হ্যানিম্যান ইহা আবিষ্কার করেন।

৩। প্রশ্ন ঃ সাইকোসিসের ধাতুগত লক্ষণসমূহ লিখ।

সাইকোসিসের ধাতুগত লক্ষণসমূহ ঃ

(i) সাইকোটিকের সর্বক্ষেত্রেই অসমন্বয় দেখা যায়। অস্বাভাবিক অঙ্গ বৃদ্ধি, যথা– টনসিল, টিউমার, গ্ল্যান্ড ইত্যাদিসহ আঁচিল, কন্ডাইলোমেটা, ফাইব্রাস টিউমার বা ফাইব্রোসিস দেখা দেয়।

(ii) দৈহিক গঠনগত অস্বাভাবিকতা, যেমন- হাত-পায়ে আঙ্গুলের সংখ্যা কম বা বেশি, হৃদপিন্ডের ভাল্বসমূহের ক্ষয় বা অস্বাভাবিকতা।

(iii) ছোট বৃত্তাকার একাংশে টাক। চুলে আঁশটে গন্ধ, শিশুদের গায়ে টক গন্ধময়। মাথার চুল বৃত্তাকার হয়ে উঠে যায় এবং দাড়ি ঝরে পড়ে।
(iv) নাকের ক্ষতবিহীন ঘ্রানশক্তিহীনতা। নাকের মধ্যে আঁশটে গন্ধ। মুখগহ্বরে মাছের স্বাদের মতো বিস্বাদ।
(v) চর্ম- শক্ত পিন্ড আকারের অথচ তাতে কোন ব্যথা বা চুলকানি থাকে না। আঁচিল, টিউমার, দাড়ির একজিমা দেখা যায়। মুখের চর্ম তৈলাক্ত।
(vi) নখ- অসমান, ভঙ্গুর, লম্বালম্বি উঁচু রেখাযুক্ত, বিকৃত, কুগঠিত।

৪। প্রশ্ন ঃ সাইকোসিসের মানসিক লক্ষণাবলী লিখ।

সাইকোসিসের মানসিক লক্ষণাবলী ঃ

(i) বদমেজাজী। খিটখিটে। রাগের পর খিচুনি।
(ii) আবহাওয়া পরিবর্তনের সময় মন ভারাক্রান্ত ও আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়ে।
(iii) সন্দেহবাতিক। যখন আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায় তখন সন্দেহপ্রবণতা ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে।
(iv) সে যা বলেছিল বা করেছিল তা পুনরুক্তি করতে থাকে। যা বলতে বা করতে চেয়েছিল তা পেরেছে কিনা সেবিষয়ে সন্দিগ্ধ হয়েই পুনরুক্তি করে। সে যা বুঝাতে চেয়েছিল তা অন্যরা ভুল বুঝেছে বলে সন্দেহ করে।
(v) যখন এই সন্দেহ কোনও বন্ধুর প্রতি ঘটে তখন চরম প্রকৃতির ঈর্ষায় পর্যবসিত হয়, কারণ সে মনে করে বন্ধুরা তাকে সঠিকভাবে বুঝতেই পারেনি।
(vi) সবকিছু গোপন করার আশ্চর্য্য রকমের প্রবণতা।
(vii) কিছু লিখতে বা বলতে গেলে একই কথা বারংবার পুনরাবৃত্তি করে- তার সন্দেহ হয় যে সে তার বক্তব্যটি সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারেনি।
(viii) কোনও একটি বিষয় নিয়ে সে গভীরভাবে ভাবতে থাকে।
(ix) উন্মুক্ত অপরাধী ও অধিকাংশ আত্মহত্যাকারীর ভিত্তি হলো সোরা ও সাইকোসিসের যুগলবন্ধী।
(x) একমাত্র বিশেষ কয়েকটি বিষয়ে অন্যমনস্কতা।

৫। প্রশ্ন ঃ সাইকোসিস কি? চিকিৎসাক্ষেত্রে মানসিক লক্ষণের গুরুত্ব আলোচনা কর। ১৩

সাইকোসিস (Sycosis) ঃ

সাইকোসিস হচ্ছে ডাঃ হ্যানিম্যানের আবিষ্কৃত ক্রনিক তিনটি মায়াজমের একটি যা সর্বাপেক্ষা মারাত্মক। ইহার ধ্বংশাত্মক প্রকৃতি মানুষের বিস্মৃতি, ভুলো মন, অমনোযোগী। কথা ধীরে বলে, দ্রুত উত্তর দিতে অক্ষম, কথা খুজে পায় না। ব্যবহারেও অসমন্বয় যথা– সত্যকথা বলে না। অত্যধিক সন্দেহ পরায়ন, হিংসুটে, রাগী। রুক্ষ ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির। গোপন করা স্বভাব।

চিকিৎসাক্ষেত্রে মানসিক লক্ষণের গুরুত্ব আলোচনা ঃ রোগীর মানসিক লক্ষণই বেশির ভাগ সদৃশ ঔষধ নির্বাচনের প্রধান অবলম্বন হিসাবে পরিগণিত হয়। কারণ খুব নিশ্চিতভাবে নির্দেশক লক্ষণ বলেই তা কোন যথার্থ অনুসন্ধানী চিকিৎসকের দৃষ্টি এড়াতে পারে না।

সর্বপ্রকার রোগের প্রধান বৈচিত্র স্বরূপ এ প্রকৃতিগত এবং মানসিক বিকৃতি সন্বন্ধে রোগ আরোগ্যকারী বস্তুসমূহের স্রষ্টাও বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন, কারণ পৃথিবীতে এমন কোন ঔষধ নাই যা পরীক্ষাকারী সুস্থ ব্যক্তির প্রকৃতিতে ও মানসিক অবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন করতে অপারগ। প্রত্যেকটি ঔষধই বিভিন্নভাবে ইহা করে থাকে।

অতএব প্রত্যেকটি রোগীর ক্ষেত্রে, অন্যান্য লক্ষণের সংঙ্গে রোগীর মানসিক ও প্রকৃতিগত পরিবর্তন লক্ষ্য না করে এবং রোগীর যন্ত্রণা দূর করার জন্য অন্যান্য সদৃশ লক্ষণের সহিত রোগীর স্বভাব ও মানসিক অবস্থার সদৃশ রোগ সৃষ্টিকারী শক্তি ঔষধরাজী হতে নির্বাচন না করলে কখনও প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে অর্থাৎ সদৃশ বিধান মতে আরোগ্য সাধন করতে সমর্থ হবে না। ডাঃ হ্যানিম্যান হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় রোগীর মানসিক লক্ষণের সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

৬। প্রশ্ন ঃ সাইকোসিস মায়াজমের নির্দেশক লক্ষাবলী লিখ।

সাইকোসিসের নির্দেশক লক্ষণাবলী ঃ

(i) বিস্মৃতি, ভুলো মন, অমনোযোগী, কথা ধীরে বলে, দ্রুত উত্তর দিতে অক্ষম, কথা খুজে পায় না।

(ii) ব্যবহারেও অসমন্বয় যথা– সত্যকথা বলে না, অত্যধিক সন্দেহ পরায়ন, হিংসুটে, রাগী, রুক্ষ ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির, গোপন করা স্বভাব।

(iii) চোখ বন্ধ করলে মাথা ঘোরে তাকালে ঠিক হয়ে যায়, মাথার শীর্ষদেশে যন্ত্রণা, বিষন্নতাসহ কপালের দিকে যন্ত্রণা, দেহ ঠান্ডা। কাজকর্ম ও যান-বাহন আরোহনে বৃদ্ধি। সঞ্চালনে উপশম।

(iv) অল্প বয়সে চুল পাকে, অত্যাধিক চুল পাকে। মাথার চামড়ায় স্থানে স্থানে ছোট গোল আকারে চুল উঠে যায়। মাথায় আঁশটে গন্ধ।

(v) চক্ষু রোগ – প্রচুর ঘন পুঁজ জন্মায় এবং পুঁজ বের হয়।

(vi) কর্ণ – জমাট বাঁধা পিন্ড শিশুর কানের মধ্যে দেখা যায়। সাইকোটিক পিতামাতার সন্তানের এরূপ হয়।

(vii) নাকের ক্ষতবিহীন ঘ্রানশক্তিহীনতা। নাকের মধ্যে মাছের আঁশটে গন্ধ।

(viii) পাকস্থলী – কোন প্রকার খাদ্য সহ্য হয় না। পেটের শূলব্যথা চাপে উপশম। পেট চেপে ধরলে শূলব্যথার উপশম।

(ix) মলদ্বার, মল – যন্ত্রণাসহ পাতলা মল তোড়ে বেরিয়ে আসে, গন্ধযুক্ত, ক্ষতকর, সবুজবর্ণের, পেটে সর্বদা খামছে ধরা যন্ত্রণা।

(x) প্রস্রাব- শিশু মূত্রত্যাগ কালে চিৎকার করে উঠে।

(xi) হৃৎপিন্ড- বাত থেকে হৃদরোগ দেখা যায়। প্রত্যক্ষ অনুভূত লক্ষণ বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। হৃৎকম্প ও শ্বাসঃকষ্ট হয় মাঝে মাঝে। চলাফেরায় যন্ত্রণা। যানবাহনে ও মৃদু ব্যায়ামে উপশম।

৭। প্রশ্ন ঃ সিফিলিসের সহিত সাইকোসিসের মানসিক লক্ষণাবলী তুলনা কর।

সিফিলিসের সহিত সাইকোসিসের মানসিক লক্ষণাবলী তুলনা ঃ

সিফিলিসের মানসিক লক্ষণাবলী ঃ

(i) বোকা, স্থুলবুদ্ধির, একগুঁয়ে, বিষন্ন, বদ্ধমূল ধারনা, কোন উদ্দেশ্য বা যুক্তি খুঁজে পায় না কারও সঙ্গে মেলামেশার।

(ii) আত্নহত্যার প্রবণতা, নিজেকে ধ্বংস করতে চায়।

(iii) পাপী, সমাজের ক্ষতিকারক মস্তিষ্কবিকৃতি।

(iv) ঠান্ডা মাথায় মূল্যবান বস্তুকে ধ্বংস করে। ধর্মমত ধ্বংসকারী।

সাইকোসিসের মানসিক লক্ষণ –

(i) মনোস্তরে নানা বিকৃতি, বিস্মৃতি, ভুলো মন, অমনোযোগী।

(ii) কথা ধীরে বলে, দ্রুত উত্তর দিতে অক্ষম, কথা খুজে পায় না।

(iii) ব্যবহারে অসমন্বয়। যথা– সত্যকথা বলে না, অত্যধিক সন্দেহ পরায়ন, হিংসুটে।

(iv) রাগী, রুক্ষ ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির, গোপন করা স্বভাব।

৮। প্রশ্ন ঃ রোগের উদ্দীপক ও পরিপোষক কারণ কাকে বলে ? ১২

রোগের উদ্দীপক ও পরিপোষক কারণ ঃ

বিজ্ঞানী ডাঃ হ্যানিম্যান, "অর্গানন অব মেডিসিন" গ্রন্থের ৫ নং অনুচ্ছেদে রোগের কারণ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যে সকল আনুসাঙ্গিক কারণে রোগের উৎপত্তি ও বিস্তার লাভ সহায়তা করে, তাকে রোগের উদ্দীপক ও পরিপোষক কারণ বলে। অর্থাৎ হঠাৎ কোন কারণে যদি কোন ব্যক্তি অসুস্থ হয়, তাকে রোগের উত্তেজক কারণ বলে।

রোগের উদ্দীপক ও পরিপোষক কারণসমূহ ঃ

(i) বংশগত কারণে, (ii) বয়স, (iii) লিঙ্গ (পুরুষ/মহিলা), (iv) ঋতু, (v) আবহাওয়া, (vi) পেশা, (vii) পারিবারিক অবস্থা, (viii) সামাজিক অবস্থা, (ix) ব্যক্তিগত অভ্যাস, (x) শারিরীক গঠন

(xi) পুষ্টির অবস্থা (xii) বাসস্থান (xiii) বিভিন্ন ধরনের মাইক্রোঅর্গানিজম।

রোগের উদ্দীপক ও পরিপোষক কারণের, উদাহরণ- অতিরিক্ত আহারের কারণে বদহজমজনিত পেটে ব্যথা, দূষিত পানি পান করার ফলে ডায়েরিয়া, প্রচন্ড রৌদ্রে হাটার কারণে জ্বর আসা, অতিরিক্ত ঠান্ডা খাদ্য ও পানীয় গ্রহনের গলা ব্যথা প্রভৃতি।

৯। প্রশ্ন ঃ স্থায়ী উপবিষ কিভাবে আত্মপ্রকাশ করে ? ১২, ১৪

স্থায়ী উপবিষ নিম্নলিখিতভাবে আত্মপ্রকাশ করে ঃ

বিজ্ঞানী ডাঃ হ্যানিম্যান, "অর্গানন অব মেডিসিন" গ্রন্থের ৭৯-৮১ নং অনুচ্ছেদে স্থায়ী উপবিষসমূহ আত্মপ্রকাশ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

সোরা প্রথমে মানুষের মনকে কলুষিত করে তারপর চর্ম রোগ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। সোরা মানুষের মনকে বিকৃত করে, কুমনন সৃষ্টি করে এবং খারাপ কাজের জন্য মানসিকতা সৃষ্টি করে। ফলে সিফিলিস, সাইকোসিস মায়াজম দেহে প্রবেশ করার সুযোগ করে দেয়। যেমন- বিকশিত সোরা কোন ব্যক্তির মানসিকতা কুলষিত করে দূষিত সঙ্গমের জন্য আকাংখা সৃষ্টি করে এবং দূষিত সঙ্গমের ফলে দেহে জননতন্ত্রে গনোরিয়ার জীবানু দ্বারা আক্রান্ত হয়। জীবানু সংক্রমণের পর গনোরিয়ার লক্ষণাবলী প্রকাশিত হয়। এ গনোরিয়াকে বিসদৃশ পদ্ধতিতে চিকিৎসার ফলে জীবাণু চাপা পড়ে সাইকোসিস মায়াজম সৃষ্টি হয়। অনুরূপভাবে সিফিলিস রোগ চাপা পড়ে সিফিলিস মায়াজম সৃষ্টি হয়। সোরা, সিফিলিস এর সাথে মিলিত হয়ে অথবা সোরা, সাইকোসিসের সাথে মিলিত হয়ে মিশ্র মায়াজম সৃষ্টি করে এবং সোরা, সিফিলিস ও সাইকোসিস একত্রে মিলিত হয়ে টিউবারকুলার মায়াজম সৃষ্টি করে। এ মিশ্র মায়াজম অত্যন্ত ভয়ংকর এবং বংশ পরম্পরায় পৃথিবীতে যুগযুগ ধরে মানবের ক্ষতি সাধন করে।

১০। প্রশ্ন ঃ ধাতু প্রকৃতি বলতে কি বুঝ ?

ধাতু প্রকৃতি এর সংজ্ঞা ঃ

আকৃতি ও প্রকৃতিগত কিছু বিশিষ্টতা নিয়ে প্রত্যকটি মানুষ এ পৃথিবীতে আসে। এ সকল বৈশিষ্ট্যাবলী তার দৈহিক ও মানসিক গড়ন, দেহতন্ত্রের ক্রিয়া ধারা এবং পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী সার্বদৈহিক প্রতিক্রিয়ার ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে। জন্মসূত্রে প্রাপ্ত প্রত্যেকটি ব্যক্তি বিশেষের এ সকল বৈশিষ্ট্যাবলীকে ধাতুপ্রকৃতি বলে। অর্থাৎ ধাতু প্রকৃতি বলতে রোগীর দেহতন্ত্রে এমন এক অবস্থা বুঝায় যার উপর তার দৈহিক ও মানসিক গড়ন ও পারিপার্শ্বিক প্রভাবের প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি বহুলাংশে নির্ভর করে।

১১। প্রশ্ন ঃ ধাতু প্রকৃতি কত প্রকার ও কি কি ?

ধাতু প্রকৃতির প্রকারভেদ ঃ

ধাতু প্রকৃতি প্রধানতঃ চার প্রকার। যথা-

(i) পিত্ত প্রধান (Bilious),
(ii) শ্লেষ্মা প্রধান (Phlegmatic),
(iii) রক্ত প্রধান (Sanguinous),
(iv) স্নায়ু প্রধান (Nervous)|

(i) পিত্ত প্রধান (Bilious) ঃ পিত্ত প্রধান ধাতুতে লিভারের ক্রিয়ার বিশৃংখলা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

(ii) শ্লেষ্মা প্রধান (Phlegmatic) ঃ শ্লেষ্মা প্রধান ধাতুতে প্রতিক্রিয়া শক্তির খুবই অভাব দেখা দেয়।

(iii) রক্ত প্রধান (Sanguinous) ঃ রক্ত প্রধান ধাতুতে প্রতিক্রিয়া শক্তি অত্যন্ত প্রবল থাকে।

(iv) স্নায়ু প্রধান (Nervous) ঃ স্নায়ু প্রধান ধাতু প্রধানতঃ উত্তেজনা প্রবণ হয় এবং দেহের যাবতীয় ক্রিয়া অতি দ্রুত চলে।

১২। প্রশ্ন ঃ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় রোগীর ধাতুগত বৈশিষ্ট্যের গুরুত্ব লিখ।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় রোগীর ধাতুগত বৈশিষ্ট্যের গুরুত্ব ঃ

যে লক্ষণগুলি রোগীর বিশেষ ধাতুপ্রকৃতির পরিচয় নির্দেশ করে সেগুলিকে ধাতুগত লক্ষণ বলে। চিররোগের চিকিৎসা ক্ষেত্রে এ ধরনের লক্ষণের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। যাদের আপাত দৃষ্টিতে বিশেষ কোন রোগ আছে বলে মনে হয় না। অথচ সামান্য কারণেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। এ ধরনের ক্ষেত্রে ধাতুগত লক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। যেমন, প্রায়ই সর্দ্দিতে ভোগা।

মহাত্মা ডাঃ হ্যানিম্যান "অর্গানন অব মেডিসিন" গ্রন্থে লক্ষণের গুরুত্বের কথা বলতে গিয়ে ধাতুগত লক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যেহেতু হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি লক্ষণ ভিত্তিক সেহেতু ধাতুগত লক্ষণ রোগী চিকিৎসায় অপরিসীম ভূমিকা রাখে। প্রতিটি রোগী একে অন্য থেকে গঠনগত দিক দিয়ে আলাদা। সুতরাং ধাতুগত বৈশিষ্ট্যের গুরুত্ব না দিলে হোমিওপ্যাথিতে রোগী আরোগ্য করা সম্ভব নয়। ধাতুগত লক্ষণ রোগীর দৈহিক আকৃতিকে বুঝায় অর্থাৎ রোগী মোটা না চিকন, থলথলে না সুগঠিত, চুলের বর্ণ, চোখের বর্ণ, লম্বা না খাটো ইত্যাদি।

অতএব ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় মানসিক লক্ষণের পরে ধাতুগত লক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম ও অপরিহার্য।

চতুর্থ অধ্যায়

রোগীলিপি অংকনে চিকিৎসকের গুণাবলী ও রোগীলিপি গ্রহণ প্রণালী ঃ

অনুচ্ছেদ - ৮৩- ৯৯

১। প্রশ্ন ঃ রোগীলিপি তৈরীতে একজন চিকিৎসকের কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন? ০৮

বা. রোগীলিপি নির্ণয়ে প্রকৃত চিকিৎসকের গুণাবলী কি কি?

বা, রোগচিত্র নিরূপণের জন্য একজন চিকিৎসকের কি প্রয়োজন? ১৮

রোগীলিপি তৈরীতে একজন চিকিৎসকের নিম্নলিখিত গুণ থাকা প্রয়োজন/ রোগীলিপি নির্ণয়ে প্রকৃত চিকিৎসকের গুণাবলী ঃ

রোগীলিপি নির্ণয়ে প্রকৃত চিকিৎসকের গুণাবলী সম্পর্কে ডাঃ হ্যানিম্যান "অর্গানন অব মেডিসিন" নামক গ্রন্থের ৮৩ নং অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। প্রকৃত চিকিৎসকের নিম্নলিখিত গুণাবলী থাকতে হবে বা আবশ্যক ঃ (i) পূর্ব সংস্কার হতে মুক্ত মনোভাব থাকতে হবে (ii) পঞ্চ ইন্দ্রিয় সুস্থ ও কর্মক্ষম হতে হবে। (iii) পর্যবেক্ষণশীল মন থাকতে হবে এবং (iv) রোগ চিত্র অংকনে বিশ্বস্ত হতে হবে।

(i) পূর্ব সংস্কার হতে মুক্ত ঃ

চিকিৎসককে পূর্বসংস্কার হতে মুক্ত হতে হবে। কারণ চিকিৎসক যদি ভীত হয় বা ভয় পেয়ে নিজে রোগে আক্রান্ত হবে মনে করেন তবে তিনি সঠিকভাবে রোগী চিকিৎসা করতে পারবে না। কোন রোগীর রোগীলিপি নির্ণয় করে দুই তিনটি লক্ষণ নির্ণয় করে, যদি চিকিৎসক পূর্ব সংস্কার অনুযায়ী মনে করেন যে এ রোগী অমুক ঔষধের দ্বারা ভাল হবে কারণ ঐ ঔষধ দ্বারা পূর্বে এ ধরনের কতকগুলিকে আরোগ্য লাভ করে ছিল ইত্যাদি নির্ণয় করতে থাকে হবে সম্ভাবনা এবং ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন। তাই চিকিৎসককে অবশ্যই সংস্কারমুক্ত নিরপেক্ষ মন নিয়ে রোগীলিপি সংগ্রহ কার্যে ব্রতী হতে হবে।

(ii) পঞ্চইন্দ্রিয় সুস্থ ও কর্মপটু ঃ

রোগীলিপি সংগ্রহকালে চিকিৎসকের পঞ্চইন্দ্রিয় সমূহ অর্থাৎ, চোখ, কান, নাক, ত্বক ইত্যাদি যদি সুস্থ না থাকে তাহলে চিকিৎসক প্রকৃত রোগীলিপি অংকনে ব্যর্থ হবেন। চিকিৎসকের পঞ্চইন্দ্রিয় সুস্থ থাকলে তবেই তিনি চিকিৎসা উপযুক্ত ভাবে করতে পারবেন। মানসিক ও শারীরিক বিকৃতি বা অসুস্থতা থাকলে কাজে ব্যাঘাত ঘটে। যেমন- চিকিৎসক যদি নীলকে লাল, গরমকে ঠান্ডা/ঠান্ডাকে গরম অনুভব করলে প্রকৃত রোগীলিপি অংকিত হবে না।

(iii) পর্যবেক্ষনশীল মন ঃ

চিকিৎসককে রোগী পরিদর্শন কার্যে পর্যবেক্ষনশীল মন থাকতে হবে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সদৃশ লক্ষণ ভিত্তিক চিকিৎসা। রোগীর প্রকাশিত লক্ষণাবলী রোগের অস্তিত্বের পরিচায়ক, ব্যক্তিভেদে একই রোগের বিভিন্ন স্বরূপ পরিদৃষ্ট হয়। তাই প্রতিটি রোগীর ক্ষেত্রে চিকিৎসাকে ধৈর্য্যশীল ও মনোযোগী হতে হবে।

(iv) রোগীচিত্র অংকনে বিশ্বস্ততা ঃ

রোগের প্রকৃত চিত্র অংকনে একজন চিকিৎসককে অবশ্যই সত্যসন্ধানী ও ন্যায় পরায়ন হতে হবে। যত্ন ও সময়ের অভাবে আরোগ্য বিধানে চিকিৎসকের রোগীর লক্ষণসমষ্টি সংগ্রহ করতে তাড়াহুড়া করলে প্রকৃতরোগ চিত্র অংকন করা সম্ভব নয়। রোগীর গোপনীয় বিষয় চিকিৎসকে অবশ্যই গোপন রাখতে হবে। রোগী যা বলে তার কিছুই পরিবর্তন না করে রোগের প্রকৃত চিত্র অংকন করতে হবে।

উপরিউক্ত আলোচনা হতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, একজন আদর্শ চিকিৎসকের রোগীলিপি অংকনে উক্ত গুণাবলী অবশ্যই থাকতে হবে এ নির্দেশনা ডাঃ হ্যানিম্যানের।

২। প্রশ্ন ঃ রোগীলিপি বলতে কি বুঝ ? ০৮
অথবা, রোগীলিপি কি? ১২, ১৭
অথবা, রোগ চিত্র বলতে কি বুঝ?
(Q. What do you mean by case taking?)
রোগীলিপির সংজ্ঞা ঃ

চিকিৎসার প্রয়োজনে রোগীর বর্ণনা হতে, সেবাকারীর বর্ণনা হতে, আত্মীয়-স্বজনের বর্ণনা হতে রোগীর রোগ সম্বন্ধে যা জানবেন এবং চিকিৎসক নিজে যা পর্যবেক্ষণ করেন এবং যন্ত্রপাতি ও প্যাথলজির পরীক্ষা-নিরীক্ষা হতে প্রাপ্ত লক্ষণ সমষ্টি আর্দশ আরোগ্য এবং সঠিক ঔষধ নির্বাচনের জন্য লিখিত পত্রকে, রোগীলিপি বলে।

৩। প্রশ্ন ঃ রোগীলিপি বলতে কি বুঝ? হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ইহা প্রস্তুতের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর। ১৪
বা, রোগচিত্র বলতে কি বুঝ? হোমিওপ্যাথিতে ইহার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর। ১৭
বা, রোগীলিপি কি? রোগীলিপি প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয়তা লিখ। ০৯
রোগীলিপির সংজ্ঞা ঃ

চিকিৎসার প্রয়োজনে রোগীর বর্ণনা হতে, সেবাকারীর বর্ণনা হতে, আত্মীয়-স্বজনের বর্ণনা হতে এবং চিকিৎসক নিজে রোগী সম্বন্ধে যা পর্যবেক্ষণ করেন এবং যন্ত্রপাতি ও প্যাথলজির পরীক্ষা-নিরীক্ষা হতে প্রাপ্ত লক্ষণ সমষ্টি আর্দশ আরোগ্য এবং সঠিক ঔষধ নির্বাচনের জন্য লিখিত পত্রকে, রোগীলিপি বলে।

রোগীলিপি প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয়তা ঃ

ডাঃ হ্যানিম্যান "অর্গানন অব মেডিসিন" নামক গ্রন্থের ৮৪-১০২ নং অনুচ্ছেদে রোগীলিপি প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। রোগী চিকিৎসা পূর্বশর্ত হচ্ছে রোগীলিপি প্রস্তুত। রোগীলিপি ছাড়া রোগীর প্রকৃত রোগচিত্র অংকন করা সম্ভব নয়। হোমিওপ্যাথি

মানে সদৃশ বিধান আর সদৃশ বিধানে রোগী রোগ লক্ষণের সাথে সুস্থ মানবদেহে পরীক্ষিত ঔষধের গ্রন্থ মেটেরিয়া মেডিকার মধ্যে লিপিবদ্ধ ঔষধের তালিকা হতে সর্বাধিক সদৃশ একটি ঔষধ নির্বাচন করে রোগীকে ব্যবস্থাপত্র দিতে হবে। ঔষধ প্রয়োগের পর রোগীর উন্নতি পর্যবেক্ষণসহ রোগীকে আর্দশ আরোগ্যের লক্ষ্যে রোগীলিপি প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

৪। প্রশ্ন ঃ রোগীলিপি ছাড়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করা যায় না কেন? ১২, ১৭ (Q. Why patient is not treated in Homoeopathy without a case taking?)

রোগীলিপি ছাড়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করা যায় না কারণ ঃ

(i) রোগীর লক্ষণ সমষ্টি সংগ্রহ করতে হবে।

(ii) রোগের কারণ অনুসন্ধান- অর্জিত না বংশগত জানতে হবে।

(iii) মিশ্র মায়াজম, উত্তেজক বা আনুসঙ্গিক কারণ জানতে হবে।

(iv) রোগীর রোগ সম্পর্কিত পারিবারিক বা বংশগত ইতিহাস জেনে নিতে হবে।

(v) রোগীর রোগ সম্পর্কিত অতীতের ইতিহাস জানতে হবে।

(vi) রোগীর ব্যক্তিগত বিষয়াবলী যেমন- শখ, অভ্যাস, রোগীর সামাজিক অবস্থান ও পেশাগত অবস্থান জানতে হবে।

(vii) রোগীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাধারণ চিত্র, চেহারা, শারীরিক গঠন এনিমিয়া, জন্ডিস, আঁচিল, তাপমাত্রা, শ্বাস-প্রশ্বাসের হার, পালস, ব্লাডপ্রেসার, চর্মের অবস্থা, মল-মূত্র, ঘর্মস্রাব ইত্যাদির ইতিহাস জানতে হবে।

(viii) সার্বদৈহিক অবস্থা- কাতরতা, সর্দি লাগার প্রবণতা, গোসলের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, খাদ্য গ্রহনে ইচ্ছা অনিচ্ছা, স্বপ্ন, ঘুম ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে হবে।

অতএব উপরিউক্ত বিষয়াবলী রোগীলিপি সংগ্রহের মাধ্যমে একজন রোগীর সামগ্রীক রোগচিত্র ফুটে উঠে এবং রোগীর আদর্শ আরোগ্যের ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব হয়। সুতরাং রোগীলিপি ছাড়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কার্য পরিচালনা করা অসম্ভব।

৫। প্রশ্ন ঃ "রোগীলিপি চিকিৎসা কার্যের একটি প্রধান অংশ"- ব্যাখ্যা কর।

রোগীলিপি চিকিৎসা কার্যের একটি প্রধান অংশ- ব্যাখা ঃ

চির বা তরুণ রোগের রোগীলিপি প্রস্তুত করা চিকিৎসকের সর্বাপেক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ কাজ। চিররোগের ক্ষেত্রে চিকিৎসক রোগীর ঐ রোগীলিপিকে তাঁর জন্য সঠিক ঔষধ নির্বাচনের পথ প্রদর্শক হিসাবে ব্যবহার করবেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতি। এখানে রোগীর রোগ লক্ষণাবলীর সদৃশ সুস্থ মানবদেহে পরীক্ষিত মেটেরিয়া মেডিকায় লিপিবদ্ধ কৃত্রিম রোগ সৃষ্টিকারী ঔষধ তালিকা হতে একটি অধিক সদৃশ ঔষধ প্রয়োগ করলে রোগীর রোগ আরোগ্য হয়। চিকিৎসাকালে রোগীর কি পরিমাণ উন্নতি হলো তা রোগীলিপির মাধ্যমে জানা যায়। কোন কারণে বা রোগীর প্রয়োজনে রোগী অন্যত্র চলে যাবার পর পরবর্তীতে আবার ফিরে এসে রোগী চিকিৎসা গ্রহন করতে পারেন যদি চিকিৎসক রোগীলিপি সংরক্ষণ করেন।

৬। প্রশ্ন ঃ রোগীলিপি বলতে কি বুঝ? হোমিওপ্যাথিতে ইহার প্রয়োজনীয়তা এত বেশী কেন? ১৬

(Q. What do you mean by case taking? Why it is so necessity in Homoeopathy?)

অথবা, রোগচিত্র বলতে কি বুঝ? হোমিওপ্যাথিতে ইহার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর। ১৭

(Q. What do you mean by disease picture? Discuss the necessity of it in Homoeopathy.)

রোগীলিপির সংজ্ঞা ঃ হোমিওপ্যাথিক দৃষ্টিভঙ্গিতে রোগীকে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করে রোগ নির্ণয় করতে হয়। চিকিৎসক প্রত্যেকটি রোগীকে ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা রোগ লক্ষণসমূহের অনুসন্ধান,

পর্যবেক্ষণ, স্বরূপ অনুধাবন করে যথাযথভাবে তথ্যাবলী লিপিবদ্ধকরণকে রোগীলিপি বলে।

রোগীলিপি ছাড়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করা যায় না কারণ ঃ

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কার্য পরিচালনা করতে গেলে রোগীলিপি প্রস্তুতের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। রোগীর রোগ লক্ষণের মধ্যেই রোগের প্রকৃত চিত্র ফুটে উঠে। রোগীর মানসিক, ধাতুগত ও সার্বদৈহিক লক্ষণাবলী নিয়ে রোগীলিপি প্রস্তুত করতে হয়। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতিতে রোগীর রোগ লক্ষণের সদৃশ মেটেরিয়া মেডিকা হতে ঔষধের লক্ষণসমষ্টির সাথে মিলিয়ে রোগীর ঔষধ নির্বাচন করতে হয়। চিকিৎসক রোগীর নিকট হতে, তাঁর আত্নীয়-স্বজনের নিকট হতে, সেবাকারীর নিকট হতে লক্ষণাবলী সংগ্রহ করে এবং নিজে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা নিরীক্ষা মাধ্যমে প্রকৃত রোগীচিত্র তৈরি করতে হয়। লক্ষণসমষ্টির মাধ্যমে রোগীর একটি পূর্ণাঙ্গ রোগচিত্র ফুটিয়ে তোলা এবং রোগের প্রগনোসিস ও জটিলতা সম্বন্ধে বিস্তারিত জানা যায়। পক্ষান্তরে রোগীর রোগীলিপি প্রস্তুত না করে রোগ যন্ত্রণা সম্বন্ধে মুখেমুখে শুনে ঔষধ নির্বাচন করলে রোগী প্রকৃত অর্থাৎ ডাঃ হ্যানিম্যানের আদর্শ আরোগ্য সম্ভব নয়। এছাড়াও কোন রোগী চিকিৎসা কালে যদি অন্যত্র চলে যায় এবং পরবর্তীতে কিছু দিন পরে পুনরায় চিকিৎসা নিতে চায় তাহলে পূর্ববর্তী সময় কি ঔষধ সেবন করেছে তা চিকিৎসকের মনে না থাকার কারণে উক্ত রোগীর সঠিক চিকিৎসা দেয়া সম্ভব হবে না।

সুতরাং রোগীলিপি ছাড়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করা যায় না, ফলে হোমিওপ্যাথিতে ইহার প্রয়োজনীয়তা সুদূরপ্রসারী।

৭। প্রশ্ন ঃ রোগ চিত্র বলতে কি বুঝ? রোগ চিত্র প্রণয়নে কে কে সাহায্য করতে পারে? ১৩

রোগ চিত্র (disease picture)ঃ

চিকিৎসক রোগীকে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করে, রোগীকে জিজ্ঞাসা করে, রোগীর আত্মীয়-স্বজন ও সেবাকারীকে জিজ্ঞাসা করে, রোগী সম্পর্কে যে তথ্যাবলী সংগৃহীত হয়, তাকে রোগ চিত্র বলে। রোগগ্রস্থ রোগীর দেহ ও মনে যে অস্বাভাবিক বিকৃতি দেখা দেয় বা পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, তাকে রোগ বলে। এই লক্ষণসমষ্টিই রোগের চিত্র এবং রোগ আরোগ্যের কৃত্রিম রোগ সৃষ্টিকারী ঔষধের চিত্র।

রোগ চিত্র প্রণয়নে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ সাহায্যকারী ঃ

রোগ চিত্র প্রণয়নে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ সাহায্য করতে পারে। যথা ঃ-

১। রোগী স্বয়ং নিজে, ২। রোগীর আত্মীয়-স্বজন, ৩। বন্ধু-বান্ধব, ৪। সেবাকারীগণ

প্রথমে রোগী নিজে তার রোগের ইতিহাস বর্ণনা করবে। তারপর রোগীর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও সেবাকারীরা রোগীর কষ্টকর অবস্থা, আচার-আচরণ ও ব্যবহার সম্পর্কে বর্ণনা প্রদান করে চিকিৎসককে রোগ চিত্র প্রণয়নে সাহায্য করবেন। সর্বশেষে চিকিৎসক নিজে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করে রোগ চিত্র প্রণয়ন সমাপ্ত করবেন।

৮। প্রশ্ন ঃ রোগীলিপি সংগ্রহে চিকিৎসকের প্রথম কর্তব্য কি ?

রোগীলিপি সংগ্রহে চিকিৎসকের প্রথম কর্তব্য ঃ

রোগীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, সান্ত্বনা দেয়া, রোগীর প্রতিমনোযোগী হওয়া, তাঁর রোগ লক্ষণের প্রতি মনোযোগী হওয়া এবং রোগীর নাম, ঠিকানা, বয়স, পেশা প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করা হল রোগীলিপি সংগ্রহে চিকিৎসকের প্রথম কর্তব্য।

৯। প্রশ্ন ঃ রোগচিত্র কি? ইহা তৈরী করার সময় রোগীকে কি ধরনের প্রশ্ন করা উচিত ? ১৬

(Q. What do you mean by disease picture? What type of questions should ask to the patient at the time of preparing it?)

রোগ চিত্র (Disease Picture) ঃ

চিকিৎসক রোগীকে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করে, রোগীকে জিজ্ঞাসা করে, রোগীর আত্মীয়-স্বজন ও সেবাকারীকে জিজ্ঞাসা করে, রোগী সম্পর্কে যে তথ্যাবলী সংগৃহীত হয়, তাকে রোগ চিত্র বলে।

রোগচিত্র তৈরী করার সময় রোগীকে নিম্নলিখিত ধরনের প্রশ্ন করা উচিত ঃ

চিকিৎসকের নিকট বর্ণিত এক একটি লক্ষণ পাঠ করে দেখবেন এবং প্রত্যেকটি লক্ষণ সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত জানার জন্য এভাবে অনুসন্ধান করবেন ঃ কোন সময়ে এই লক্ষণটি দেখা দেয়? রোগী এই পর্যন্ত যে ঔষধ সেবন করছেন তার পূর্বে এই লক্ষণটি ছিল কি? ঔষধ সেবনকালীন এই লক্ষণটি দেখা দিয়েছিল? কি ধরণের যন্ত্রণা, ঠিক কিরূপ বোধ হয়, ইহা কি ঠিক এখানেই হয়েছিল? ঠিক কোন স্থানে? মধ্যে মধ্যে কি আপনা-আপনিই এই যান্ত্রণা হয়, বিভিন্ন সময়ে? কিংবা অবিরামভাবে সব সময়েই লেগে থাকত? কতক্ষণ থাকে? দিবা-রাত্রি কোন সময়ে, সার্বিক কিরূপ অবস্থানে তা সর্বাপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক হত বা সম্পূর্ণ কমে যেত? এসব ঘটনা বা অবস্থার সঠিক প্রকৃতি কি? সোজা সরল কথায় বর্ণনা করুন তো?

এভাবে চিকিৎসক প্রত্যেকটি তথ্যসম্বন্ধে সঠিকভাবে অবগত হতে সমর্থ হন। কিন্তু তিনি কখনও এমন কোন প্রশ্ন করবেন না, যাতে রোগী 'হ্যাঁ' বা 'না' বলে উত্তর দিতে সুযোগ পান। সেরূপ করা হলে আলস্যবশতঃ বা প্রশ্নকারীকে খুশি করার জন্য কিছুটা অসত্য, অর্ধসত্য বা যা সম্পূর্ণ সত্য নহে এমন কিছু বলতে বিভ্রান্ত হয়ে 'হ্যাঁ' বা 'না' বলে উত্তর দিয়ে বসবেন। ফলে রোগের একটি বিকৃতি প্রতিকৃতির উপর অনুপযোগী চিকিৎসাই চলতে থাকবে।

১০। প্রশ্ন ঃ সঠিক রোগীলিপি প্রস্তুত পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা কর।
বা, পূর্ণাঙ্গ রোগীলিপি প্রণয়নের পদ্ধতিসমূহ কি কি? ১০, ১১, ১৩, ১৭
(Q. What are the methods to make complete case taking?)

সঠিক রোগীলিপি প্রস্তুত পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা/ চিকিৎসক নিম্নলিখিতভাবে রোগ পূর্ণাঙ্গ রোগীলিপি প্রণয়ন করবেন। যথাঃ

(i) চিকিৎসক প্রথমে রোগীর নাম, বয়স, বিবাহিত অবস্থা, পেশা ও ঠিকানা লিখবেন।

(ii) রোগী নিজেই চিকিৎসকের কাছে তার রোগ যন্ত্রনার কথা বলবে এবং চিকিৎসক রোগীর বন্ধু-বান্ধব, আত্নীয়-স্বজন বা পরিচর্যাকারীর কাছ থেকে শুনবেন।

(iii) তারপর চিকিৎসক রোগীর বন্ধু-বান্ধব, আত্নীয়-স্বজন বা পরিচর্যাকারীর কাছ থেকে শুনবেন।

(iv) রোগী যে ভাষায় বর্ণনা করে সেভাবেই লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(v) তারপর চিকিৎসকের কিছু জানার থাকলে তা অন্য সকলের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করবেন।

(vi) চিকিৎসককে ধর্য্য ও মনোযোগের সাথে রোগীকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করবেন।

(vii) রোগীকে পরীক্ষার সময় তার দৈহিক গঠন, মানসিক লক্ষণ, ইচ্ছা অনিচ্ছা প্রভৃতি বিষয়ে জানতে হবে।

(viii) চিকিৎসক রোগীকে এমন ভাবে প্রশ্ন করবেন না যাতে রোগী হ্যাঁ বা না বলে উত্তর দেয়।

(ix) রোগীর বর্ণিত প্রত্যেকটি লক্ষণের বিবরণ অবস্থান ও হ্রাস বৃদ্ধি সম্বন্ধে জানতে হবে।

(x) রোগীর বর্ণিত বিষয় লিখার সময় ফাঁকা রাখতে হবে যাতে পরে চিকিৎসক, অজানা লক্ষণাবলী সে স্থানে লিখতে পারে।

(xi) রোগী পূর্বে কোন চিকিৎসকের অধীনে ঔষধ খেয়ে থাকলে তা জানতে হবে।

পরিশেষে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করার পর চিকিৎসক নিজে রোগীকে পর্যবেক্ষণ করে যে সমস্ত বিষয় জানবেন তা লিপিবদ্ধ করতে হবে। যেমন ঃ রোগীর দৈহিক গঠন, আচরণ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, শিরা নাড়ীর গতি প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করার পর তা লিপিবদ্ধ করতে হবে।

১১। প্রশ্ন ঃ চিররোগে বিশুদ্ধ ও অমিশ্রিত লক্ষণ পাওয়ার উপায়গুলি আলোচনা কর। ০৯

চিররোগে বিশুদ্ধ ও অমিশ্রিত লক্ষণ পাওয়ার উপায়গুলি আলোচনা ঃ

প্রথমে রোগী নিজে তার রোগের ইতিহাস বর্ণনা করবে। তারপর রোগীর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও সেবাকারীরা রোগীর কষ্টকর অবস্থা, আচার-আচরণ ও ব্যবহার সম্পর্কে বর্ণনা প্রদান করে লক্ষণাবলী সংগ্রহে সাহায্য করবেন। এরপর চিকিৎসক প্রত্যেকটি তথ্যসম্বন্ধে সঠিকভাবে অবগত হতে সমর্থ হন। কিন্তু তিনি কখনও এমন কোন প্রশ্ন করবেন না, যাতে রোগী 'হ্যাঁ' বা 'না' বলে উত্তর দিতে সুযোগ পান। সেরূপ করা হলে, আলস্যবশতঃ বা প্রশ্নকারীকে খুশি করার জন্য কিছুটা অসত্য, অর্ধসত্য বা যা সম্পূর্ণ সত্য নহে এমন কিছু বলতে বিভ্রান্ত হয়ে 'হ্যাঁ' বা 'না' বলে উত্তর দিয়ে বসবেন। ফলে রোগের একটি বিকৃতি প্রতিকৃতির উপর অনুপযোগী চিকিৎসাই চলতে থাকবে। সর্বশেষে চিকিৎসক নিজে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করে রোগীর লক্ষণাবলী সংগ্রহ সমাপ্ত করবেন।

সুতরাং উপরিউক্ত উপায়সমূহের মাধ্যমে চিররোগে বিশুদ্ধ ও অমিশ্রিত লক্ষণ পাওয়া যায়।

১২। প্রশ্ন ঃ রোগী পরীক্ষা কাকে বলে? রোগী পরীক্ষার আবশ্যকতা কি? ১০

রোগী পরীক্ষা ঃ

চিকিৎসক রোগীর কষ্টকর লক্ষণাবলী সংগ্রহ করে, সেগুলোকে পর্যালোচনা করে এবং চিকিৎসক নিজে পঞ্চইন্দ্রিয় দ্বারা রোগীকে পর্যবেক্ষণ করে, রোগের কারণতত্ত্ব নিয়ে ঔষধ নির্বাচন পদ্ধতিকে, রোগী পরীক্ষা বলা হয়।

রোগী পরীক্ষার আবশ্যকতা ঃ

রোগী পরীক্ষার ফলে রোগী রোগ লক্ষণসমূহ দ্বারা মেটেরিয়া মেডিকায় লিপিবদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ হতে সর্বাধিক সদৃশ একটি ঔষধ নির্বাচন করা সম্ভব হয়। রোগীর মানসিক, ধাতুগত ও সার্বদৈহিক লক্ষণাবলী নিয়ে রোগীলিপি প্রস্তুত করতে হয়। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতিতে রোগীর রোগ লক্ষণের সদৃশ মেটেরিয়া মেডিকা হতে ঔষধের লক্ষণসমষ্টির সাথে মিলিয়ে রোগীর ঔষধ নির্বাচন করতে হয়। রোগীর একটি পূর্ণাঙ্গ রোগচিত্র ফুটিয়ে তোলা এবং রোগের প্রগনোসিস ও জটিলতা সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার জন্য রোগী পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশি। পক্ষান্তরে রোগী পরীক্ষা না করে রোগ যন্ত্রণা সম্বন্ধে মুখেমুখে শুনে ঔষধ নির্বাচন করলে রোগী প্রকৃত অর্থাৎ ডাঃ হ্যানিম্যানের আদর্শ আরোগ্য সম্ভব নয়।

অতএব, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় রোগী পরীক্ষার আবশ্যকতা ব্যাপক।

১৩। প্রশ্ন ঃ রোগীলিপি সংগ্রহে চিকিৎসকের দ্বিতীয় কর্তব্য কি ? ১৩
বা, প্রকৃত চিকিৎসকের দ্বিতীয় প্রতিপাদ্য বিষয় কি? ১৩

রোগীলিপি সংগ্রহে চিকিৎসকের দ্বিতীয় কর্তব্য ঃ

চিকিৎসক রোগীকে তাঁর রোগের কষ্টকর অবস্থা বর্ণনা করতে বলবেন, রোগ লক্ষণ বর্ণনাকালে যেন ধীরে ধীরে বলেন যাতে তিনি

বর্ণনা হতে প্রয়োজনীয় অংশটুকু সঠিকভাবে লিখে নিতে পারেন। এরপর রোগীর নিকট যাঁরা সর্বক্ষণ থাকেন তাঁরা রোগীর রোগ যন্ত্রণার সময় কি কি বলতে শুনতে পেয়েছে, কখন রোগীকে কি করতে দেখেছেন প্রভৃতি তাঁদের হতে জেনে নিবেন। রোগী, তাঁর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও সেবাকারীরা যা বর্ণনা করেন তা বর্ণনাকারীর ভাষায় লিখে নিতে হবে। তাঁরা অবান্তর কিছু না বললে বাধা দিবে না। রোগীলিপি সংগ্রহে ইহাই চিকিৎসকের দ্বিতীয় কর্তব্য। অসম্পূর্ণ লক্ষণগুলি প্রশ্ন দ্বারা সম্পূর্ণভাবে জেনে নেয়া চিকিৎসকের দ্বিতীয় কর্তব্য। রোগী তার অসুস্থতার কথা অতিরঞ্জিত করে বলে তার বর্ণনা হতে প্রকৃত লক্ষণগুলি অতি সতর্কতার সহিত বাহির করা চিকিৎসকের দ্বিতীয় কর্তব্য। রোগের গুপ্ত কারণ কৌশলে জেনে নেয়া চিকিৎসকের দ্বিতীয় কর্তব্য।

১৪। প্রশ্ন ঃ রোগীলিপি সংগ্রহে চিকিৎসকের তৃতীয় কর্তব্য কি ?
বা, একজন প্রকৃত চিকিৎসকের তৃতীয় কর্তব্য বিষয় সম্পর্কে আলোচনা কর। ০৮, ০৯, ১২, ১৩

রোগীলিপি সংগ্রহে চিকিৎসকের তৃতীয় কর্তব্য ঃ

অর্গানন অব মেডিসিনের ১৪৬ নং অনুচ্ছেদে প্রকৃত চিকিৎসকের তৃতীয় কর্তব্য সম্বন্ধে ডাঃ হ্যানিম্যান বর্ণনা করেছেন। প্রকৃত চিকিৎসকের কাজের তৃতীয় অংশটি হচ্ছে বিশুদ্ধ ক্রিয়া নির্ণয় করার জন্য যেগুলোর সুস্থ ব্যক্তিদের শরীরে পরীক্ষা করা হয়েছে, সে সকল কৃত্রিম রোগ উৎপাদক শক্তির বা ঔষধ সমূহের সদৃশ বিধানমতে প্রাকৃতিক রোগ নিরাময় কল্পে বিবেচনা পূর্বক প্রয়োগ সম্পর্কিত।

১৫। প্রশ্ন ঃ কিভাবে চিররোগের পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায় ?
বা, কিভাবে সঠিক রোগ নির্ণয় করা সম্ভব। ১৫

চিররোগের পূর্ণাঙ্গ চিত্র ঃ মহাত্মা ডাঃ হ্যানিম্যান অর্গানন অব মেডিসিন গ্রন্থের ১৮৫-২০৩ নং অনুচ্ছেদে স্থানীয় রোগের চিকিৎসা, ২০৪-২০৯ নং অনুচ্ছেদে চির রোগের চিকিৎসা, ২১০-২৩০ নং অনুচ্ছেদে মানসিক রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। উক্ত অনুচ্ছেদের রোগসমূহ চির রোগের অর্ন্তভূক্ত।

(i) রোগীর লক্ষণ সমষ্টি সংগ্রহ করতে হবে।

(ii) রোগের কারণ অনুসন্ধান -অর্জিত না বংশগত জানতে হবে।

(iii) মিশ্র মায়াজম, উত্তেজক বা আনুসঙ্গিক কারণ জানতে হবে।

(iv) রোগীর রোগ সম্পর্কিত পারিবারিক বা বংশগত ইতিহাস জেনে নিতে হবে।

(v) রোগীর রোগ সম্পর্কিত অতীতের ইতিহাস জানতে হবে।

(vi) রোগীর ব্যক্তিগত বিষয়াবলী যেমন- শখ, অভ্যাস, রোগীর সামাজিক অবস্থান ও পেশাগত অবস্থান জানতে হবে।

(vii) রোগীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাধারণ চিত্র, চেহারা, শারীরিক গঠন, এনিমিয়া, জন্ডিস, আঁচিল, তাপমাত্রা, শ্বাস-প্রশ্বাসের হার, পালস, ব্লাড প্রেসার, চর্মের অবস্থা, মল-মূত্র, ঘর্মস্রাব, ইত্যাদির ইতিহাস জানতে হবে।

(viii) সার্বদৈহিক অবস্থা- কাতরতা সর্দি লাগার প্রবণতা, গোসলের ও খাদ্যের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, স্বপ্ন, ঘুম ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে হবে।

অতএব উপরিউক্ত বিষয়াবলী চিররোগের পূর্ণাঙ্গ চিত্র রোগীর আদর্শ আরোগ্যের জন্য আবশ্যক।

১৬। প্রশ্ন ঃ হোমিওপ্যাথি অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব-এর কারণসমূহ লিখ।

হোমিওপ্যাথি অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বের কারণসমূহ ঃ

(i) হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি প্রাকৃতিক, বৈজ্ঞানিক, আদর্শ ও সদৃশ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

(ii) এ পদ্ধতিই সর্বপ্রথম চিকিৎসা বিজ্ঞানকে আন্দাজ-অনুমোদনের ক্ষতিকর ও অনির্ভরযোগ্য পথের পরিবর্তে নিয়মনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে।

(iii) একমাত্র এতেই জীবনীশক্তি, রোগশক্তি ও ঔষধ শক্তিকৃত সূক্ষ্মশক্তিকে স্বীকার করা হয়েছে। এ তত্ত্বের উপর নির্ভর করেই রোগীকে আরোগ্য করা হয়।

(iv) এ পদ্ধতি যথার্থ প্যাথলজি অর্থাৎ হোমিওপ্যাথি প্যাথলজি আবিষ্কারের বহুআগে আবিষ্কৃত হয়েছে যে, রোগের প্রকৃত কারণ অনেক সূক্ষ্ম, যা কোনও ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত যন্ত্রে ধরা পড়ে না।

(v) একমাত্র এ পদ্ধতিতে সুস্থ মানুষের উপরে ঔষধ প্রুভিং করে এর নিশ্চিত ক্রিয়া আবিষ্কার হয়েছে। এ ঔষধ সহজবোধ্য পন্থায় রোগীর চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আজও পর্যন্ত এর কোন ঔষধের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে যথার্থ প্রয়োগের পর বিফলতা আসেনি।

(vi) এ ঔষধের ক্রিয়া শক্তি স্তরে, যা শরীর ও মনের গভীর স্তরের সূক্ষ্ম বিকৃতিকে পর্যন্ত নির্মূল করতে পারে।

(vii) এতেই সদৃশ বিধান নিয়মে এক সময়ে একটা মাত্র ঔষধ শক্তিকৃত অবস্থায়, সূক্ষ্ম ও পরিবর্তিত মাত্রায় রোগীকে প্রয়োগ করে চিকিৎসা করা হয়।

(viii) এ পদ্ধতির ঔষধ সবচেয়ে কম সময়ে, বিনা কষ্টে, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াভাবে ও সহজবোধ্য পন্থায় রোগীকে আরোগ্য করে সম্পূর্ণ ও স্থায়ীভাবে তার পূর্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনে।

(ix) হোমিওপ্যাথিক ঔষধ (যথার্থ প্রয়োগে) বিষক্রিয়াহীন, সন্তাপপ্রবণতা বর্জিত এবং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াহীন, এনার্জিক অবস্থা বা অন্য কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়াহীন ও যথার্থ ক্রিয়া প্রদর্শন করে।

(x) কেবলমাত্র এ চিকিৎসায়, প্রচলিত রোগের নামে চিকিৎসা করা হয় না। এতে সামগ্রিকভাবে রোগীর চিকিৎসা করা হয়।

(xi) এ জন্যে একমাত্র এ পদ্ধতিতে কারণ ও লক্ষণসমষ্টি নির্ভর করে চিকিৎসা প্রদান করা হয়।

(xii) বংশগত রোগ ও রোগপ্রবণতা এ পদ্ধতির চিকিৎসায় স্থায়ীভাবে দূর করা যায়

(xiii) বিভিন্ন ধরনের সার্জারিযোগ্য রোগী হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতিতে বিনা সার্জারিতে কেবল ঔষধের দ্বারা আরোগ্য করা যায়। যেমন- অর্শ্ব, ভগন্দর, আচিল, টিউমার, গ্যাংগ্রিন, প্রস্টেট বিবৃদ্ধি, পিত্তপাথুরি, মূত্রপাথুরি ইত্যাদি। সার্জারির পূর্বে ও পরের চিকিৎসায়ও হোমিওপ্যাথি ঔষধ কার্যকরী।

পঞ্চম অধ্যায়

মহামারী ও বিক্ষিপ্ত রোগের চিকিৎসা ক্ষেত্রে চিকিৎসকের কর্তব্য - অনুচ্ছেদ ১০০-১০৪

১। প্রশ্ন ঃ মহামারী রোগ কাকে বলে। ইহা কি কারণে সংঘটিত হয় ?
অথবা, মহামারী রোগ সম্পর্কে আলোচনা কর। ০৮, ০৯

মহামারী রোগ ঃ

যে সকল রোগ কোন উত্তেজক কারণে বিশেষ জনপদে ব্যাপকভাবে এক সাথে বহুলোকের সমাগম স্থলে আবির্ভাব হয় ও স্পর্শ সংক্রামক রূপ ধারণ এবং আক্রান্ত করে, তাকে মহামারী রোগ বলে। যেমন - উদরাময়, কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি।

মহামারী রোগ সংঘটিত হওয়ার কারণ ঃ

ক. মূলকারণ - সোরা
খ. উত্তেজক কারণ-
(i) যুদ্ধের হত্যাকান্ড ও ধ্বংসের পর,
(ii) জলপ্লাবনে বা দূর্ভিক্ষের ফলে অনাহারাদি।
(iii) বিভিন্ন রোগজীবাণু। যেমন- ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাস ইত্যাদি।
(iv) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব।

২। প্রশ্ন ঃ মহামারী রোগ সম্পর্কে আলোচনা কর।

মহামারী রোগ সম্পর্কে আলোচনা ঃ

মহামারী রোগের কারণ ঃ

(i) সোরার সাময়িক উচ্ছ্বাস।
(ii) সাধারণতঃ যুদ্ধবিগ্রহের সময় পরিবেশ দূষিত হবার কারণে।
(iii) ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, প্রাকৃতিক দূর্যোগ প্রভৃতি কারণে।

(iv) দূর্ভিক্ষ ও সামাজিক অনাচার প্রভৃতি।
(v) ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাসসহ বিভিন্ন মাইক্রোঅর্গানিজম যা মহামারী রোগের অন্যতম কারণ।

মহামারী রোগের বৈশিষ্ট্য ঃ
(i) মহামারী রোগ সংক্রামক রোগ।
(ii) ইহা কোন অঞ্চলে হঠাৎ আবির্ভাব হয়।
(iii) রোগের লক্ষণ ও চিহ্ন দ্রুত বিস্তার লাভ করে।
(iv) রোগীকে দ্রুত মৃত্যু মুখে পতিত করে।
(v) রোগের ভোগকাল নির্দিষ্ট, ভোগকাল শেষে হয় রোগী মৃত্যুবরণ করে, না হয় রোগ নিজেই ধবংস হয়।
(vi) উদাহরণ- কলেরা, বসন্ত, হাম ইত্যাদি।

৩। প্রশ্ন ঃ বিক্ষিপ্ত রোগ সম্পর্কে আলোচনা কর। ১৩
বিক্ষিপ্ত রোগ সম্পর্কে আলোচনা ঃ

যে রোগসমূহ উত্তেজক কারণ বা অদৃশ্য কারণ হতে উৎপন্ন এবং এক এক স্থানে দুই একটি ব্যক্তির মধ্যে বিক্ষিপ্ত ভাবে আক্রান্ত হয়, তাকে বিক্ষিপ্ত রোগ বলে।

বিক্ষিপ্ত রোগ সোরার সাময়িক উচ্ছ্বাস এবং স্থানীয় জলবায়ু, মাটি, আকাশ ও পার্থিব প্রভাবে কিংবা স্বাস্থ্য হানিকর পদার্থসমূহ দ্বারা দূরে দূরে এক একটি করে অনেক লোককে একই সময়ে আক্রমন করে। যেমন ঃ দুই এক দিনের জ্বরে কতগুলো লোক মারা গেল কি হঠাৎ পেট ফুলে উঠে দুরে দুরে কতগুলি লোক ভুগল ইত্যাদি। এ সকল রোগের কোন বিশেষ নাম নাই। হঠাৎ জ্বরে মারা গেল, হঠাৎ কলেরা হয়ে কয়েকটি ব্যক্তি ভুগল বা মারা গেল ইত্যাদি।

৪। প্রশ্ন ঃ বিক্ষিপ্ত রোগের কারণ লিখ।

বিক্ষিপ্ত রোগের কারণ ঃ

(i) সোরার সাময়িক উচ্ছ্বাস।

(ii) পরিবেশ দুষিত হবার কারণে।

(iii) ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি কারণে।

(iv) সামাজিক অনাচার প্রভৃতি।

(v) ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাসসহ বিভিন্ন ধরনের মাইক্রোঅর্গানিজম যা বিক্ষিপ্ত রোগের অন্যতম কারণ।

৫। প্রশ্ন ঃ বিক্ষিপ্ত রোগের বৈশিষ্ট্য লিখ। ১০

বিক্ষিপ্ত রোগের বৈশিষ্ট্য ঃ

যে সকল রোগসমূহ উত্তেজক কারণ বা অদৃশ্য কারণ হতে উৎপন্ন এবং এক এক স্থানে দুই একটি ব্যক্তির মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে আক্রান্ত হয়, তাকে বিক্ষিপ্ত রোগ বলে। এ রোগ স্থানীয় জলবায়ু, মাটি, আকাশ ও পার্থিব প্রভাব কিংবা স্বাস্থ্য হানিকর পদার্থসমূহ দ্বারা দূরে দূরে এক একটি করে অনেক লোককে একই সময়ে আক্রমণ করে। যেমন- দুই এক দিনের জ্বরে কতগুলো লোক মারা গেল, হঠাৎ পেট ফুলে উঠে দূরে দূরে কতগুলি লোক ভুগল ইত্যাদি। এ সকল রোগের কোন বিশেষ নাম নাই। হঠাৎ জ্বরে মারা গেল, হঠাৎ পাতলা পায়খানা ও বমি হয়ে কয়েকটি লোক ভুগল বা মারা গেল। কেই বলল কলেরা, কেউ বলল ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি।

৬। প্রশ্ন ঃ মহামারী ও বিক্ষিপ্ত রোগের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা কর। ০৮

মহামারী ও বিক্ষিপ্ত রোগের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা ঃ

মহামারী রোগ		বিক্ষিপ্ত রোগ
যে সকল রোগ কোন উত্তেজক কারণে বিশেষ জনপদে ব্যাপকভাবে এক সাথে বহুলোকের সমাগম স্থলে আর্বিভাব হয় ও স্পর্শ সংক্রামক রূপ ধারণ এবং আক্রান্ত করে, তাকে মহামারী রোগ বলে।	১	যে সকল রোগ কোন উত্তেজক কারণে বিশেষ জনপদে বিক্ষিপ্তভাবে এক সাথে কিছু লোকের সমাগম স্থলে আর্বিভাব হয় ও স্পর্শ সংক্রামক রূপ ধারণ এবং আক্রান্ত করে, তাকে বিক্ষিপ্ত রোগ বলে।
ইহা মহল্লা বা গ্রামের পর গ্রাম আক্রান্ত হয়।	২	ইহা বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন স্থানে ব্যক্তিগন আক্রান্ত হয়।
ইহা পানিবাহিত ও বায়ুবাহিত উভয় কারণে হয় বা হতে পারে।	৩	ইহা বেশিভাগই বায়ুবাহিত কারণে হয় বা হতে পারে।
ইহা ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসসহ বিভিন্ন অনুজীব দ্বারা সংগঠিত হয়।	৪	ইহা ভাইরাসসহ বিভিন্ন অনুজীব দ্বারা সংগঠিত হয়।

৭। প্রশ্ন ঃ মহামারী রোগে ডাঃ হ্যানিম্যান কিভাবে চিকিৎসা করতে নির্দেশ দিয়াছেন ? ১১

মহামারী রোগে চিকিৎসা সম্বন্ধে ডাঃ হ্যানিম্যানের নির্দেশনা ঃ

মহাত্মা ডাঃ হ্যানিম্যান মহামারী রোগে চিকিৎসা সম্বন্ধে "অর্গানন অব মেডিসিন" গ্রন্থের ১০০ থেকে ১০৩ নং অনুচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

(i) মহামারী বা বিক্ষিপ্ত প্রকৃতির রোগের ক্ষেত্রে লক্ষণ অনুসন্ধান করার কাজে পৃথিবীতে পূর্বে কখনও সে নামে বা অন্যনামে কোন রোগ আবির্ভূত হয়েছিল কিনা জানার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ রোগের নতুনত্ব বা বিশেষত্ব রোগী-পরীক্ষা বা চিকিৎসাক্ষেত্রে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করে না।

(ii) চিকিৎসক প্রকৃত নির্মূল আরোগ্য সাধনের আকাঙ্খা করেন তা হলে তাঁকে প্রতিটি রোগেরই সঠিক চিত্র অভিনব ও অনুসন্ধান কার্যে প্রবৃত্ত হতে হবে। অনুমান বাদ দিয়া প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের আশ্রয় নিতে হবে।

(iii) কোন রোগীর অবস্থা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে আগে হতে জানা আছে এমন ধারণাও বর্জন করতে হবে। সকল পর্যায়ে সযত্নে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সর্বদা অপরিহার্য।

(iv) এতে রোগীর একদিকে যেমন সাধারণ লক্ষণসমূহের (যথা-ক্ষুধাহীনতা, নিদ্রাহীনতা প্রভৃতি) বিশেষত্বপূর্ণ যথার্থ বর্ণনা, অপরদিকে তেমনই সু-স্পষ্ট, বিশেষ লক্ষণ, যা দৃষ্টিগোচর হয় ও রোগেই বিশেষভাবে একসঙ্গে একটিত হয়ে উঠে সে লক্ষণের গুরুত্ব দিতে হবে।

(v) কয়েকটি রোগীকে যত্নসহকারে পর্যবেক্ষণ করে লক্ষণসমষ্টির সহিত পরিচিত হতে হবে।

(vi) দূরদৃষ্টি সম্পন্ন চিকিৎসক রোগের প্রকৃত স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করে এর চরিত্রগত প্রতিকৃতি অংকন করতে হবে এবং সদৃশ বিধান মতে একটি যথার্থ ঔষধ নির্বাচন করে রোগীকে প্রয়োগ করতে হবে।

(vi) তবে কিছু কিছু সংক্রামক রোগ একই প্রকৃতির হয়ে থাকে, যেমন ঃ বসন্ত ও হাম ইত্যাদি। সেক্ষেত্রে বিবেচনা করে ঔষধ নির্বাচন করতে হবে।

৮। প্রশ্ন ঃ কি কি কারণে আমরা রোগের আরোগ্যের জন্য প্রকৃতির উপর নির্ভর করতে পারি না ? ১৫

নিম্নলিখিত কারণে আমরা রোগের আরোগ্যের জন্য প্রকৃতির উপর নির্ভর করতে পারি না ঃ

ডাঃ হ্যানিম্যান বলেন- কোন ঔষধ রোগীর ক্ষেত্রে সদৃশ বিধানমতে উপযোগী হওয়া সত্ত্বেও মাত্রা অত্যন্ত বড় হলে তার প্রতিটি মাত্রায় ক্ষতি সাধন করে এবং ঔষধ যত বেশী রোগের সদৃশ হয় ও যতই উচ্চশক্তিতে নির্বাচিত হয় তার বড় মাত্রাসমূহ ততোধিক ক্ষতি করে। উহা অসদৃশ ও রুগ্নাবস্থায় সম্পূর্ণ অনুপযোগী (allopathic) ঔষধের ঐরূপ বড় মাত্রা অপেক্ষা আরো বেশী ক্ষতিকর হয়ে থাকে। সুনির্বাচিত হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বড় মাত্রাসমূহ বিশেষ করে ঘনঘন প্রয়োগ করা হলে স্বাভাবিক নিয়মেই প্রভুত ক্ষতি সাধন করে। ইহা অর্থাৎ বড় মাত্রাসমূহ প্রায়ই রোগীর জীবন বিপন্ন করে তোলে বা রোগকে অসাধ্য করে দেয়। জীবনীশক্তির অনুভূতির দিক হতে এরা প্রাকৃতিক রোগকে ধ্বংস করে দেয় এবং হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বড়মাত্রা ব্যবহারের সময় হতে রোগ আর মূলরোগ ভোগ করে না ঠিকই কিন্তু তার ফলে রোগী সদৃশ অধিকতর উগ্র ঔষধজাত রোগের দ্বারা অধিকতর রুগ্ন হয়ে পড়েন। সেই রোগ দূর করা সর্বাপেক্ষা দুঃসাধ্য। অতএব, উপরিউক্ত কারণের জন্য আমরা রোগ আরোগ্যের জন্য প্রকৃতির উপর নির্ভর করতে পারি না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ঔষধের জ্ঞান (Knowledge of Medicine)
অনুচ্ছেদ- ১০৫- ১১৪

১। প্রশ্ন ঃ হোমিওপ্যাথিক ভেষজের প্রধান উৎসগুলো কি কি ?

হোমিওপ্যাথিক ভেষজের প্রধান উৎসসমূহ ঃ

(i) উদ্ভিদ ভেষজ (Plant drug),
(ii) প্রাণীজ ভেষজ (Animal Drug),
(iii) খনিজ ভেষজ (Mineral Durg),
(iv) রোগজ ভেষজ (Nosode Durg),
(v) গ্রন্থিজ ভেষজ (Sarcode)
(vi) শক্তিজ ভেষজ (Imponderabilia Drug),
(vii) স্টক ভ্যাক্সিন (Stock Vaccine),
(viii) অ্যান্টিবায়োটিক (Antibiotics)

২। প্রশ্ন ঃ ভেষজ ও ঔষধ এর সংজ্ঞা লিখ।

ভেষজ এর সংজ্ঞা (Drugs) ঃ

যে সকল পদার্থ সুস্থ শরীরে সেবন করলে রোগ লক্ষণাবলী প্রকাশ পায় এবং উক্ত পদার্থকে ফার্মাকোপিয়া মতে শক্তিকৃত করে ঐ সুস্থ শরীরে প্রকাশিত লক্ষণাবলী সদৃশ প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম রোগলক্ষণে প্রয়োগ করলে আরোগ্য হয়, তাকে ভেষজ বলে।

ঔষধ এর সংজ্ঞা (Medicine) ঃ

বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে ফার্মাকোপিয়ার নির্দিষ্ট ফর্মূলা অনুযায়ী ভেষজ পদার্থ হতে প্রস্তুতকৃত পদার্থ যা চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুসারে আভ্যন্তরিক বা বাহ্যিক প্রয়োগে রোগারোগ্য এবং রোগ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়, তাকে ঔষধ বলে।

৩। প্রশ্ন ঃ ঔষধ পরীক্ষা ও রোগী পরীক্ষার মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর।

ঔষধ পরীক্ষা ও রোগী পরীক্ষার মধ্যে সম্পর্ক ঃ

ঔষধ পরীক্ষা ও রোগী পরীক্ষার মধ্যে সর্ম্পক অত্যন্ত নিবিড়। ডাঃ হ্যানিম্যান "অর্গানন অব মেডিসিন" গ্রন্থের ১২০-১২৫নং অনুচ্ছেদে ঔষধ পরীক্ষা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং ৮৪-১০২ নং অনুচ্ছেদের রোগীলিপি সংগ্রহ অর্থাৎ লক্ষণ সমষ্টি সংগ্রহের নিয়মাবলী, যেমনঃ- রোগীর বর্ণনা হতে, সেবাকারীর বর্ণনা হতে, আত্মীয়-স্বজনের বর্ণনা হতে এবং চিকিৎসক নিজে রোগী সম্বন্ধে যা পর্যবেক্ষণ করেন এবং যন্ত্রপাতি ও প্যাথলজির পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা তার বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া রয়েছে।

সুস্থদেহে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ পরীক্ষা করলে ঔষধ কি কি রোগ লক্ষণ উৎপন্ন করতে সক্ষম তা জানা সম্ভব হয়। সুস্থ মানবদেহে পরীক্ষিত ঔষধসমূহের পরীক্ষালব্ধ লক্ষণসমূহ হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকাতে লিপিবদ্ধ আছে। সদৃশ বিধানে অর্থাৎ হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বিশেষ সুবিধা এই যে, সুস্থদেহে ঔষধ যে সকল রোগ লক্ষণ উৎপন্ন করে, কোন রোগীতে যদি অনুরূপ সদৃশ প্রকাশিত রোগ লক্ষণ দৃষ্ট হয় তবে সদৃশ লক্ষণ সম্পন্ন ঔষধ প্রয়োগে প্রাকৃতিক রোগ নিরাময় সম্ভব। তাই কোন রোগীর প্রাকৃতিক রোগের সৃষ্ট লক্ষণাবলী ঔষধের লক্ষণাবলীর সঙ্গে সদৃশ হলে তা প্রয়োগ করা হয়।

অতএব বলা যায়, ঔষধ পরীক্ষা সুস্থ মানবদেহে বিশুদ্ধ লক্ষণাবলী পাওয়ার উপায় এবং রোগী পরীক্ষা অসুস্থ দেহে প্রকাশিত লক্ষণাবলী দ্বারা সদৃশ ঔষধ পাওয়ার উপায়। সুতরাং ঔষধ পরীক্ষা ও রোগী পরীক্ষা একে অন্যের পরিপূরক বা সম্পূরক।

৪। প্রশ্ন ঃ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দ্বারা কিভাবে আরোগ্য সাধিত হয়? ১০

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দ্বারা নিম্নলিখিতভাবে আরোগ্য সাধিত হয় ঃ

প্রতিটি রোগ মানবদেহের জীবনীশক্তির অনুভূতি ও গতির মধ্যে বিশেষ, রুগ্নতাজ্ঞাপক, গতিময় পরিবর্তন দ্বারা প্রকাশিত হয়। সুতরাং প্রতিটি হোমিওপ্যাথিক আরোগ্যের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক রোগ কর্তৃক জীবনীশক্তির গতিশীলভাবে পরিবর্তিত অবস্থাকে, লক্ষণ সাদৃশ্যে সুনির্বাচিত শক্তিকৃত ঔষধজনিত অধিকতর শক্তিশালী সদৃশ কৃত্রিম রোগের দ্বারা আরোগ্য করা যায়। ইহার ফলে গতিশীল প্রাকৃতিক রোগের অবস্থিতির অনুভূতিবিলীন হয়ে অদৃশ্য হয়। এই রুগ্ন অভিব্যক্তি জীবনীশক্তিতে আর অবস্থান করে না। তা এখন অধিকতর শক্তিশালী কৃত্রিম রোগের আয়ত্বে থেকে পরিচালিত হয়। এই কৃত্রিম রোগশক্তি সহসা জীবনীশক্তির দ্বারা বিতাড়িত হয়। কাজেই রোগী রোগমুক্ত হয়ে জীবনীশক্তি স্বাস্থ্য লাভের পথে অগ্রসর হতে থাকে।

সুনির্বাচিত ঔষধের বিকল্প শক্তিই মানবদেহে ভৌতিক জীবনীশক্তির উপর ক্রিয়াশীল হয়। দেহের সর্বত্র বিরাজমান অনুভূতিবাহী স্নায়ুমণ্ডলীর মাধ্যমে এরা বোধগম্যভাবে কার্যকর হয়। কাজেই জীবনীশক্তির উপর গতিশীল কার্যকারীতা দ্বারা ঔষধসমূহ আরোগ্যবিধান করেও যথাযথ ঐক্যতান সৃষ্টি করে। সতর্ক পর্যবেক্ষণশীল ও অনুসন্ধিৎসু চিকিৎসকের নিকট রোগী স্বাস্থ্যের লক্ষণসমষ্টি আবশ্যকীয় পূর্ণাঙ্গ রোগীচিত্র হিসাবে উদিত হয় এবং তৎদ্বারা তিনি আরোগ্য বিধান করতে সমর্থ হন।

৫। প্রশ্ন ঃ কি কি রোগ লক্ষণ ও প্রবণতা প্রতিটি ঔষধে বিদ্যমান তা কিভাবে জানা যায় ? ১৩

রোগ লক্ষণ ও প্রবণতা প্রতিটি ঔষধে বিদ্যমান তা নিম্নলিখিতভাবে জানা যায় ঃ

মহাত্মা ডাঃ হ্যানিম্যান 'অর্গানন অব মেডিসিন' গ্রন্থের ১২০- ১২৫ নং অনুচ্ছেদে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সুস্থ মানবদেহে পরীক্ষা করার পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

প্রত্যেক ভেষজ পদার্থ তার নিজস্ব গুণ ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য রোগ লক্ষণ সৃষ্টি করে থাকে। কোন ভেষজ পদার্থের রোগোৎপাদক শক্তি ঐ ভেষজ পদার্থকে ফার্মাকোপিয়া অনুসারে শক্তিকৃত করে প্রয়োগ করলে তা আরোগ্য করে। প্রত্যেক ঔষধের রোগ লক্ষণ ও প্রবণতা সঠিকভাবে জানতে হলে- শিক্ষিত, সত্যবাদী, আদর্শবান, হোমিওপ্যাথির প্রতি দরদ সম্পন্ন এবং সুস্থ-সবল ব্যক্তির উপর ঔষধ পরীক্ষা করতে হবে। সুস্থ ব্যক্তি তাঁর দেহে প্রকাশিত সকল লক্ষণ সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করতে পারে। অতএব, রোগ লক্ষণ ও প্রবণতা প্রতিটি ঔষধে বিদ্যমান ঔষধ পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে জানা যায়।

৬। প্রশ্ন ঃ রোগ ও ঔষধের সম্পর্ক আলোচনা কর। ১৪

রোগ ও ঔষধের সম্পর্ক আলোচনা ঃ

রোগ ঃ জীবন বিরুধী কোন শক্তি বা প্রভাবের দ্বারা মানুষের জীবনী শক্তির বিশৃংঙ্খলা হেতু দেহ ও মনে প্রকাশিত অস্বাভাবিক চিহ্ন ও লক্ষণাবলীকে রোগ বলা হয়। রোগ হলো অজড়, অশুভ, প্রাকৃতিক শক্তি যা জীবনী শক্তির উপরে প্রভাব বিস্তার করলে দেহ ও মনে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ জীবনীশক্তি বিশৃংখলার ফলে শারীরিক ও মানসিক অস্বাভাবিক পরিবর্তন হওয়াকেই রোগ বলে।

ঔষধ ঃ বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে ফার্মাকোপিয়ার নির্দিষ্ট ফর্মূলা অনুযায়ী ভেষজ পদার্থ হতে প্রস্তুতকৃত পদার্থ যা চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুসারে আভ্যন্তরিক বা বাহ্যিক প্রয়োগে রোগারোগ্য এবং রোগ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়, তাকে ঔষধ বলে।

৭। প্রশ্ন ঃ সম্যকরূপে জানা ঔষধ ব্যতীত অন্য ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নয় - ব্যাখ্যা কর।

সম্যকরূপে জানা ঔষধ ব্যতীত অন্য ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নয় কারণঃ

মহাত্মা ডাঃ হ্যানিম্যান কর্তৃক আবিষ্কৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সুস্থ মানবদেহে পরীক্ষিত ঔষধ যা অর্গানন অব মেডিসিন গ্রন্থের ১২০- ১২৫ নং অনুচ্ছেদে বিস্তারিত বর্ণিত আছে।

ঔষধের উপর মানুষের জীবন-মৃত্যু, সুস্থতা-অসুস্থতা নির্ভর করে। এ ঔষধ সুস্থ মানবদেহের উপর পরীক্ষিত। সুস্থ দেহে ঔষধ পরীক্ষা করার কারণে ঔষধ দ্বারা রোগারোগ্যে লক্ষণ ও চিহ্ন সমূহ সুস্পষ্টভাবে মেটেরিয়া মেডিকাতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। মেটেরিয়া মেডিকাতে প্রতিটি ঔষধের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণাবলী বর্ণিত আছে। এ বর্ণিত লক্ষণাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান অর্থাৎ ঔষধ সম্বন্ধে বিস্তারিত জ্ঞান থাকলে রোগ আরোগ্যকর ঔষধটি প্রয়োগ করা সহজ হয়। ঔষধ সম্বন্ধে পর্যায়ক্রমে সামগ্রিকভাবে জানা থাকলে রোগীর দেহ ও মনে প্রকাশিত লক্ষণাবলী সদৃশ একটি ঔষধ নির্বাচন করা সহজ হয়। সুনির্বাচিত ঔষধ রোগী আরোগ্যের জন্য সহায়ক। কিন্তু সম্যকরূপে জানা ঔষধ ব্যতীত কোন ঔষধ প্রয়োগ করা হলে রোগী আরোগ্য না হয়ে রোগের জটিল আবস্থার সৃষ্টি হবে। সুতরাং সম্যকরূপে জানা ঔষধ ব্যতীত কোন ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নয়।

৮। প্রশ্ন ঃ কিরূপে ঔষধের আরোগ্যকারী ক্ষমতা জানা যায় ? ১১

ঔষধের আরোগ্যকারী ক্ষমতা জানার উপায় ঃ

সুস্থ মানবদেহে ভেষজ বা শক্তিকৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ স্থুল মাত্রায় প্রয়োগের ফলে যে কৃত্রিম রোগ লক্ষণ প্রকাশিত হয় বা ঔষধ তার সত্ত্বার স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী সুস্থদেহে কতগুলি লক্ষণ উৎপন্ন করে। প্রাকৃতিক রোগে আক্রান্ত রোগীর মধ্যে প্রকাশিত লক্ষণাবলী যদি ঐ ভেষজের কৃত্রিম লক্ষণের সদৃশ হয় তবে ঐ ভেষজকে ফার্মাকোপিয়া মতে ঔষধে রূপান্তর করে সূক্ষ্মমাত্রায় প্রয়োগ করলে আদর্শ আরোগ্য সাধিত হয়। তবেই বুঝা যাবে যে

ঔষধের আরোগ্যকারী ক্ষমতা আছে। ডাঃ হ্যানিম্যানের নির্দেশ অনুসারে সুস্থদেহে ঔষধ প্রুভিং করার মাধ্যমে ঔষধের আরোগ্যকারী ক্ষমতা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়।

অতএব, ঔষধের আরোগ্যকারী ক্ষমতা জানার জন্য সুস্থ সবল সুশিক্ষিত সুঠামদেহের সত্যবাদী, হোমিওপ্যাথির প্রতি নজর ... পরীক্ষিত ঔষধ রুগ্নব্যক্তির উপর ব্যবহার করতে হবে। হোমিওপ্যাথির ঔষধ সূক্ষ্মমাত্রায় প্রয়োগ করা হয় বিধায় ঔষধের ক্রিয়াকাল শেষ হলে ... লক্ষণ দূরীভূত হয় এবং জীবনীশক্তির প্রভাব মুক্ত হয়ে সুস্থ হয়ে ... জীবনীশক্তির প্রভাবমুক্ত হয়ে সুস্থ হয়ে পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার নাম আদর্শ আরোগ্য এটাই হোমিওপ্যাথিক সদৃশ বিধান আরোগ্য লাভের বিশেষ প্রাকৃতিক নিয়ম।

৯। প্রশ্ন ঃ মূল ঔষধ ও শক্তিকৃত ঔষধের মধ্যে পার্থক্য লিখ। ১২

মূল ঔষধ ও শক্তিকৃত ঔষধের মধ্যে পার্থক্য ঃ

মূল ঔষধ		শক্তিকৃত ঔষধ
ঔষধ তৈরির উৎস থেকে ফার্মাকোপিয়া মতে প্রস্তুতকৃত উপাদানকে, মূল ঔষধ বলে।	১	মূলঔষধ থেকে ফার্মাকোপিয়া মতে প্রস্তুতকৃত উপাদানকে, শক্তিকৃত ঔষধ বলে।
মূল ঔষধের মধ্যে রোগ উৎপাদনকারী ও রোগ উপশমকারী ক্ষমতা বর্তমান থাকে।	২	শক্তিকৃত ঔষধের মধ্যে রোগ উৎপাদনকারী ও রোগারোগ্যকারী ক্ষমতা বর্তমান থাকে।
মূল ঔষধ দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম রোগের লক্ষণাবলী প্রাকৃতিক রোগের লক্ষণাবলী সদৃশ হলেও রোগ আরোগ্য হয় না।	৩	শক্তিকৃত ঔষধ দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম রোগের লক্ষণাবলী প্রাকৃতিক রোগের লক্ষণাবলী সদৃশ হলে রোগ আরোগ্য হয়।
মূল ঔষধের ভেষজ এর পরিমাণ বেশি থাকে।	৪	শক্তিকৃত ঔষধের ভেষজ এর পরিমাণ কম থাকে।
ইহাকে Q প্রকাশ করা হয়।	৫	ইহাকে ১x, ৩০, ২০০ এবং m/3 প্রকাশ করা হয়।

১০। প্রশ্ন ঃ রোগ কি? "রোগের চেয়ে ঔষধ শক্তিশালী"- ব্যাখ্যা কর। বা, প্রমাণ কর যে, "রোগের চেয়ে ঔষধ শক্তিশালী"। ১৭

রোগের চেয়ে ঔষধ শক্তিশালী ঃ

ডাঃ স্যামুয়েল হ্যানিম্যান "অর্গানন অব মেডিসিন" গ্রন্থের ৩০-৩৪ নং অনুচ্ছেদে ঔষধ ক্রিয়া সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

মানবদেহে প্রাকৃতিক রোগজ-উদ্দীপনা অপেক্ষা ঔষধের দ্বারা অধিকতর প্রবলভাবে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। সেজন্য উপযোগী ঔষধ সমূহের দ্বারা প্রাকৃতিক রোগ নিরাকৃত ও পরাভূত হয়। অনিষ্টকর রোগ সৃষ্টিকারী উপাদানের দ্বারা আক্রান্ত হবার যথার্থ অবস্থা ও প্রবণতা থেকে রোগ সৃষ্টি হয় যা স্বাস্থ্যের পরিবর্তিত অবস্থা, বিকৃতি এবং বিভিন্ন অস্বাভাবিক অনুভূতি ও ক্রিয়া প্রকাশ করে। জীবনীশক্তির জন্য ক্ষতিকর রোগ সৃষ্টিকারী জীবন্ত দেহতন্ত্র বিরোধী উপাদানসমূহ মানবদেহকে সব সময়ে অসুস্থ করতে পারে না।

উপরিউক্ত তথ্যানুসারে সর্বপ্রকার অভিজ্ঞতার দ্বারা ইহাই নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা যায় যে রোগ সৃষ্টিকারী উপাদানসমূহ, সংক্রামক মায়াজমসমূহ অপেক্ষা জীবন্ত মানুষের শরীরতন্ত্র ঔষধজ শক্তিসমূহের দ্বারা অনেক বেশি অবিভূত, আক্রান্ত ও স্বাস্থ্যচ্যুত হতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ রোগ সৃষ্টিকারী ক্ষতিকর উপাদানসমূহের দ্বারা মানুষের সুস্থ শরীরকে অসুস্থ করার শক্তি গৌণ ও শর্তসাপেক্ষ। কিন্তু ভেষজ পদার্থের শক্তি সম্পূর্ণ শর্তহীন, এমন কি পূর্বোক্ত শক্তি অপেক্ষা অনেক বেশি শক্তিশালী।

চিকিৎসিত রোগের আরোগ্য সাধনের জন্য শক্তিকৃত ঔষধই প্রায় সদৃশ ও বলবত্তর একটি কৃত্রিম রোগ মানব শরীরে সৃষ্টি করতে পরে। কৃত্রিম রোগ স্বাভাবিক রোগজনিত সর্বপ্রকার বিকৃতিতে আচ্ছন্ন, নির্বাপিত ও ধ্বংস করে। সুতরাং সুস্থ মানবদেহে সদৃশ রুগ্ন-অবস্থা সৃষ্টি

করতে অসমর্থ হলে সে ঔষধের সাহায্যে আরোগ্যের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।

পক্ষান্তরে ঔষধ শক্তি কোনরূপ পূর্বশর্ত ছাড়াই দেহে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। সুস্থ বা অসুস্থ দেহে ঔষধের কোন একটি শক্তি কাজ না করলে ঔষধের শক্তি বৃদ্ধি করা যায়। সুতরাং রোগের চেয়ে ঔষধ শক্তিশালী।

১১। প্রশ্ন ঃ বিভাজিত হলে ঔষধ শক্তিশালী হয় কেন ? ১৫

বিভাজিত হলে ঔষধ শক্তিশালী হয় কারণ ঃ

ডাঃ হ্যানিম্যান হোমিওপ্যাথি অর্থাৎ সদৃশ বিধান আবিষ্কার করেন। তিনি প্রত্যক্ষ করেন যে ভেষজের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে ঔষধি গুণ সম্পন্ন বস্তু রয়েছে। এই সব ভেষজকে ফার্মাকোপিয়ার একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্যমে শক্তিকৃত করে ঔষধ প্রস্তুত করলে এবং তা রোগীকে সেবন করতে দিলে রোগ আরোগ্য হয়। ডাঃ হ্যানিম্যান অর্গানন অব মেডিসিনের ৫ম সংস্করণ পর্যন্ত ঔষধকে শক্তিকরণের জন্য দুইটি স্কেল অর্থাৎ দশমিক স্কেল, শততমিক স্কেল এবং ৬ষ্ঠ সংস্করণে রোগীকে দ্রুত আরোগ্যর জন্য ৫০ সহস্রতমিক স্কেলের কথা বর্ণনা করেন। ভেষজকে যতই ক্ষুদ্র ভাগে বিভাজিত করা হয় তার ভিতরে ঔষধি ক্ষমতা ততবেশি বৃদ্ধি পায়। ঔষধ প্রয়োগের পর রোগীর ক্রমোন্নতি অব্যাহত থাকলে এবং জীবনে কখনো ভোগ করেন নাই এমন কোন লক্ষণ এসে উপস্থিত না হলে একইভাবে পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু মিশ্রণের প্রতিটি মাত্রা শক্তিকে প্রয়োগের পূর্বে খুব সজোরে ঝাঁকি দিয়ে কিছুটা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত, বিভাজিত করে প্রয়োগ করলে অধিক কার্যকর হয়। সুতরাং বিভাজিত হলে ঔষধ শক্তিশালী হয়।

সপ্তম অধ্যায়

ঔষধ-পরীক্ষা (Proving of Medicines)

অনুচ্ছেদ- ১২০-১২৫

১। প্রশ্ন ঃ সুস্থ মানব দেহে ভেষজ পরীক্ষণের উদ্দেশ্য কি? বর্ণনা কর।
১০, ১২

সুস্থ মানব দেহে ভেষজ পরীক্ষণের উদ্দেশ্য ঃ

ডাঃ হ্যানিম্যান কর্তৃক আবিষ্কৃত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি সদৃশ লক্ষণানুসারে চিকিৎসা কার্য পরিচালিত হয়। বিশ্বজনীন আরোগ্য নীতি 'সদৃশ সদৃশকে প্রতিহত করে' এ উপর চিকিৎসা কার্য পরিচালিত হয়। সুতরাং সুস্থ মানবদেহে ভেষজ পরীক্ষণের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

তা নিম্নরূপ ঃ কোন ঔষধের অন্তর্নিহিত শক্তির সামগ্রিক পরিচয় শুধু মাত্র সুস্থ মানবদেহে সে ভেষজের দ্বারাই পাওয়া সম্ভব। কেননা শুধু মাত্র সুস্থ মানুষই সঠিকভাবে বলতে পারে ঔষধ প্রয়োগের ফলে তাঁর দেহ ও মনে কি ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ইতর প্রাণীর পক্ষে তা জানা ও বলা সম্ভব নয়। মানব দেহে ফিজিওলজিক্যাল অবস্থা আর ইতর প্রাণীর ফিজিওলজিক্যাল অবস্থা এক নয়, ফলে ঔষধের ক্রিয়া মানুষ ও ইতর প্রাণীতে অনেক সময় বিভিন্ন হয়। তাছাড়া রুগ্ন মানুষের উপর পরীক্ষা করে ঔষধের প্রাকৃতিক গুণাগুণ জানা সম্ভব হয় না। কেননা ঔষধ প্রয়োগের ফলে স্বাস্থ্যের যে পরিবর্তন আশা করা যায় তা রোগ লক্ষণের সাথে মিলে যায়। ফলে ঔষধ দ্বারা স্বাস্থ্যের বিচ্যুতি পরিষ্কারভাবে জানা সম্ভব হয় না। তাই সুস্থ মানুষের উপর পরীক্ষা ছাড়া, অন্য কোন উপায় নাই যা দ্বারা ঔষধের গুণাগুণের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যেতে পারে।

অতএব ডাঃ হ্যানিম্যানের লিখিত গ্রন্থ অর্গানন অব মেডিসিনের নির্দেশ অনুসারে সুস্থ মানুষের উপর ঔষধ পরীক্ষা করার গুরুত্ব উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

২। প্রশ্ন ঃ পরীক্ষিত ঔষধের লক্ষণাবলী লিপিবদ্ধকরণ পদ্ধতি লিখ।

পরীক্ষিত ঔষধের লক্ষণাবলী লিপিবদ্ধকরণ পদ্ধতি ঃ

(i) প্রকাশিত লক্ষণসমূহের অবস্থান সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(ii) ঔষধের বিশেষ অনুভূতি সৃষ্টি হলে তার সঠিক প্রকৃতি নির্ধারণ করে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(iii) লক্ষণসমূহের বৃদ্ধি বা উপশম কখন, কিভাবে, কি অবস্থায় ঘটে থাকে তা লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(iv) প্রত্যেকটি ঔষধকে ইহার বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ ক্রিয়া নির্ণয় করার জন্য ভেষজ পদার্থকে বিশুদ্ধ অবস্থায় এবং এককভাবে প্রয়োগ করতে হবে। যতদিন পর্যন্ত এই ভেষজ পদার্থের লক্ষণাবলী বা ফলাফল পর্যবেক্ষণ করা হবে, ততদিন অন্য কোন ভেষজ জাতীয় দ্রব্য সেবন করা যাবে না।

৩। প্রশ্ন ঃ ঔষধ পরীক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য কি ? ০৯

বা, ঔষধ পরীক্ষার উদ্দেশ্য বর্ণনা কর।

ঔষধ পরীক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য ঃ

(i) ঔষধের রোগোৎপাদিকা শক্তির পূর্ণ পরিচয় সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানা, অর্থাৎ সুস্থাবস্থায় দেহ তন্ত্রের ক্রিয়ায় ও অনুভূতিতে কিরূপ বিকৃতি সাধন করে তাহা জানা। ঔষধের ক্রিয়া সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা।

(ii) জীবনীশক্তির উপর ঔষধের ক্রিয়া দ্বারা স্পষ্টভাবে লক্ষণগুলির প্রকাশ আবিষ্কার করা।

(iii) ঔষধের প্রাকৃতিতে বৈশিষ্ট্যাবলীর স্বাতন্ত্র্য অনুধাবন করা ও উহার হতে অন্যটিকে পৃথক করা।

(iv) সদৃশ লক্ষণযুক্ত রোগে এ ঔষধের উপযুক্ত প্রয়োগ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।

(v) রোগী আরোগ্য কল্পে একটিমাত্র ঔষধকে নির্বাচিত করার পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করা।

৪। প্রশ্ন ঃ ভেষজ পরীক্ষার পদ্ধতি আলোচনা কর। ১০

ভেষজ পরীক্ষার পদ্ধতি আলোচনা ঃ

ডাঃ ক্রিশ্চিয়ান ফ্রেড্রিক স্যামুয়েল হ্যানিম্যানের চিকিৎসা আইন "অর্গানন অব মেডিসিন" এ ভেষজ পরীক্ষা বা ঔষধ পরীক্ষা সম্বন্ধে ১২০-১২৬ নং অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন।

ঔষধের উপরই মানুষের জীবন-মৃত্যু, সুস্থতা-অসুস্থতা নির্ভর করে। এই উদ্দেশ্যে সুস্থ মানবদেহের উপর ইহাদের সযত্ন, যথার্থ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এদের শক্তি ও প্রকৃত কার্যকারীতা সম্বন্ধে চিকিৎসকের যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে হবে। একমাত্র নির্ভুল ঔষধ প্রয়োগের দ্বারাই পার্থিব শ্রেষ্ঠতম সম্পদ শারীরিক-মানসিক সুস্থ্যতা দ্রুত, স্থায়ীভাবে পুনঃরায় ফিরিয়ে আনা যেতে পারে। এই ভেষজসমূহের প্রত্যেকটিকেই সর্বতোভাবে একক ও নির্ভেজাল অবস্থায় সংগ্রহ করতে হবে। সুস্থ্য মানবদেহের উপর ঔষধের কার্যকারীতা পরীক্ষা করার সময় মনে রাখতে হবে যে উগ্র বীর্যবান পদার্থসমূহ অতি সূক্ষ্মমাত্রাতে ও বলিষ্ট ব্যক্তির স্বাস্থ্যে পরিবর্তন ঘটে থাকে। মৃদু-বীর্য পদার্থগুলি স্থুল মাত্রা প্রয়োগের দরকার হয়। নিতান্ত লঘু-বীর্য পদার্থসমূহের ফলাফল পরীক্ষা করার জন্য নীরোগ অথচ দুর্বল, উত্তেজনা-প্রবণ ও অনুভূতিশীল ব্যক্তিকে প্রয়োগ করতে হবে।

যতদিন পরীক্ষা চলবে ততদিন পানাহার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রন করতে হবে। খাদ্যদ্রব্য যতদূর সম্ভব মসলা বর্জিত হবে তা যথার্থ পুষ্টিকর ও সাদাসিধে হতে হবে।

এই সকল পরীক্ষার জন্য প্রত্যেকটি ভেষজ দ্রব্যের সহিত অন্যকোন পদার্থ মিশ্রিত না করে এককভাবে এবং সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ অবস্থায় প্রয়োগ করতে হবে। যতদিন পর্যন্ত ঔষধের ফলাফল লক্ষ্য করা হয়, ততোদিন ঔষধ জাতীয় কোন কিছু সেবন করা যাবে না।

৫। প্রশ্ন ঃ ভেষজ পরীক্ষাকালে কিরূপ মাত্রা নির্ণয় করা হয়? ১৫
ভেষজ পরীক্ষাকালে নিম্নরূপ মাত্রা নির্ণয় করা হয় ঃ

ঔষধের নিজস্ব বিশেষ কার্যকারিতা অবগত হবার জন্য পরীক্ষাকারীকে স্থূলমাত্রায় ভেষজ পদার্থ সেবন করে তাদের অন্তর্নিহিত শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ প্রায় পরিস্ফুট হয় নাই। কিন্তু সেগুলিকে যথাযথভাবে ঘর্ষণ করে ঝাঁকি দিয়ে উচ্চক্রমে রূপান্তরিত করে প্রয়োগ করা হলে সেই শক্তি পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়। স্থূল অবস্থায় এদের মধ্যে যে শক্তি সুপ্ত ছিল এই সহজ পদ্ধতিতে তা ধারণাতীতভাবে বর্ধিত হয় ও জাগ্রত হয়ে সক্রিয় হয়ে উঠে। অতএব লঘু বীর্য ঔষধেরও পরীক্ষা করে ভেষজশক্তি নির্ধারণ করার জন্য এইটিই সর্বোত্তম পন্থা। ঔষধের ত্রিশ শক্তির চারটি বা ছয়টি অত্যন্ত ক্ষুদ্র অনুবটিকা সামান্য পানিতে সিক্ত করে অথবা অল্পাধিক পানিতে দ্রব্য করে ও উত্তমরূপে মিশিয়ে পরীক্ষাকারীকে খালি পেটে সেবন করতে দেয়া হয়। কয়েকদিন ধরে তাঁকে ইহা সেবন করতে হবে। এই পদ্ধতি অনুসারে পরীক্ষাকার্য চালিয়ে সর্বোত্তম সুফল অর্থাৎ ঔষধের অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে জানা যায়। এরূপ মাত্রায় যদি অতি সামান্য ক্রিয়া প্রকাশিত হয় তাহলে যতদিন পর্যন্ত ঔষধের ফলাফল সু-স্পষ্টরূপে ও সমধিক প্রকাশিত না হয় এবং স্বাস্থ্যের পরিবর্তন সু-প্রকট না হয় ততদিন পর্যন্ত প্রত্যেহ আরো কয়েকটি অনুবটিকা প্রযোগ করতে হবে। কারণ একই ঔষধের দ্বারা সকলে সমানভাবে অভিভূত হয় না। উপরন্তু এই বিষয়ে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। যেমন- যে দুর্বল ব্যক্তি পরিমিত মাত্রায় উগ্র-বীর্য ঔষধের দ্বারা আদৌ প্রভাবান্বিত হন না, কিন্তু লঘু-বীর্য ঔষধের দ্বারা সেই ব্যক্তিই প্রবলভাবে আক্রান্ত হন। পক্ষান্তরে দেখা যায় যে অত্যন্ত বলবান ব্যক্তিও লঘু-বীর্য ঔষধের প্রভাবে বিভিন্ন রোগ লক্ষণে আক্রান্ত হন, আবার উগ্রশক্তির ঔষধের দ্বারা তাঁর সামান্য কতিপয় লক্ষণ মাত্র প্রকাশিত হয়। এই বিষয়ে পূর্ব হতে কিছু জানা অসম্ভব বলেই ডাঃ

হ্যানিম্যান বলেছেন, যে প্রত্যেকটি পরীক্ষা ক্ষেত্রেই ঔষধের ক্ষুদ্রমাত্রা নিয়ে আরম্ভ করা সঙ্গত, উপযোগিতা ও প্রয়োজন অনুসারে প্রতিদিন ক্রমান্বয়ে মাত্রা বৃদ্ধি করাই যুক্তি সংগত।

৬। প্রশ্ন ঃ রোগী পরীক্ষা কাকে বলে? রোগী পরীক্ষার আবশ্যকতা কি? ১০

রোগী পরীক্ষা ঃ

চিকিৎসক রোগীর কষ্টকর লক্ষণাবলী সংগ্রহ করে, সেগুলোকে পর্যালোচনা করে এবং চিকিৎসক নিজে পঞ্চইন্দ্রিয় দ্বারা রোগীকে পর্যবেক্ষণ করে, রোগের কারণতত্ত্ব নিয়ে ঔষধ নির্বাচন পদ্ধতিকে, রোগী পরীক্ষা বলা হয়।

রোগী পরীক্ষার আবশ্যকতা ঃ

রোগী পরীক্ষার ফলে রোগীর রোগ লক্ষণসমূহ দ্বারা মেটেরিয়া মেডিকায় লিপিবদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ হতে সর্বাধিক সদৃশ একটি ঔষধ নির্বাচন করা সম্ভব হয়। রোগীর মানসিক, ধাতুগত ও সার্বদৈহিক লক্ষণাবলী নিয়ে রোগীলিপি প্রস্তুত করতে হয়। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতিতে রোগীর রোগ লক্ষণের সদৃশ মেটেরিয়া মেডিকা হতে ঔষধের লক্ষণসমষ্টির সাথে মিলিয়ে রোগীর ঔষধ নির্বাচন করতে হয়। রোগীর একটি পূর্ণাঙ্গ রোগচিত্র ফুটিয়ে তোলা এবং রোগের প্রগনোসিস ও জটিলতা সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার জন্য রোগী পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশি। পক্ষান্তরে রোগী পরীক্ষা না করে রোগ যন্ত্রণা সম্বন্ধে মুখেমুখে শুনে ঔষধ নির্বাচন করলে রোগী প্রকৃত অর্থাৎ ডাঃ হ্যানিম্যানের আদর্শ আরোগ্য সম্ভব নয়।

অতএব, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় রোগী পরীক্ষার আবশ্যকতা ব্যাপক।

৭। প্রশ্ন ঃ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের সবচেয়ে কঠিন কাজ রোগীলিপি প্রস্তুত করা - ব্যাখ্যা কর ? ০৯

বা, ঔষধ নির্বাচনে চিকিৎসকের সবচেয়ে কঠিন কাজ কোনটি এবং কেন?

বা, রোগীলিপি চিকিৎসা কার্যের একটি প্রধান অংশ- আলোচনা কর।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের সবচেয়ে কঠিন কাজ রোগীলিপি প্রস্তুত ঃ

হোমিওপ্যাথিক সর্বজনীননীতি "সদৃশ সদৃশকে প্রতিহত করে"। হোমিওপ্যাথিতে "রোগ নয়, রোগীকে চিকিৎসা কর, রোগীকে আংশিক বা আঙ্গিকভাবে নয়, সামগ্রীকভাবে চিকিৎসা কর"- ইহার ডাঃ হ্যানিম্যানের আদর্শনীতি।

উপরিউক্ত নীতিসমূহ বাস্তবায়িত করতে হলে একজন আদর্শ চিকিৎসককে একটি আর্দশ রোগীলিপি তৈরী করতে হবে।

রোগীলিপি প্রস্তুতের নিয়ম কানুন ও রোগীলিপি প্রস্তুতে চিকিৎসকের গুণাবলী সম্বন্ধে ডাঃ হ্যানিম্যান অর্গানন অব মেডিসিন-এর ৮৩-১০২নং অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

চিকিৎসক অর্গানন অব মেডিসিন ৮৩ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত গুণাবলীর অধিকারী হয়ে, ৮৪-১০২নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত নিয়মে রোগী, আত্নীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধন, সেবাকারীদের নিকট হতে রোগ লক্ষণ সংগ্রহ করবেন এবং তিনি স্বয়ং রোগীকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রোগের নিশ্চিত লক্ষণাবলী সংগ্রহ পূর্বক মেটেরিয়া মেডিকা হতে সদৃশ ঔষধ নির্বাচন করে রোগীর জন্য ব্যবস্থা করবেন।

অতএব, উপরিউক্ত পদ্ধতি মেনে আদর্শ রোগীলিপি প্রস্তুত করা, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের সবচেয়ে কঠিন ও অপরিহার্য কাজ।

৮। প্রশ্ন ঃ "রোগীলিপি না করে সদৃশতম ঔষধ নির্বাচন অসম্ভব"- যুক্তি দেখাও।

বা, "রোগীলিপি না করে সদৃশতম ঔষধ নির্বাচন সম্ভব নয়"- যুক্তি দাও।

রোগীলিপি না করে সদৃশতম ঔষধ নির্বাচন অসম্ভব ঃ

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি হচ্ছে "সিমিলিয়া সিমিলিবাস কিউরেন্টার" অর্থাৎ সদৃশ দ্বারা সদৃশকে আরোগ্য সাধন। রোগচিত্র সঠিকভাবে প্রণয়ন করা একজন চিকিৎসকের সর্বাপেক্ষা প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কাজ। চিররোগের ক্ষেত্রে চিকিৎসক এ রোগীলিপি তার সদৃশতম ঔষধ নির্বাচনের জন্য পথ প্রদর্শক হিসাবে ব্যবহার করবেন। এ রোগীলিপি দ্বারা রোগীর জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধটি সহজেই নির্বাচিত করা হয়। নির্বাচিত ঔষধ প্রয়োগের ফলে রোগীর দেহ ও মনে কি পরিমাণে উন্নতি সাধিত হচ্ছে তা রোগীলিপির মাধ্যমে জানা যায়। রোগীলিপি করে প্রয়োগকৃত ঔষধের শক্তি, মাত্রা বা অন্য কোন কারণে রোগের বৃদ্ধি হল কিনা তা সহজেই চিকিৎসকের নজরে আসে। যদি চিকিৎসক রোগীলিপি না করে সদৃশতম ঔষধ নির্বাচন করে তা হলে ঔষধ প্রকৃত সদৃশ হবে না কারণ রোগীর সামগ্রীক বৈশিষ্ট্য তার মনে রাখা সম্ভব হয়। মহাত্মা ডাঃ হ্যানিম্যান বলেছেন যারা মুখে মুখে শুনে রোগী চিকিৎসায় ঔষধ প্রয়োগ করেন ও আরোগ্যের চেষ্টা করেন তারা শুধু রোগীদের ঠকাচ্ছে না নিজেদেরকেও ঠকাচ্ছে।

অতএব, রোগীলিপি না করে সদৃশমত ঔষধ নির্বাচন অসম্ভব। প্রকৃত আরোগ্য করতে হলে ডাঃ হ্যানিম্যান নির্দেশিত নিয়ম অনুযায়ী রোগীলিপি করতে হবে।

১২। প্রশ্ন ঃ অণুবীক্ষণ বা বীক্ষণাগারের বিশ্লেষণ দ্বারা ঔষধের আরোগ্য শক্তি কি আবিষ্কার করা যায়। ১৫

অণুবীক্ষণ বা বীক্ষণাগারের বিশ্লেষণ দ্বারা ঔষধের আরোগ্য শক্তি আবিষ্কার ঃ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ শক্তিকরণের পদ্ধতি তিনটি। যথা- ১। দশমিক পদ্ধতি, ২। শততমিক পদ্ধতি ও ৩। সহস্রতমিক পদ্ধতি।

সুস্থ শরীরে ভেষজরাজী যে পরিবর্তন আনয়ন করতে পারে তা পর্যবেক্ষণই এদের শক্তি নিরূপন করার একমাত্র সম্ভাব্য পন্থা।ঔষধ লক্ষণসমূহের পর্যায়ক্রমিক সম্বন্ধ ও ক্রিয়ার স্থিতিকাল লক্ষ্য না করে বিশেষতঃ মৃদু প্রকৃতির ঔষধসমূহের যখন শুধুমাত্র লক্ষণগুলির পরিচয় লাভ করাই উদ্দেশ্য হয় তখন ক্রমবর্ধিত মাত্রা উপর্যপরি কয়েকদিন প্রত্যেহ ঔষধ প্রয়োগ করে যাওয়াই শ্রেয়। সর্বপ্রকার বাহ্যিক প্রভাবসমূহ, বিশেষতঃ ঔষধসমূহ, নিজস্ব প্রকৃতি অনুসারে জীবন্ত শরীরতন্ত্রে একপ্রকার বিশেষ পরিবর্তন ঘটতে পারে। কিন্তু একই ভেষজের অন্তর্গত সকল লক্ষণ একই ব্যক্তিতে একই সঙ্গে পরীক্ষাকালে বিকশিত হয় না। অবিমিশ্রিত ঔষধসমূহের বিশুদ্ধ কার্যকারিতার ফলে মানবস্বাস্থ্যের কিরূপ বিকৃতি সাধন করতে পারে এবং কি ধরণের কৃত্রিম রোগ ও লক্ষণসমূহ সৃষ্টি করতে সক্ষম তা সাম্যকভাবে অবগত হবার জন্য সুস্থ সংস্কারমুক্ত ও অনুভূতিশীল চিকিৎসক নিজের উপরই এভাবে বর্ণিত নির্দেশ অনুসারে সর্বপ্রযত্নে ও সতর্কতার সহিত ঔষধ পরীক্ষা করতে পারেন।

জগতের সর্বপ্রকার যথার্থ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অভ্রান্ত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই আরোগ্যের এই প্রাকৃতিক নিয়ম আত্মপ্রকাশ করে। কাজেই এ সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত। কেমন করে ইহা ঘটে, তার বৈজ্ঞানিক যুক্তি কি হতে পারে, তাতে কিছু আসে যায় না। আমিও সেই ব্যাখ্যা দিতে খুব গুরুত্ব আরোপ করি না।

অষ্টম অধ্যায়

ঔষধ পরীক্ষক

ঔষধ-পরীক্ষক (Prover of Medicines)

অনুচ্ছেদ- ১২৬-১৪২

১। প্রশ্ন ঃ একজন ভেষজ পরীক্ষকের প্রয়োজনীয় গুণাবলী কি কি?
বা, একজন উত্তম ভেষজ পরীক্ষকের গুণাবলী কি কি? ১৪, ১৬
বা ভেষজ পরীক্ষক কেমন হওয়া উচিত? ১৫
বা, ভেষজ পরীক্ষা কি ? যার উপর ভেষজ পরীক্ষা করা হবে তার গুণাবলী উল্লেখ কর। ০৮, ০৯

একজন ভেষজ পরীক্ষকের প্রয়োজনীয় গুণাবলী নিম্নরূপ ঃ

ডাঃ ক্রিশ্চিয়ান ফ্রেড্রিক স্যামুয়েল হ্যানিম্যানের চিকিৎসা আইন "অর্গানন অব মেডিসিন" এ ভেষজ পরীক্ষক সম্বন্ধে ১২৬-১৪২ নং অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন।

(i) ভেষজ পরীক্ষককে সুস্থ, সবল ও স্বাভাবিক হতে হবে।
(ii) সম্পূর্ণ বিশ্বস্থ ও বিবেকবান হতে হবে।
(iii) পরীক্ষা চলাকালীন তাঁকে মানসিক ও শারীরিক অতিরিক্ত পরিশ্রম, সর্বপ্রকার অমিতাচার ও বিরক্তিকর উত্তেজনাসমূহ বর্জন করতে হবে।
(iv) চিত্র চাঞ্চল্যকর কোন জরুরী কাজে তাঁর কোন আকর্ষণ থাকবে না।
(v) সর্বদা আত্ম-পর্যবেক্ষণে তিনি নিমগ্ন থাকবেন।
(vi) তার শরীর যে ভাবে সুস্থ থাকে সে ভাবে তিনি থাকবেন।
(vii) অনুভূতিসমূহ যথার্থভাবে ব্যক্ত ও বর্ণনা করার মত যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা তাঁর থাকতে হবে।
(viii) পরীক্ষককে সুশিক্ষিত হতে হবে এবং হোমিওপ্যাথির প্রতি দরদী, বিশ্বাস ও ভক্তি থাকতে হবে।

উপরিউক্ত গুণাবলীসমূহ যে পরীক্ষকের মধ্যে থাকবে তিনি হবেন একজন আদর্শ ভেষজ পরীক্ষক।

২। প্রশ্ন ঃ ভেষজ পরীক্ষা কি? যাঁর উপর ভেষজ পরীক্ষা করা হয়, তাঁর গুণাবলী উল্লেখ কর। ১০, ১২

বা ভেষজ পরীক্ষা কি? একজন ভেষজ পরীক্ষকের প্রয়োজনীয় গুণাবলী কি কি?

ভেষজ পরীক্ষা (Drug proving) ঃ

ভেষজকে আরোগ্যদায়িনী শক্তিরূপে ব্যবহার করতে হলে তার রোগাৎপাদিকা শক্তির পূর্ণ পরিচয় জানা আবশ্যক। ভেষজের অন্তর্নিহিত শক্তির সম্বন্ধে সম্যক পরিচয় বা জ্ঞান লাভ করার উদ্দেশ্যে ভেষজ পরীক্ষার গুণাবলী সম্বলিত সুস্থ মানবদেহে ভেষজের বিধিসম্মত পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষনকে ভেষজ পরীক্ষা বা ড্রাগ প্রুভিং বলে।

একজন ভেষজ পরীক্ষকের প্রয়োজনীয় গুণাবলী নিম্নরূপ ঃ-

ডাঃ ক্রিশ্চিয়ান ফ্রেড্রিক স্যামুয়েল হ্যানিম্যানের চিকিৎসা আইন "অর্গানন অব মেডিসিন" এ ভেষজ পরীক্ষক সম্বন্ধে ১২৬-১৪২ নং অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন।

(i) ভেষজ পরীক্ষককে সুস্থ, সবল ও স্বাভাবিক হতে হবে।

(ii) সম্পূর্ণ বিশ্বস্থ ও বিবেকবান হতে হবে।

(iii) পরীক্ষা চলাকালীন তাঁকে মানসিক ও শারীরিক অতিরিক্ত পরিশ্রম সর্বপ্রকার অমিতাচার ও বিরক্তিকর উত্তেজনাসমূহ বর্জন করতে হবে।

(iv) চিত্র চাঞ্চল্যকর কোন জরুরী কাজে তাঁর কোন আকর্ষণ থাকবে না।

(v) সর্বদা আত্ম-পর্যবেক্ষনে তিনি নিমগ্ন থাকবেন।

(vi) তার শরীর যে ভাবে সুস্থ থাকে সে ভাবে তিনি থাকবেন।

(vii) অনুভূতিসমূহ যথার্থভাবে ব্যক্ত ও বর্ণনা করার মত যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা তাঁর থাকতে হবে।

(viii) পরীক্ষককে সুশিক্ষিত হতে হবে এবং হোমিওপ্যাথির প্রতি দরদী, বিশ্বাস ও ভক্তি থাকতে হবে।

উপরিউক্ত গুণাবলীসমূহ যে পরীক্ষকের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে তিনি হবেন একজন আদর্শ ভেষজ পরীক্ষক।

৩। প্রশ্ন ঃ- চিকিৎসকের নিজের উপর ঔষধ পরীক্ষণের সুবিধা কি ?১১
চিকিৎসকের নিজের উপর ঔষধ পরীক্ষার সুবিধা ঃ

ডাঃ ক্রিশ্চিয়ান ফ্রেড্রিক স্যামুয়েল হ্যানিম্যানের "অর্গানন অব মেডিসিন" গ্রন্থের ১৪১ নং অনুচ্ছেদে চিকিৎসকের নিজের উপর ঔষধ পরীক্ষা করাই সর্বাপেক্ষা উত্তম বলেছেন।

চিকিৎসকের নিজের উপর ঔষধ পরীক্ষা করলে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি পাওয়া যায়। যেমন-

(i) কৃত্রিমভাবে উৎপন্ন রোগের অভিজ্ঞতার সাথে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট রোগের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়।
(ii) ঔষধের সঠিক গুণ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা।
(iii) রোগীর যাবতীয় কষ্টকে চিকিৎসকের অনুভব করা।
(iv) রোগের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।
(v) অন্যের উপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজেই ঔষধ পরীক্ষণে দক্ষতা অর্জন করা।

অতএব প্রত্যেক ঔষধ মানব স্বাস্থ্যের যে সকল পরিবর্তন করে বা লক্ষণসমূহ উৎপাদন করতে পারে চিকিৎসক ডাঃ হ্যানিম্যানের ১২১-১৪০ নং অনুচ্ছেদের উপদেশসমূহ হতে যথার্থভাবে জানতে পারেন।

৪। প্রশ্ন ঃ ইতর প্রাণীর উপর ঔষধ পরীক্ষা করা হয় না কেন ? ১২
বা ইতর প্রাণীর উপর ঔষধ পরীক্ষা, কুফল কি? ১০
ইতর প্রাণীর উপর ঔষধ পরীক্ষা করা হয় না কারণ ঃ

ডাঃ ক্রিশ্চিয়ান ফ্রেড্রিক স্যামুয়েল হ্যানিম্যান কর্তৃক নির্দেশিত ঔষধ পরীক্ষাকারীর গুণাবলী সমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

(i) ভেষজ পরীক্ষককে সুস্থ, সবল ও স্বাভাবিক হতে হবে।
(ii) সম্পূর্ণ বিশ্বস্থ ও বিবেকবান হতে হবে।
(iii) সর্বদা আত্ম-পর্যবেক্ষণে তিনি নিমগ্ন থাকবেন।
(iv) পরীক্ষা চলাকালীন তাঁকে মানসিক ও শারীরিক অতিরিক্ত পরিশ্রম, সর্বপ্রকার অমিতাচার ও বিরক্তিকর উত্তেজনাসমূহ বর্জন করতে হবে।

(v) চিত্র চাঞ্চল্যকর কোন জরুরী কাজে তাঁর কোন আকর্ষণ থাকবে না।
(vi) তাঁর শরীর যে ভাবে সুস্থ থাকে সে ভাবে তিনি থাকবেন।
(vii) অনুভূতিসমূহ যথার্থভাবে ব্যক্ত ও বর্ণনা করার মত যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা তাঁর থাকতে হবে।
(viii) পরীক্ষককে সুশিক্ষিত হতে হবে এবং হোমিওপ্যাথির প্রতি দরদী, বিশ্বাস ও ভক্তি থাকতে হবে।

উপরিউক্ত ঔষধ পরীক্ষাকারীর গুণাবলীসমূহের মধ্যে একটি গুণও ইতর প্রাণীর মধ্যে বিদ্যমান নাই, তাই হোমিওপ্যাথিতে ইতর প্রাণীর উপর ঔষধ পরীক্ষা করা হয় না।

৫। প্রশ্ন ঃ ভেষজ পরীক্ষা কি? সুস্থ মানবদেহে হ্যানিম্যানের ভেষজ পরীক্ষার উদ্দেশ্য কি? ১০

ভেষজ পরীক্ষা (Drug proving) ঃ

ভেষজকে আরোগ্যদায়িনী শক্তিরূপে ব্যবহার করতে হলে তার রোগাৎপাদিকা শক্তির পূর্ণ পরিচয় জানা আবশ্যক। ভেষজের অন্তর্নিহিত শক্তির সম্বন্ধে সম্যক পরিচয় বা জ্ঞান লাভ করার উদ্দেশ্য ভেষজ পরীক্ষার গুণাবলী সম্বলিত সুস্থ মানবদেহে ভেষজের বিধিসম্মত পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণকে ভেষজ পরীক্ষা বা ড্রাগ প্রুভিং বলে।

সুস্থ মানবদেহে হ্যানিম্যানের ভেষজ পরীক্ষার উদ্দেশ্য ঃ

ঔষধের উপরই মানুষের জীবন-মৃত্যু, সুস্থতা-অসুস্থতা নির্ভর করে। কাজেই বিশদভাবে ও অত্যন্ত সতর্কতার সহিত এদের পরস্পরের পার্থক্য নিরূপন করা কর্তব্য। এই উদ্দেশ্যে সুস্থ মানবদেহের উপর ঔষধের সযত্ন ও যথার্থ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এদের শক্তি ও প্রকৃত কার্যকারীতা সম্বন্ধে আমরা যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারি। একমাত্র নির্ভূল ঔষধ প্রয়োগের দ্বারাই পার্থিব শ্রেষ্ঠতম সম্পদ শারীরিক-মানসিক সুস্থ্যতা দ্রুত, স্থায়ীভাবে পুনরায় ফিরিয়ে আনা যেতে পারে।

সুতরাং উপরিউক্ত কারণে ডাঃ হ্যানিম্যানের সুস্থ মানবদেহে ভেষজ পরীক্ষার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

৬। প্রশ্ন ঃ স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের উপর ঔষধ পরীক্ষার প্রয়োজন হয় কেন? ১১, ১৩

স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের উপর ঔষধ পরীক্ষার প্রয়োজন ঃ

ডাঃ ক্রিশ্চিয়ান ফ্রেড্রিক স্যামুয়েল হ্যানিম্যান "অর্গানন অব মেডিসিন" গ্রন্থের ১২৭ নং অনুচ্ছেদে ব্যাপক আলোচনা করেছেন।

জননেন্দ্রিয় ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যের যে যে পরিবর্তন আনয়ন করে তা প্রকাশ করার জন্য স্ত্রীলোকগণের এবং পুরুষগণের উপর ঔষধসমূহের পরীক্ষা অবশ্য প্রয়োজন।

কেবল পুরুষগণের উপর ঔষধসমূহের পরীক্ষা করলে পুংজননেন্দ্রিয়ের ঔষধজ পরিবর্তন সকল উপলব্ধ হতে পারে কিন্তু স্ত্রীলোকদের জরায়ু, ডিম্বাশয় প্রভৃতির উপর তাদের ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না। স্ত্রীলোকের ঋতুকালীন লক্ষণগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয়, তাদের গর্ভাবস্থায় লক্ষণগুলি অনেক বিশেষত্বপূর্ণ। তাই কোন ঔষধ পরীক্ষাকালীন স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের জননেন্দ্রিয়ের উপর কিরূপ পরিবর্তন ঘটে তা জানার জন্য স্ত্রী পুরুষের উপর পৃথকভাবে ভেষজ বা ঔষধ পরীক্ষা করতে হবে। কারণ পরীক্ষাকালে দেখা গেছে যে কোন কোন ঔষধ স্ত্রী জননতন্ত্রে অধিক ক্রিয়া প্রকাশ করেছে। যেমন- পালসেটিলা, সিপিয়া ইত্যাদি। আবার কোন কোন ভেষজ পুরুষ জননতন্ত্রে অধিক ক্রিয়া প্রকাশ করেছে। যেমন- এসিড ফস, এগনাস কাষ্টাস ইত্যাদি।

সুতরাং স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের উপর ঔষধ পরীক্ষার একান্ত আবশ্যক ও চিকিৎসাক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী।

৭। প্রশ্ন ঃ সুস্থ মানবদেহে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ পরীক্ষা করতে হয় কেন? ১৪, ১৬
বা, সুস্থ মানবদেহে ঔষধ পরীক্ষার সুবিধা কি? ১৩, ১৫
বা, সুস্থ মানবদেহে ভেষজ পরীক্ষণের উদ্দেশ্য কি? বর্ণনা কর। ০৯, ১১
বা, সুস্থ মানবদেহে হ্যানিম্যানের ভেষজ পরীক্ষার উদ্দেশ্য কি? ১০

সুস্থ মানব দেহে ভেষজ পরীক্ষণের উদ্দেশ্য ঃ

ডাঃ ক্রিশ্চিয়ান ফ্রেড্রিক স্যামুয়েল হ্যানিম্যান কর্তৃক আবিষ্কৃত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি সদৃশ লক্ষণানুসারে চিকিৎসা কার্য পরিচালিত হয়। বিশ্বজনীন আরোগ্য নীতি 'সদৃশ সদৃশকে প্রতিহত করে' এ উপর চিকিৎসা কার্য পরিচালিত হয়। সুতরাং সুস্থ মানব দেহে ভেষজ পরীক্ষণের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। তা নিম্নরূপ ঃ কোন ঔষধের অন্তর্নিহিত শক্তির সামগ্রিক পরিচয় শুধু মাত্র সুস্থ মানবদেহে সে ভেষজের দ্বারাই পাওয়া সম্ভব। কেননা শুধু মাত্র সুস্থ মানুষই সঠিকভাবে বলতে পারে ঔষধ প্রয়োগ ফলে তাঁর দেহ ও মনে কি ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ইতর প্রাণীর পক্ষে তা জানা ও বলা সম্ভব নয়। মানবদেহে ফিজিওলজিক্যাল অবস্থা আর ইতর প্রাণীর ফিজিওলজিক্যাল অবস্থা এক নয়, ফলে ঔষধের ক্রিয়া মানুষ ও ইতর প্রাণীতে অনেক সময় বিভিন্ন হয়। তাছাড়া রুগ্ন মানুষের উপর পরীক্ষা করে ঔষধের প্রাকৃতিক গুণাগুণ জানা সম্ভব হয় না। কেননা ঔষধ প্রয়োগের ফলে স্বাস্থ্যের যে পরিবর্তন আশা করা যায় তা রোগ লক্ষণের সাথে মিলে যায়। ফলে ঔষধ দ্বারা স্বাস্থ্যের বিচ্যুতি পরিষ্কারভাবে জানা সম্ভব হয় না । তাই সুস্থ মানুষের উপর পরীক্ষা ছাড়া, অন্য কোন উপায় নাই যা দ্বারা ঔষধের গুণাগুণের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যেতে পারে।

অতএব, ডাঃ হ্যানিম্যানের লিখিত গ্রন্থ অর্গানন অব মেডিসিনের নির্দেশ অনুসারে সুস্থ মানুষের উপর ঔষধ পরীক্ষা করার গুরুত্ব উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

নবম অধ্যায়
মেটারিয়া মেডিকা (Meteria Medica)
অনুচ্ছেদ – ১৪৩-১৪৫

১। প্রশ্ন ঃ মেটেরিয়া মেডিকার সংজ্ঞা দাও।

বা, প্রকৃত মেটেরিয়া মেডিকা সম্পর্কে সংক্ষেপ লিখ। ০৯

বা, মেটেরিয়া মেডিকা কি ? ১০

মেটেরিয়া মেডিকার সংজ্ঞা ঃ

মহাত্মা ডাঃ স্যামূয়েল হ্যানিম্যান কর্তৃক রচিত "অর্গানন অব মেডিসিন" গ্রন্থের ১৪৩ থেকে ১৪৫ নং অনুচ্ছেদে মেটেরিয়া মেডিকার সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

যে পুস্তক পাঠ করলে হোমিওপ্যাথিক বিভিন্ন ঔষধের প্রত্যেকটির সমনাম, ফর্মূলা, উৎস, প্রাপ্তিস্থান, ঔষধে ব্যবহৃত অংশ, পরীক্ষকের নাম, ঔষধের মায়াজমের প্রকৃতি, ক্রিয়াস্থল, ধাতুগত বৈশিষ্ট্য, কারণতত্ত্ব (মূল কারণ ও উত্তেজক/আনুসঙ্গিক কারণ), মানসিক লক্ষণ, নির্দেশক/পরিচায়ক লক্ষণাবলী, আঙ্গিক লক্ষণাবলী, হ্রাস-বৃদ্ধি, অনুপূরক, পরিপূরক, ক্রিয়ানাশক, শত্রুভাবাপন্ন ঔষধ, ক্রিয়াকাল, মাত্রা ও শক্তি ইত্যাদি সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে জ্ঞান অর্জন করা যায়, তাকে মেটেরিয়া মেডিকা বলে।

২। প্রশ্ন ঃ মেটেরিয়া মেডিকা পিউরা বলতে কি বুঝ ? ১০, ১২

মেটেরিয়া মেডিকা পিউরা ঃ

ডাঃ ক্রিশ্চিয়ান ফ্রেড্রিক স্যামুয়েল হ্যানিম্যান কর্তৃক রচিত মেটেরিয়া মেডিকাকে, মেটেরিয়া মেডিকা পিউরা বলা হয়। ডাঃ হ্যানিম্যান তাঁর নিজ দেহে ও সহযোগী দ্বারা পরীক্ষিত ঔষধসমূহের লক্ষণাবলী এতে লিপিবদ্ধ করেন। ইহা সর্বপ্রথম হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকা এবং ১৮১১ খ্রিষ্টাব্দে ছয় খন্ডে প্রকাশিত হয়।

৩। প্রশ্ন ঃ মেটেরিয়া মেডিকাকে হোমিওপ্যাথির মৌলিক গ্রন্থ বলা হয় কেন ?

মেটেরিয়া মেডিকাকে হোমিওপ্যাথির মৌলিক গ্রন্থ বলা হয় কারণ ঃ

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি হচ্ছে লক্ষণ ভিত্তিক চিকিৎসা, এখানে রোগীর দেহে প্রকাশিত লক্ষণ সমষ্টি নিয়ে মেটেরিয়া মেডিকায় বর্ণিত ঔষধসমূহ হতে ঐ লক্ষণ সমষ্টির অধিকতর সদৃশ একটি শক্তিকৃত ঔষধ সূক্ষ্মমাত্রায় প্রয়োগ করলে রোগী আরোগ্য লাভ করে। মেটেরিয়া মেডিকা হোমিওপ্যাথিক বিভিন্ন ঔষধের রোগ সৃষ্টিকারী ক্ষমতার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে। ঔষধের রোগ সৃষ্টিকারী ক্ষমতা জানার জন্য সুস্থ মানবদেহে স্বতন্ত্রভাবে ঔষধ পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় যে সকল অস্বাভাবিক লক্ষণাবলী প্রকাশিত হয় তা মেটেরিয়া মেডিকায় লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রত্যেকটি ভেষজ সুস্থ মানুষের দেহে পরীক্ষা করে যে সকল লক্ষণ পাওয়া যায়, প্রাকৃতিক রোগে উক্ত লক্ষণগুলি প্রকাশিত হলে লক্ষণ সাদৃশ্যে ঐ ঔষধটি প্রয়োগ করা হয়।

সুস্থ জীবনীশক্তি যদি রোগশক্তি দ্বারা আক্রান্ত হয় তা হলে জীবনীশক্তির বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং বিভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ করে, আবার সদৃশ বিধান মতে সুস্থ দেহে যদি ঔষধ প্রয়োগ করা হয় তা হলে ঔষধের রোগাৎপাদিকা শক্তি সজীব সত্ত্বার সংস্পর্শে এসে প্রাকৃতিক রোগের অনুরূপ অথচ প্রবলতর এক কৃত্রিম রোগ সৃষ্টি করে। যেহেতু সদৃশ বিধান মতে প্রয়োগকৃত ঔষধে শক্তিশালী তাই ঔষধ দ্বারা সৃষ্ট লক্ষণারাজিও প্রাকৃতিক রোগ লক্ষণ অপেক্ষা প্রবলতর হবে। অতএব ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় যে প্রবলতর সদৃশ রোগ লক্ষণের দুর্বলতর লক্ষণগুলি বিলীন হয়ে যায়। ঔষধের ক্রিয়াকাল শেষ হলেই ঔষধজাত সমস্ত লক্ষণ তিরোহিত হয় এবং জীবনীশক্তি ইহার প্রভাব মুক্ত হয়ে সুস্থ হয়ে উঠে।

উপরিউক্ত কারণে মেটেরিয়া মেডিকাকে হোমিওপ্যাথির মৌলিক গ্রন্থ বলা হয়।

৪। প্রশ্ন : হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকা ও এলোপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকার পার্থক্য লিখ।

হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকা ও এলোপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকার পার্থক্য :

হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকা		এলোপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকার
হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকা ডাঃ হানিম্যান কর্তৃক সর্বপ্রথম লিখিত হয়।	১	এলোপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকার ডাঃ হানিম্যানের বহুকাল পূর্ব থেকে প্রচলিত ছিল।
ইহার আলোচ্য ঔষধগুলো সুস্থ মানবদেহে পরীক্ষিত।	২	ইহার আলোচ্য ঔষধগুলো সুস্থ মানবদেহে পরীক্ষিত নয়।
ইহা কোন ব্যক্তি বিশেষের অনুমান, মতামত বা কল্পনার উপর ভিত্তি করে লিখিত নয়।	৩	ইহা ব্যক্তি বিশেষের অনুমান, মতামত বা কল্পনার উপর ভিত্তি করে লিখিত হয়েছে।
ইহাতে ইতর প্রাণীর উপর পরীক্ষিত কোন ঔষধ অন্তর্ভুক্ত নয়।	৪	ইহাতে ইতর প্রাণীর উপর পরীক্ষিত ঔষধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
ইহাতে ঔষধের মানসিক লক্ষণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।	৫	ইহাতে ঔষধের মানসিক লক্ষণকে কোন গুরুত্ব দেয়া হয় নাই।
ইহাতে ঔষধসমূহকে নামাক্ষরের উপর ভিত্তি করে দলগতভাবে ভাগ করা হয়েছে।	৬	ইহাতে ঔষধসমূহকে রোগের নামের উপর ভিত্তি করে দলগতভাবে ভাগ করা হয়েছে।
ইহাতে রোগীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের উপর লক্ষ্য রেখে ঔষধ প্রয়োগের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।	৭	ইহাতে রোগের নামে ঔষধ প্রয়োগের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।
ইহাতে একবারে একটিমাত্র ঔষধ প্রয়োগের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।	৮	ইহাতে একবারে একাধিক ঔষধ মিশ্রিতভাবে প্রয়োগের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।
ইহাতে শক্তিকৃত ঔষধ সূক্ষ্মমাত্রার ব্যবহারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।	৯	ইহাতে ক্রুড ঔষধ স্থূলমাত্রার ব্যবহারের উপদেশ দেয়া হয়েছে।
ইহাতে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের উপর ঔষধ পরীক্ষা করা হয়েছে।	১০	ইহাতে শুধুমাত্র ইতর প্রাণীর উপর ঔষধ পরীক্ষা করা হয়েছে।

৫। প্রশ্ন ঃ কিভাবে বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকা তৈরি করবে ? ০৮

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকা তৈরি ঃ

মহাত্মা ডাঃ ক্রিশ্চিয়ান ফ্রেড্রিক স্যামুয়েল হ্যানিম্যান তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "অর্গানন অব মেডিসিন" এ ১৪৩-১৪৫নং অনুচ্ছেদে বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

সুস্থ মানবদেহে অবিমিশ্রিত ঔষধ পরীক্ষা উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করে এবং কৃত্রিম রোগ উৎপাদকরূপে উক্ত ঔষধ যে সকল রোগ লক্ষণাবলী সৃষ্টি করতে পারে, সে সব সযত্নে ও বিশ্বস্ততার সহিত লিপিবদ্ধ করে, বিশুদ্ধ মেটারিয়া মেডিকা তৈরি হয়। অমিশ্র ঔষধরাজীই হবে প্রকৃত, বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য কার্যবিবরণী নিয়ে গঠিত প্রাকৃতিক গ্রন্থের একটি অংশ বিশেষ। প্রত্যেকটি শক্তিশালী ঔষধের পরীক্ষালব্ধ বিশিষ্ট ও সন্দেহাতীত স্বাস্থ্য বিকৃতির এবং লক্ষণসমূহের বিস্তৃত তালিকা এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ থাকবে। সেসব ঔষধের দ্বারা আরোগ্য সাধ্য অনেকগুলি প্রাকৃতিক রোগের সদৃশ হোমিওপ্যাথিক চিত্র তন্মধ্যে পাওয়া যাবে। অর্থাৎ কৃত্রিম রোগের অবস্থানসমূহ, উহাদের সদৃশ প্রাকৃতিক রোগকে সুর্নিশ্চিত ও স্থায়ীভাবে নিরাময় করে সদৃশ বিধান মতে প্রকৃত আরোগ্যের উপায় প্রদান করবে।

মেটিরিয়া মেডিকা হতে অনুমান নির্ভর বা যা কেবল কথার কথা মাত্র বা কল্পনা প্রসূত তা সব কিছুই সর্বোতভাবে বর্জন করতে হবে। সযত্ন এবং অকপটে জিজ্ঞাসা করার পর স্বাভাবিক সহজ ভাষাতেই ইহার প্রত্যেকটি বিষয় লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৫। প্রশ্ন ঃ কেন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি এ্যালোপ্যাথির চেয়ে উৎকৃষ্টতর ? ১৪, ১৬

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি এ্যালোপ্যাথির চেয়ে উৎকৃষ্টতর কারণ ঃ

(i) হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি প্রাকৃতিক, বৈজ্ঞানিক, আদর্শ ও সদৃশ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

(ii) এ পদ্ধতিই সর্বপ্রথম চিকিৎসা বিজ্ঞানকে আন্দাজ-অনুমোদনের ক্ষতিকর ও অনির্ভরযোগ্য পথের পরিবর্তে নিয়মনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে।

(iii) একমাত্র এতেই জীবনীশক্তি, রোগশক্তি ও ঔষধ শক্তিরূপ সূক্ষ্মশক্তিকে স্বীকার করা হয়েছে। এ তত্ত্বের উপর নির্ভর করেই রোগীকে আরোগ্য করা হয়।

(iv) এ পদ্ধতি যথার্থ প্যাথলজি অর্থাৎ হোমিওপ্যাথি প্যাথলজি আবিষ্কারের বহুআগে দেখিয়েছে যে, প্রচলিত স্থূল অবস্থার চেয়ে রোগের প্রকৃত কারণ অনেক সূক্ষ্ম, যা কোন কোন ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত যন্ত্রে ধরা পড়ে না।

(v) একমাত্র এ পদ্ধতিতে সুস্থ মানুষের উপরে ঔষধ প্রুভিং করে এর নিশ্চিত ক্রিয়া আবিষ্কার হয়েছে। এ ঔষধ সহজবোধ্য পন্থায় রোগীর চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আজও পর্যন্ত এর কোন ঔষধের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে যথার্থ প্রয়োগের পর বিফলতা আসেনি।

৬। প্রশ্ন ঃ উদাহরণসহ মেটেরিয়া মেডিকার শ্রেণীবিন্যাস কর।

মেটেরিয়া মেডিকার শ্রেণীবিন্যাস ঃ

নিম্নে মেটেরিয়া মেডিকার শ্রেণীবিন্যাস দেয়া হল ঃ

(i) মৌলিক লক্ষণভিত্তিক মেটেরিয়া মেডিকা ঃ যেমন- ই. বি. ন্যাশ এর লিডার্স ইন হোমিওপ্যাথিক থেরাপিউটিক্স, ডাঃ এইচ. সি. এলেন এর কিনোটস।

(ii) অঙ্গ ভিত্তিক মেটেরিয়া মেডিকা ঃ যেমন- ডাঃ উইলিয়াম বোরিক এর মেটেরিয়া মেডিকা, ডাঃ ই. এফ. ফ্যারিংটন এর ক্লিনিক্যাল মেটেরিয়া মেডিকা।

(iii) ব্যাপকভিত্তিক মেটেরিয়া মেডিকা ঃ যেমন – ডাঃ জে.টি. কেন্ট এর লেকচার অন হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকা, ডাঃ জে.এইচ. ক্লার্ক এর এ ডিকসনারী অব প্র্যাকটিক্যাল মেটেরিয়া মেডিকা।

৭। প্রশ্ন ঃ ভেষজ ও ঔষধের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। ১৭

ভেষজ ও ঔষধের মধ্যে পার্থক্য ঃ

ভেষজ		ঔষধ
ভেষজ ঃ যে সকল পদার্থ সুস্থ শরীরে প্রয়োগ করলে শরীর অসুস্থ হয়, তাকে ভেষজ বলা হয়। অর্থাৎ যে সকল পদার্থের রোগ উৎপাদিকা ও ফার্মাকোপিয়া মতে শক্তিকৃত করার পর প্রয়োগে রোগনাশক উভয় শক্তিই বর্তমান থাকে, তাকে ভেষজ বলে। কাজেই ভেষজ হল ঔষধী গুণ সম্পন্ন বস্তু যা থেকে ঔষধ প্রস্তুত করা হয়।	১	ঔষধ ঃ বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে, ফার্মাকোপিয়ার নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া বা ফর্মূলা অনুযায়ী ভেষজ পদার্থ হতে প্রস্তুতকৃত পদার্থ যা চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুসারে রোগারোগ্য করতে সক্ষম, তাকে ঔষধ (Medicine) বলে।
ইহা ঔষধ প্রস্তুতের কাঁচামাল, পদার্থের মধ্যে ঔষধি গুণ থাকলেই, উহা ভেষজ।	২	ভেষজ হতে নির্দিষ্ট ফার্মাকোপিয়ার নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুয়াযী প্রস্তুত না হলে উহাকে ঔষধ বলা যায় না।
ভেষজ খাদ্য হিসাবে গ্রহন করলে সচরাচর কোন প্রতিক্রিয়া হয় না।	৩	ঔষধ মানবদেহে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।
ভেষজকে Q দ্বারা প্রকাশ করা হয়।	৪	ঔষধকে স্কেল অনুয়াযী চিহ্ন দ্বরা প্রকাশ করা হয়। যেমন ৩x, ৩০, M/2 ।
ভেষজ প্রয়োগে রোগের আরোগ্য হয় না, রোগের উপশম হয় মাত্র।	৫	ঔষধ প্রয়োগে রোগারোগ্য হয়।
ইহাকে স্থুল মাত্রায় প্রয়োগে রোগোৎপাদিকা শক্তি আছে।	৬	ইহার রোগোৎপাদিকা শক্তি ও রোগারোগ্য এবং রোগ প্রতিষেধক শক্তি আছে।

দশম অধ্যায়

লক্ষণ ও লক্ষণসমষ্টি

১। প্রশ্ন লক্ষণ কাকে বলে ? লক্ষণ কত প্রকার ও কি কি ?

লক্ষণ (Symptoms) ঃ

ইংরেজি Symptoms শব্দটি Symptoms নামক গ্রীক শব্দ হতে উৎপন্ন হয়েছে যা বাংলায় 'লক্ষণ'। লক্ষণ অর্থ হলো যা কিছু ঘটে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় সুস্থ অবস্থার পরিবর্তন হিসেবে দেহ ও মনে যা কিছু ঘটে তাই 'লক্ষণ' অর্থাৎ লক্ষণ হলো স্বাস্থ্যের স্বাভাবিক অবস্থার বিকৃত পরিবর্তন যা রোগের পরিচয় বহন করে।

লক্ষণ এমন একটি অবস্থা যা রোগী নিজে, তার পরিবারের লোকজন, সেবাকারী এবং চিকিৎসক স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেন। লক্ষণ শুধুমাত্র রুগ্নাবস্থায় বহিঃপ্রকাশ বা রোগের নিদর্শনই নয় প্রতিকারক সদৃশ ঔষধ নির্বাচনের ও অপরিসীম ভূমিকা রাখে। যেমনঃ আত্মহত্যার ইচ্ছা, গোসলে অনিচ্ছা, প্রবল পিপাসা, মাথা ব্যথা, জয়েন্টে ব্যথা, হাত পায়ে জ্বালা ইত্যাদি।

লক্ষণের প্রকারভেদ ঃ

লক্ষণের বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে লক্ষণসমূহকে দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়। যথা ঃ-

(i) ব্যক্তিনিষ্ঠ (Subjective Symptoms) লক্ষণ।

(ii) বস্তুনিষ্ঠ (Objective Symptoms) লক্ষণ।

ব্যক্তিনিষ্ঠ লক্ষণকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা ঃ

(ক) মানসিক লক্ষণ (খ) নির্দেশক লক্ষণ (গ) ধাতুগত লক্ষণ।

বস্তুনিষ্ঠ লক্ষণকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা ঃ-

(ক) চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণ (খ) ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা নিরীক্ষা।

২। প্রশ্ন ঃ ব্যক্তিনিষ্ঠ ও বস্তুনিষ্ঠ লক্ষণ কাকে বলে ? বুঝিয়ে দাও।

ব্যক্তিনিষ্ঠ লক্ষণ (Subjective Symptoms) ঃ

যে সকল লক্ষণ কেবলমাত্র রোগী নিজে অনুভব করে এবং বুঝতে পারে রোগী না বললে চিকিৎসক জানতে পারে না, সে লক্ষণসমূহকে ব্যক্তিনিষ্ঠ লক্ষণ (Subjective Symptoms) বলে। যেমন বুকে প্রচণ্ড চাপবোধ, ক্ষুদ্র সন্ধিতে ব্যথা, মাথা ব্যথা, পেটে ব্যথা, অরুচি, প্রস্রাবে জ্বালা, পোড়া ইত্যাদি। রোগীর নিজস্ব অভিব্যক্তিই হলো ব্যক্তিনিষ্ঠ লক্ষণ।

বস্তুনিষ্ঠ লক্ষণ (Subjective Symptoms) ঃ

যে সকল লক্ষণ রোগী না বললেও রোগীর আত্মীয়-স্বজন দেখে বুঝতে পারে চিকিৎসক তার পঞ্চ ইন্দ্রিয় জ্ঞান ও যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জানতে পারে, সে লক্ষণসমূহকে বস্তুনিষ্ঠ লক্ষণ (Objective Symptoms) বলে। যেমনঃ- ঘর্মস্রাব, শ্বাসকষ্ট, অস্থিরতা ইত্যাদি। Or

ঔষধ প্রুভিং এর সময় বিভিন্ন প্রুভারের কিংবা রুগ্ন অবস্থায় রোগীর শরীরে ও মনে বাহ্যিকভাবে কতকগুলো শারীরিক ও মানসিক লক্ষণ ও চিহ্ন প্রকাশ পায়, তা তাদের পরিচর্যাকারী বা আপনজন ও পর্যবেক্ষণকারী, প্রুভার প্রভার বা চিকিৎসক নিজে খালি চোখে দেখে এবং অন্যান্য অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্টের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করে জানতে পারেন। ঐ লক্ষণ বা চিহ্নগুলোকে বস্তুনিষ্ঠ লক্ষণ বলে। যেমন- শ্বাসকষ্ট, অস্থিরতা, প্রলাপ ইত্যাদি।

৩। প্রশ্ন ঃ বস্তুনিষ্ঠ লক্ষণ কি ? মানসিক লক্ষণ এত প্রয়োজনীয় কেন ? ১২, ১৪

বা, বস্তুনিষ্ঠ লক্ষণ কাকে বলে ? ১০

বস্তুনিষ্ঠ লক্ষণ (Subjective Symptoms) ঃ

যে সকল লক্ষণ রোগী না বললেও রোগীর আত্মীয়-স্বজন দেখে বুঝতে পারে চিকিৎসক তার পঞ্চ ইন্দ্রিয় জ্ঞান ও যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জানতে পারে, সে লক্ষণসমূহকে বস্তুনিষ্ঠ লক্ষণ (Objective Symptoms) বলে। যেমনঃ- ঘর্মস্রাব, শ্বাসকষ্ট, অস্থিরতা ইত্যাদি।

মানসিক লক্ষণ প্রয়োজনীয়তা ঃ

যে সকল লক্ষণ দ্বারা রোগীর মনোবৃত্তি অর্থাৎ মানসিক অবস্থা এবং আচরণের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে, তাকে মানসিক লক্ষণ বলে। অর্থাৎ যে সকল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আচরণ রোগীর মনের ভাব, আবেগ, আকাংখা ও ভালবাসা প্রভৃতি প্রকাশ করে, সে সকল লক্ষণসমূহকে, মানসিক লক্ষণ বলে। রোগীর মানসিক লক্ষণই বেশির ভাগ সদৃশ ঔষধ নির্বাচনের প্রধান অবলম্বন হিসাবে পরিগণিত হয়। কারণ খুব নিশ্চিতভাবে নির্দেশক লক্ষণ বলেই তা কোন যথার্থ অনুসন্ধানী চিকিৎসকের দৃষ্টি এড়াতে পারে না।

অতএব প্রত্যেকটি রোগীর ক্ষেত্রে, অন্যান্য লক্ষণের সাথে রোগীর মানসিক ও প্রকৃতিগত পরিবর্তন লক্ষ্য না করে এবং রোগীর যন্ত্রণা দূর করার জন্য অন্যান্য সদৃশ লক্ষণের সহিত রোগীর স্বভাব ও মানসিক অবস্থার সদৃশ রোগ সৃষ্টিকারী শক্তি ঔষধরাজী হতে নির্বাচন না করলে কখনও প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে অর্থাৎ সদৃশ বিধান মতে আরোগ্যসাধন করতে সমর্থ হবে না। তাই ডাঃ হ্যানিম্যান হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় রোগীর মানসিক লক্ষণের সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

৪। প্রশ্ন ঃ ব্যক্তিনিষ্ঠ ও বস্তুনিষ্ঠ লক্ষণের মধ্যে পার্থক্য লিখ। ১১, ১৪

ব্যক্তিনিষ্ঠ ও বস্তুনিষ্ঠ লক্ষণের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ ঃ

ব্যক্তিনিষ্ঠ লক্ষণ		বস্তুনিষ্ঠ লক্ষণ
রোগী স্বয়ং নিজে রোগ সম্বন্ধে যে কষ্টকর অবস্থার কথা বর্ণনা করেন, তাকে ব্যক্তিনিষ্ঠ লক্ষণ বলে।	১	রোগারোগ্য তথা সদৃশ ঔষধ নির্বাচনের জন্য চিকিৎসক রোগীকে পর্যবেক্ষণ করে যে লক্ষণ নির্ণয় করেন, তাকে বস্তুনিষ্ঠ লক্ষণ বলে।
ব্যক্তিনিষ্ঠ লক্ষণ তিন প্রকার। যথা মানসিক লক্ষণ, নির্দেশক লক্ষণ ও ধাতুগত লক্ষণ।	২	বস্তুনিষ্ঠ লক্ষণ দুই প্রকার। যথা চিকিৎকের পর্যবেক্ষণ ও ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা-নিরীক্ষা।
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে ইহার গুরুত সর্বাধিক।	৩	ব্যক্তিনিষ্ঠ লক্ষণের পরে ইহার অবস্থান।
ব্যক্তিনিষ্ঠ লক্ষণ শুধুমাত্র রোগী নিজে অনুভব করতে পারে। রোগী না বললে চিকিৎসক বুঝতে পরে না।	৪	বস্তুনিষ্ঠ লক্ষণ রোগী না বললেও চিকিৎসক পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বুঝতে পারেন।
উদাহরণ ঃ দীর্ঘদিনের তীক্ষ্ম সূঁচফোটাবৎ মাথা ব্যথা, পেট ব্যথা।		উদাহরণঃ লালবর্ণের ফোঁড়া, লাল বর্ণের উদ্ভেদ ইত্যাদি।

৫। প্রশ্ন ঃ প্রকৃত লক্ষণের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

লক্ষণের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Symptoms) ঃ

প্রত্যেকটা পূর্ণাংগ লক্ষণের ছয়টি বৈশিষ্ট আছে। যথাঃ

(i) কারণ (Causes) ঃ

প্রত্যেক লক্ষণ কিংবা রোগ সৃষ্টির পিছনে কতকগুলো কারণ থাকে। যেমন ঃ আকস্মিক দূর্ঘটনা ও আঘাতাদি, অমিতাচার, অনাহার, পার্থিব পরিবর্তন, অতিরিক্ত রাত্রি জাগরণ ইত্যাদি উত্তেজক ও পরিপোষক অবস্থা, অসদৃশ বিসদৃশ ঔষধ ও বিভিন্ন প্রকার অস্থায়ী মায়াজম এবং স্থায়ী মায়াজম অর্থাৎ সোরা, সিফিলিস ও সাইকোসিস লক্ষণের বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে ও ঔষধ নির্বাচনের জন্যে "কারণ" একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

(ii) অবস্থান (Locations) ঃ

হোমিওপ্যাথিক দৃষ্টিতে বিভিন্ন রোগশক্তি ও ঔষধের ক্রিয়া জীবনীশক্তি তথা সামগ্রিকভাবে শরীর ও মনের সমস্ত অংশের সাথে সম্বন্ধযুক্ত থাকে। এগুলোর প্রত্যেকের প্রধান ক্রিয়াক্ষেত্র বা অবস্থান থাকে। নির্দিষ্ট প্রধান অবস্থানে যেমন এগুলো প্রকাশ পায়, তেমনি সেখান থেকে তা শরীরের বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃতও হয়ে থাকে। যেমন ঃ- একোনাইট ন্যাপ এর ক্রিয়াক্ষেত্র মন, মস্তিষ্ক, স্নায়ু, হৃৎপিন্ড, শিরা, রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়া, অভ্যন্তরীণ তন্ত্রাদি ও বক্ষদেশ।

(iii) প্রকৃতি (Nature) ঃ

বিভিন্ন রোগী বা ঔষধের লক্ষণগুলো বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়া, অবস্থা, আকার বা গঠনের পরিবর্তন প্রকাশ করে থাকে এগুলোকে লক্ষণের প্রকৃতি বলে। ইহা লক্ষণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। যেমন- (ক) মুখমন্ডলে ঘর্ম – বেলেডোনা, ক্যাম্ফর, ক্যালকে কার্ব, কার্ব- ভেজ ইত্যাদি। (খ) শুষ্ককাশি - বেলেডোনা, ব্রায়োনিয়া।

(iv) অনুভূতি (Sensations) ঃ বিভিন্ন রোগীর বা ঔষধের বিভিন্ন ধরনের অনুভূতিমূলক লক্ষণ আছে, যা সেগুলোর বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট নির্দেশ করে। যেমন ঃ (ক) জ্বালাকর ব্যথা - আর্সেনিক, (খ) শীতলতা– ক্যাম্ফর ও ভিরেট্রাম, (গ) ক্ষততাবোধ– আর্নিকা, হ্যামামেলিস।

(v) হ্রাস - বৃদ্ধি (Modalities) ঃ

প্রত্যেক রোগী ও ঔষধের কোন লক্ষণ বা লক্ষণসমষ্টি কোন সময়ে ও কোন অবস্থায় হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরণের অবস্থা রোগারোগ্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রকাশ করে। ইহা দুই প্রকার। যথা-

ক) সর্বাঙ্গিন হ্রাস-বৃদ্ধি (Modalities in general) ঃ ইহা দ্বারা রোগীর ও ঔষধের ব্যক্তিভিত্তিক বা সত্ত্বাভিত্তিক সামগ্রিক হ্রাস-বৃদ্ধি বুঝায়। যেমন- ১) সকাল ১০টায় বৃদ্ধি - নেট্রাম-মিউর, ২) গরম দুধে উপশম - চেলিডোনিয়াম মেজাজ।

খ) আঙ্গিক হ্রাস-বৃদ্ধি (Modalities in particular) ঃ ইহার দ্বারা রোগীর ও ঔষধের কোন আঙ্গিক বা আংশিক অবস্থার হ্রাস বৃদ্ধি বুঝায়। যেমন ঃ ১) মোটর গাড়িতে চড়লে মাথার বেদনা উপশম – নাইট্রিক এসিড। ২) কাশি চিৎ হয়ে শুলে উপশম – একো ন্যাপ, লাইকোপডিয়াম। ৩) মাসিক ঋতুস্রাব কেবল রাতে বৃদ্ধি - বোভিষ্টা।

(vi) **আনুসঙ্গিক বা সহচর অবস্থা** (Concomitants) ঃ

কোন মূল লক্ষণের পূর্বে সময়ে ও পরে একই সাথে, একই সময়ে বা পর্যায়ক্রমে ও সহযোগীভাবে যেসব মানসিক ও শারীরিক লক্ষণ প্রকাশ পায়, উহাকে আনুষংগিক বা সহচর অবস্থা বলে ইহা কোন রোগী ঔষধের লক্ষণের প্রকৃতি উপলব্ধি করতে সহযোগিতা করে। যেমন ঃ- (i) রক্তস্রাবের পর প্রলাপ- চায়না, ল্যাকেসিস (ii) মাসিকের পূর্বে আক্ষেপ- বিউফো, কষ্টিকাম, কুপ্রাম মেটালিকাম ইত্যাদি।

৬। প্রশ্ন ঃ লক্ষণ সমষ্টি কাকে বলে ? বর্ণনা কর। ০৮, ১০

লক্ষণসমষ্টি (Totality of Symptoms) ঃ

লক্ষণ রোগীর নিজের বর্ণনার মাধ্যমে, তার আপনজনদের নিকট হতে এবং চিকিৎসক নিজে দর্শন, শ্রবণ ও স্পর্শন এবং প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা-নিরীক্ষা পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ করে জানতে পারেন। এ জন্যে রোগীর দৈহিক কাঠামো, মুখ ভংগিমা, বেশভূষা, বর্তমান কষ্টের কারণ, কষ্টকর অবস্থার অবস্থান, প্রকৃতি, হ্রাস-বৃদ্ধি ও আনুসঙ্গিক অবস্থা, অতীত কষ্ট, বংশগত ও পারিবারিক ইতিহাস, নৈতিক জীবন, দাম্পত্য জীব, বাসস্থান, মন মেজাজ, দৈহিক সর্বাঙ্গিন ও আঙ্গিক অবস্থা এবং দেহের নিঃসৃত স্রাবাদি সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে হয়। এরূপ অনুসন্ধানের মাধ্যমে রোগীর শরীর ও মনের ভিতরের অস্বাভাবিক পরিবর্তন যা স্বাস্থ্যাবস্থার বিচ্যুতি অর্থাৎ অস্বাভাবিক অনুভূতি। কাজকর্ম ও গঠনাকৃতি সম্পর্কে জানতে পারা যায়। এগুলোর প্রত্যেকটাকে এক একটা লক্ষণ বলে এবং এগুলোর সমষ্টিকে লক্ষণসমষ্টি (Totality of Symptoms) বলে।

অথবা,

রোগশক্তির গতিশীল প্রভাব যখন জীবনীশক্তির উপর পড়ে ঐ অবস্থায় যদি জীবনীশক্তির ভিতরে রোগ প্রবণতা থাকে তবে ঐ রোগশক্তির প্রভাবে জীবনীশক্তি অসুস্থ হয়ে পড়ে। ফলে ইতিপূর্বে জীবনীশক্তির মাধ্যমে শরীর ও মনের যে স্বাভাবিক অনুভূতি, কাজ কর্ম ও গঠনাকৃতি অব্যাহত ছিল, ইহার পরিবর্তে কতকগুলো অস্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক অবস্থা প্রকাশ পায়। এ প্রকাশিত লক্ষণাবলীর সমষ্টিকে লক্ষণ সমষ্টি (Totality of Symptoms) বলে।

৭। প্রশ্ন ঃ হোমিওপ্যাথিতে লক্ষণের গুরুত্ব বর্ণনা কর ?

হোমিওপ্যাথিতে লক্ষণের গুরুত্ব নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

(i) লক্ষণ রোগশক্তির বা রোগাক্রান্ত জীবনীশক্তির স্বরূপ প্রকাশ করে।

(ii) ইহা দ্বারা রোগকে চিনতে পারা যায়। এ জন্যে হোমিওপ্যাথিতে রোগীর লক্ষণের সমষ্টিকে রোগ বলে।

(iii) হোমিওপ্যাথিতে লক্ষণকে রোগের ভাষা বলা হয়। কারণ, এগুলো বিশ্লেষণ করে রোগী ও তার রোগের বৈশিষ্ট্য বোঝা যায়।

(iv) লক্ষণের দ্বারা রোগীর মুখ-ভঙ্গিমা, বেশ-ভূষা, মানসিক, দৈহিক, সর্বাঙ্গিন, আঙ্গিক অবস্থা ইত্যাদি জানা যায়।

(v) অসাধারণ, অদ্ভুত, একক, বিরল ও দৃষ্টি আকর্ষনীয় লক্ষণ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি, ইহা দ্বারা বিভিন্ন রোগী ও ঔষধের সত্তার ভিতরের পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। এবং এর সহায়তায় অমোঘ অর্থাৎ সুনির্বাচিত ঔষধ নির্বাচন করা যায়।

(vi) সাধারণ লক্ষণ রোগের নামকরণ, স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ ও প্রয়োজনীয় সতকর্তা অবলম্বন ও মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দিতে সাহায্য করে।

(vii) একইভাবে লক্ষণ ঔষধের ভাষা। ইহা দ্বারা রোগের অনুরূপ ঔষধের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকেও জানা যায়।

(viii) রোগীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণগুলো এর সদৃশ বৈশিষ্ট্যের আরোগ্যকারী ঔষধ প্রয়োগ করলে রোগীর লক্ষণগুলো দূর হয় এবং তার পূর্বস্বাস্থ্য স্থায়ীভাবে আসে।

(ix) চিকিৎসাকালে রোগীর লক্ষণগুলো পর্যবেক্ষণ করে ঔষধজনিত বৃদ্ধি, রোগের হ্রাস-বৃদ্ধি ও আরোগ্যের গতি-প্রকৃতি উপলব্ধি করে চিকিৎসক এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র নির্ধারণ করতে পারেন।

সুতরাং লক্ষণ হল রোগীর অসুস্থতা ও সুস্থতা নির্ধারণের একমাত্র পথপ্রদর্শক।

৮। প্রশ্ন ঃ লক্ষণ সমষ্টি ঔষধ নির্বাচনের একমাত্র পথ প্রদর্শক উক্তিটির যথার্থতা প্রমাণ কর। ১০
অথবা হোমিওপ্যাথিতে লক্ষণ সমষ্টির এত গুরুত্ব কেন ?
অথবা হোমিওপ্যাথিতে লক্ষণ সমষ্টির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা লিখ।০৮
অথবা লক্ষণ সমষ্টি ছাড়া আমরা রোগী চিকিৎসা করিতে পারি না কেন?
অথবা লক্ষণ সমষ্টি ঔষধের প্রতিচ্ছবি...ব্যাখ্যা কর।
অথবা "লক্ষণ রোগের ভাষা"- আলোচনা কর। ১৪, ১৬, ১৭
বা "লক্ষণসমষ্টি রোগের নির্দেশক" – ব্যাখ্যা কর।
বা, লক্ষণ সমষ্টি ছাড়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা অচল – আলোচনা কর। ০৯

ঔষধ নির্বাচনে লক্ষণ সমষ্টির গুরুত্ব ঃ

মহাত্মা ডাঃ হ্যানিম্যান তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "অর্গানন অব মেডিসিন" এ নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে ঔষধ নির্বাচনে লক্ষণ সমষ্টির গুরুত্ব আলোচনা করেছেন।

প্রত্যেক রোগে রোগীর মনে ও দেহের সুস্থ অবস্থা হতে যে যে পরিবর্তন হয়েছে যেগুলি বাহ্যিকভাবে ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা উপলব্ধি হয়, তা ব্যতীত আর কিছুই করেন না। অর্থাৎ সুস্থ অবস্থায় ব্যক্তিটি যে যে স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল, এখন রোগে সে সে অবস্থার যে যে অস্বাভাবিক পরিবর্তন রোগী নিজে অনুভব করে, তার পরিচর্যাকারী যা যা দেখেন এবং চিকিৎসক নিজে পর্যবেক্ষণ করে যা উপলব্ধি করেন। এ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য লক্ষণ সমষ্টিই সম্পূর্ণভাবে রোগ প্রকাশ করে। কেবল এ লক্ষণসমষ্টি দ্বারাই রোগের চিত্র অংকিত হয়। রোগোৎপাদিকা শক্তির অস্তিত্ব ও রোগোৎপাদনের সহায়তাজনক অন্যান্য ঘটনা সকল বিবেচনা করলে জানা যায়। উক্ত লক্ষণগুলি দ্বারাই রোগ ঔষধ প্রার্থণা করে এবং নিজ শান্তির উপযুক্ত ঔষধ দেখিয়ে দেয়। এ বাহ্যিক প্রতিমূর্তি দ্বারাই রোগীর প্রয়োজনীয় ঔষধ জানতে পারে। অর্থাৎ প্রত্যেক রোগের

অস্বাভাবিক লক্ষণ সমষ্টিই চিকিৎসক লক্ষ্য করেন এবং তা দূর করে রোগীকে আরোগ্য ও স্বাস্থ্য পরিবর্তিত করেন। রোগ লক্ষণ অপসারিত হলে সমস্ত রোগটিও অপসারিত হয়। সুতরাং লক্ষণসমষ্টিকে অপসারণই চিকিৎসকের একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। জীবনীশক্তির রুগ্ন অবস্থাকে অর্থাৎ সমগ্র রোগটিকেই আরোগ্য করতে হবে।

উপরিউক্ত বর্ণনার আলোকে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, লক্ষণ সমষ্টিই প্রত্যেক রোগের একমাত্র নিদর্শন ও ঔষধ নির্বাচনে একমাত্র সহায়তাকারী নিদের্শক। সুতরাং ঔষধ নির্বাচনে লক্ষণ সমষ্টির গুরুত্ব অপরিসীম ও সুদূরপ্রসারী। ইহা ব্যতীত ডাঃ হ্যানিম্যানের মতানুসারে আদর্শ আরোগ্য সম্ভবপর নয়।

৯। প্রশ্ন ঃ "হোমিওপ্যাথি একটি লাক্ষণিক চিকিৎসা"– ব্যাখ্যা কর। ১৫
বা, হোমিওপ্যাথিকে লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসা বলা হয় কেন ?

হোমিওপ্যাথি একটি লাক্ষণিক চিকিৎসা ঃ

ডাঃ হ্যানিম্যান তাঁর বিখ্যাত হোমিওপ্যাথির চিকিৎসা আইন "অর্গানন অব মেডিসিন" গ্রন্থে রোগ চিকিৎসা লক্ষণের গুরুত্বের বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করেছেন।

লক্ষণ রোগের ভাষা, লক্ষণের মাধ্যমে রোগ আত্মপ্রকাশ করে। লক্ষণসমষ্টি ভিন্ন রোগ নির্ণয়ের ও ঔষধ নির্বাচনের অন্য কোন উপায় নাই। রোগের নিদর্শন ইহার লক্ষণ সমষ্টি। জীবনীশক্তির বিশৃংখলাই রোগ, আর রোগগ্রস্থ অবস্থার বহিঃপ্রকাশ লক্ষণ সমষ্টি দ্বারাই সূচিত হয়। লক্ষণের মাধ্যমে আভ্যন্তরিক রোগের যথার্থ ও দৃষ্টিযোগ্য বহিঃপ্রকাশিত প্রতিচ্ছবি। লক্ষণসমষ্টি দ্বারাই জীবনীশক্তি বিশৃংখলা সৃষ্টিকারক বস্তু বা মাক্রোঅর্গানিজমের প্রতিকারক উপযুক্ত ঔষধটি নির্বাচন বা প্রত্যাশা করা যায়।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় প্রাকৃতিক নিয়মে আরোগ্য সাধিত হয়, অর্থাৎ সিমিলিয়া সিমিলিবাস কিউরেন্টার। সুতরাং হোমিওপ্যাথি একটি লাক্ষণিক চিকিৎসা যা অন্য প্যাথি হতে সম্পূর্ণ আলাদ।

১০। প্রশ্ন ঃ ব্যাপক লক্ষণ কি? রোগ নির্ণয়ে ইহার গুরুত্ব কি ? ১১

ব্যাপক লক্ষণ (General Symptoms) ঃ

যে লক্ষণগুলি রোগীর সম্পর্কে সামগ্রীকভাবে বা সর্বতোভাবে প্রযোজ্য এবং যে সকল লক্ষণের বর্ণনাকালে রোগী আমি শব্দটি উচ্চারণ করে বা আমি সত্ত্বাকে নির্দেশ করে সেগুলিকে সর্বাঙ্গিন বা ব্যাপক লক্ষণ বলে। রোগীর সম্পর্কে সামগ্রীকভাবে বা সর্বতোভাবে প্রযোজ্য এবং যে সকল লক্ষণ বর্ণনাকালে রোগী আমি শব্দটি উচ্চারণ লক্ষণ অর্থে ব্যবহার করেছেন। ডাঃ কেন্ট এ লক্ষণের গুরুত্বের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। ডাঃ গার্থ বোরিক এটাকে নির্ধারণ লক্ষণ এর শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত করেছেন। ব্যাপক লক্ষণকে মূল্যমানের গুরুত্বের ক্রম অনুসারে দু' ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

১। মানসিক ব্যাপক বা সর্বাঙ্গিন লক্ষণ (Mental General Symptoms) যেমন ঃ- ভালবাসা, ঘৃণা, ভাবাবেগ, ভয়, লোপ, প্রলাপ মানসিক বিভ্রান্তি, সময় জ্ঞানের অভাব ইত্যাদি।

২। দৈহিক ব্যাপক বা সর্বাঙ্গিন লক্ষণ (Physical General Symptoms) যেমন ঃ- খাদ্যদ্রব্যে ইচ্ছা ও অনিচ্ছা, ক্ষুধা ও পিপাসা, শীতে গরমে, বাতাসে, স্থানে, অমাবস্যায়, ডানে বামে উর্ধ্বাঙ্গে, যৌন বিষয়ে ইত্যাদি।

রোগ নির্ণয়ে ইহার গুরুত্ব ঃ

রোগী ব্যক্তি মানুষের পরিচয় তুলে ধরে বলে চিকিৎসাক্ষেত্রে ব্যাপক লক্ষণের গুরুত্ব সর্বাধিক। ইহার মাধ্যমে রোগীর মানসিক ও শারীরিক লক্ষণের বিকাশ ঘটে অর্থাৎ রোগীর প্রকৃত রোগচিত্র সংগ্রহে চিকিৎসককে সঠিক ও নির্ভুল ঔষধ নির্বাচনে সাহায্য করে। ব্যাপক লক্ষণের মধ্যে মানসিক লক্ষণসমূহের মূল্যই সর্বাধিক এবং কেবলমাত্র সুস্পষ্ট মানসিক লক্ষণ দ্বারাই রোগীর জন্য ঔষধ নির্বাচিত হয়।

সুতরাং ব্যাপক লক্ষণের গুরুত্ব সদৃশ বিধান মতে রোগী চিকিৎসায় ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী।

১১। প্রশ্ন ঃ লক্ষণ ও চিহ্নের মধ্যে পার্থক্যগুলি উল্লেখ কর। ০৮, ১০, ১১

লক্ষণ ও চিহ্নের মধ্যে পার্থক্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ

লক্ষণ		চিহ্ন
রোগী যখন চিকিৎসকের নিকট নিজের রোগ সম্পর্কে বর্ণনা দেন সেগুলোকে লক্ষণ বলে।	১	চিকিৎসক রোগীকে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা রোগ সম্পর্কে যা জানতে পারেন তাই চিহ্ন।
অনেক লক্ষণ শুধু রোগীই অনুভব করতে পারেন, অন্যরা অনুভব করতে পারে না। যেমন-মাথাব্যথা	২	চিহ্নসমূহ রোগী ও চিকিৎসক উভয়ই চিহ্নিত করতে পারেন। যেমন-রক্তবমি।
ইহা অদৃশ্যমান অবস্থায় থাকতে পারে।	৩	চিহ্ন দৃশ্যমান হয়ে থাকে।
ইহা ব্যক্তিনিষ্ঠ।	৪	ইহা বস্তুনিষ্ঠ।
লক্ষণ কখনও চিহ্ন হতে পারে। যেমন- রোগী বলল আমার কাশির সাথে রক্ত বাহির হয়। এখানে রক্ত কাশি একটা লক্ষণ।	৫	চিহ্ন, লক্ষণ হতে পারে না। রক্তকাশি এখানে চিহ্ন।
লক্ষণ সমষ্টি ছাড়া চিকিৎসা ক্ষেত্রে ঔষধ নির্বাচন অসম্ভব হয়।	৬	কোন কোন রোগে কোন চিহ্ন ছাড়াও ঔষধ নির্বাচন করে চিকিৎসা ব্যবস্থা চলতে পারে।

১২। প্রশ্ন : নৈদানিক লক্ষণ কি? রোগ চিকিৎসায় লক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কি? ১১, ১৩

নৈদানিক লক্ষণ :

দেহতন্ত্রের ক্রিয়াধারায় বিশৃঙ্খলা দরুণ দেহের কোন অঙ্গের গঠনগত পরিবর্তন বা অনুভূতির পরিবর্তন ইত্যাদি দেখা দেয়। এ পরিবর্তন গুলোকে নৈদানিক বা প্যাথলজিক্যাল লক্ষণ বলে। যেমন :- ফোঁড়া থেকে যেন সাদা পুঁজস্রাব, দড়ির মত লম্বা ও আঠার মত শ্লেষ্মা, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি।

রোগ চিকিৎসায় লক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নিম্নে উল্লেখ করা হল :

(i) লক্ষণ রোগশক্তির বা রোগাক্রান্ত জীবনীশক্তির স্বরূপ প্রকাশ করে।

(ii) ইহা দ্বারা রোগকে চিনতে পারা যায়। এ জন্যে হোমিওপ্যাথিতে রোগীর লক্ষণের সমষ্টিকে রোগ বলে।

(iii) হোমিওপ্যাথিতে লক্ষণকে রোগের ভাষা বলা হয়। কারণ, এগুলো বিশ্লেষণ করে রোগী ও তাঁর রোগের বৈশিষ্ট্য বুঝা যায়।

(iv) লক্ষণের দ্বারা রোগীর মুখ ভঙ্গিমা, বেশ-ভূষা, মানসিক, দৈহিক, সর্বাঙ্গিন, আঙ্গিক অবস্থা ইত্যাদি জানা যায়।

(v) অসাধারণ, অদ্ভুত, একক, বিরল ও দৃষ্টি আকর্ষনীয় লক্ষণ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি, ইহা দ্বারা বিভিন্ন রোগী ও ঔষধের সত্ত্বার ভিতরের পার্থক্য নির্ণয় করা যায় এবং এর সহায়তায় অমোঘ অর্থাৎ সুনির্বাচিত ঔষধ নির্বাচন করা যায়।

(vi) সাধারণতঃ লক্ষণ রোগের সাধারণ নামকরণ, রোগীর সেবাযত্ন, স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ ও প্রয়োজনীয় সতকর্তা অবলম্বন করতে এবং মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দিতে সাহায্য করে।

(vii) লক্ষণ ঔষধের ভাষা, ইহা দ্বারা রোগের অনুরূপ ঔষধের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকেও জানা যায়।

(viii) রোগীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণগুলো এর সদৃশ বৈশিষ্ট্যের আরোগ্যকারী ঔষধ প্রয়োগ করলে রোগীর লক্ষণগুলো দূর হয় এবং তার পূর্বস্বাস্থ্য স্থায়ীভাবে আসে।

(ix) চিকিৎসাকালে রোগীর লক্ষণগুলো পর্যবেক্ষণ করে ঔষধজনিত বৃদ্ধি রোগের হ্রাস বৃদ্ধি ও আরোগ্যের গতি-প্রকৃতি উপলব্ধি করে চিকিৎসক এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে দ্বিতীয় বা পরবর্তী ব্যবস্থাপত্র নির্ধারণ করতে পারেন।

সুতরাং লক্ষণ হলো রোগীর অসুস্থতা ও সুস্থতা নির্ধারণের একমাত্র পথ প্রদর্শক।

১৩। প্রশ্ন ঃ লক্ষণ সমষ্টি নির্বাচনের জন্য একজন চিকিৎসককে কে কিভাবে সাহায্য করে ? ১৫

লক্ষণ সমষ্টি নির্বাচনের জন্য একজন চিকিৎসককে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ সাহায্য করে ঃ লক্ষণসমষ্টি নির্বাচনের জন্য একজন চিকিৎসকে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ সাহায্য করতে পারে। যথা ঃ- (i) রোগী স্বয়ং নিজে, (ii) রোগীর আত্মীয়-স্বজন, (ii) বন্ধু-বান্ধব, (iv) সেবাকারীগণ। প্রথমে রোগী নিজে তার রোগের ইতিহাস বর্ণনা করবে। তারপর রোগীর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও সেবাকারীরা রোগীর কষ্টকর অবস্থা, আচার-আচরণ ও ব্যবহার সম্পর্কে বর্ণনা প্রদান করে চিকিৎসককে রোগ চিত্র প্রণয়নে সাহায্য করবেন। সর্বশেষে চিকিৎসক নিজে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করে রোগ চিত্র প্রণয়ন সমাপ্ত করবেন।

১৪। প্রশ্ন ঃ ধাতুগত লক্ষণ কাকে বলে? ইহার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু আলোচনা কর। ১৭

বা, ধাতুগত লক্ষণ বলতে কি বুঝ ?

ধাতুগত লক্ষণ (Constitution) ঃ

আকৃতি ও প্রকৃতিগত কিছু বৈশিষ্ট্যতা নিয়ে প্রত্যকটি মানুষ এ পৃথিবীতে আসে। এ সকল বৈশিষ্ট্যাবলী তাঁর দৈহিক ও মানসিক গড়ন, দেহতন্ত্রের ক্রিয়া ধারা এবং পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী সার্বদৈহিক প্রতিক্রিয়ার ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে। জন্মসূত্রে প্রাপ্ত প্রত্যেকটি ব্যক্তি বিশেষের এ সকল বৈশিষ্ট্যাবলীকে ধাতুপ্রকৃতি বলে। অর্থাৎ ধাতু প্রকৃতি বলতে রোগীর দেহতন্ত্রে এমন এক অবস্থা বুঝায় যার উপর তার দৈহিক ও মানসিক গড়ন ও পারিপার্শ্বিক প্রভাবের প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি বহুলাংশে নির্ভর করে। যে সকল লক্ষণগুলি রোগীর বিশেষ ধাতুপ্রকৃতির পরিচয় বহন করে, সেগুলিকে ধাতুগত লক্ষণ বলে। চিররোগের ক্ষেত্রে এই ধরনের লক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম।

১৫। প্রশ্ন ঃ প্যাথজেনেটিক লক্ষণ বলতে কি বুঝ ? ১২

প্যাথজেনেটিক লক্ষণের সংজ্ঞা ঃ

সুস্থদেহে ঔষধ পরীক্ষা করে অথবা ঔষধের বিষক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে যে লক্ষণ প্রাপ্ত হয়, তাকে প্যাথজেনেটিক লক্ষণ বলা হয়। বিভিন্ন মাইক্রোঅর্গানিজম দ্বারা দেহে যে রোগ লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তাকেও প্যাথজেনেটিক লক্ষণ বলে অবিহিত করা হয়। প্যাথোজেন অর্থাৎ রোগবীজ দ্বারা মানবদেহে যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তা রোগ উৎপন্ন করে। প্যাথলজির বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যমে প্যাথোজেন ঘঠিত রোগ নির্ণয় করে মেটেরিয়া মেডিকার ঔষধ সমূহ হতে সমলক্ষণ বিশিষ্ট ঔষধ সদৃশ ও সূক্ষ্মমাত্রায় প্রয়োগ করলে রোগী সহজেই আরোগ্য হয়।

১৬। প্রশ্ন ঃ মানসিক লক্ষণের গুরুত্ব লিখ। ১২
বা, হোমিওপ্যাথিতে মানসিক লক্ষণের গুরুত্ব লিখ। ১৫

মানসিক লক্ষণের গুরুত্ব ঃ

মহাত্মা ডাঃ হ্যানিম্যান "অর্গানন অব মেডিসিন" গ্রন্থের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় মানসিক লক্ষণের সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে ইহা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

যে সকল লক্ষণ দ্বারা রোগীর মনোবৃত্তি অর্থাৎ মানসিক অবস্থা এবং আচরণের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে, তাকে মানসিক লক্ষণ বলে। অর্থাৎ যে সকল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আচরণ রোগীর মনের ভাব, আবেগ, আকাংখা ও ভালবাসা প্রভৃতি প্রকাশ করে, সে সকল লক্ষণসমূহকে, মানসিক লক্ষণ বলে। রোগীর মানসিক লক্ষণই বেশির ভাগ সদৃশ ঔষধ নির্বাচনের প্রধান অবলম্বন হিসাবে পরিগণিত হয়। কারণ খুব নিশ্চিতভাবে নির্দেশক লক্ষণ বলেই তা কোন যথার্থ অনুসন্ধানী চিকিৎসকের দৃষ্টি এড়াতে পারে না। সর্বপ্রকার রোগের প্রধান বৈচিত্র স্বরূপ এ প্রকৃতিগত এবং মানসিক বিকৃতি সম্বন্ধে রোগ আরোগ্যকারী বস্তুসমূহের স্রষ্টাও বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন কারণ পৃথিবীতে এমন কোন ঔষধ নেই যা পরীক্ষাকারী সুস্থ ব্যক্তির প্রকৃতিতে ও মানসিক অবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন করতে অপারগ। প্রত্যেকটি ঔষধই বিভিন্নভাবে ইহা করে থাকে।

অতএব প্রত্যেকটি রোগীর ক্ষেত্রে, অন্যান্য লক্ষণের সঙ্গে রোগীর মানসিক ও প্রকৃতিগত পরিবর্তন লক্ষ্য না করে এবং রোগীর যন্ত্রণা দূর করার জন্য অন্যান্য সদৃশ লক্ষণের সহিত রোগীর স্বভাব ও মানসিক অবস্থার সদৃশ রোগ সৃষ্টিকারী শক্তি ঔষধরাজী হতে নির্বাচন না করলে কখনও প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে অর্থাৎ সদৃশ বিধান মতে আরোগ্যসাধন করতে সমর্থ হবে না। ডাঃ হ্যানিম্যান হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় রোগীর মানসিক লক্ষণের সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

১৭। প্রশ্ন ঃ পরিচায়ক বা চরিত্রগত/নির্দেশক লক্ষণ বলতে কি বুঝায় ?
বা, চারিত্রিক উপসর্গ কি ? ১৪

পরিচায়ক লক্ষণ বা চরিত্রগত বা নির্দেশক লক্ষণ এর সংজ্ঞা ঃ

যে সব লক্ষণসমূহ রোগের ও রোগীর বৈশিষ্ট্যতাগুলিকে অন্য রোগ ও রোগী হতে আলাদা করে তোলে এবং চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের নিকট সেই ধরনের লক্ষণসমূহেরই প্রয়োজন যেগুলি রোগের এক পূর্ণ প্রতিকৃতি অংকিত হয়, তাদেরকে পরিচায়ক লক্ষণ বা চরিত্রগত বা নির্দেশক লক্ষণ বলে। রোগীকে ব্যক্তিগত পরীক্ষার দ্বারা যে সমস্ত লক্ষণ সংগ্রহ করা যায় তন্মধ্যে যেগুলি অদ্ভুত, অসাধারণ, দৃষ্টি আকর্ষক, পার্থক্যসূচক বা বিরল প্রকৃতির সেই লক্ষণসমূহই এই শ্রেণিভূক্ত। ডাঃ কেন্ট বলেন- রোগের যে সমস্ত লক্ষণ সাধারণ বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা করা যায় না সেগুলি সমস্তই পরিচায়ক লক্ষণ বা চরিত্রগত বা নির্দেশক লক্ষণ। যেমন- প্রচন্ড তাপমাত্রাযুক্ত জ্বরে পিপাসাহীনতা, জিহ্বার শুষ্কতা সত্বেও পানি পানের অনিচ্ছা, দেহে তীব্র জ্বালাবোধ থাকা সত্বেও গায়ে আবরণ চায়, ইত্যাদি। চিকিৎসা ক্ষেত্রে এই ধরনের লক্ষণের গুরুত্ব সর্বাধিক।

১৮। প্রশ্ন ঃ বিরল লক্ষণের গুরুত্ব আলোচনা কর। ১০, ১২, ১৪, ১৬
বা, বিরল লক্ষণের গুরুত্ব লিখ। ০৮, ১৭

বিরল লক্ষণের গুরুত্ব আলোচনা ঃ মহাত্মা বিজ্ঞানী ডাঃ হ্যানিম্যান "অর্গানন অব মেডিসিন" গ্রন্থের ১৪৭নং অনুচ্ছেদের ঔষধ নির্বাচনে লক্ষণের গুরুত্ব/প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

ডাঃ হ্যানিম্যানের মতে, যে লক্ষণগুলি অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে যায় এবং যা অন্য সাধারণ লক্ষণ হতে একটু ভিন্ন বা বিশেষ ধরনের বা রোগের ও ঔষধের বিশেষ পরিচয় বহন করে, তাকে বিরল লক্ষণ বলে। যেমন- গলা ব্যথার রোগী সাধারণতঃ তরল খাবারে উপশম বা আরাম বোধ করে কিন্তু ইগ্নেশিয়ার রোগী গলা ব্যথায় শক্ত খাবারে উপশম বা আরাম বোধ করে। ইহা একটি বিরল লক্ষণ যার দ্বারা রোগীর ঔষধ সহজেই নির্বাচন করা যায়। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় বিরল লক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম যা দ্বারা রোগীকে আর্দশ আরোগ্য করা যায়।

১৯। প্রশ্ন ঃ কোন লক্ষণগুলি ঔষধ নির্বাচনের জন্য বেশী প্রয়োজন হয়? বা ঔষধ নির্বাচনে কি ধরনের লক্ষণের গুরুত্ব অধিক ?

ঔষধ নির্বাচনে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি বেশী প্রয়োজন ঃ

মহাত্মা বিজ্ঞানী ডাঃ হ্যানিম্যান "অর্গানন অব মেডিসিন" গ্রন্থের ১৫৩ ও ১৫৪ নং অনুচ্ছেদের ঔষধ নির্বাচনে লক্ষণের গুরুত্ব/প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

তাঁর মতে, সদৃশ বিধান সম্মত ঔষধের এ অনুসন্ধানে অর্থাৎ প্রকৃতিক লক্ষণ সমষ্টির সহিত পরিচিত ঔষধসমূহের লক্ষণগুলির তালিকার তুলনা দ্বারা যে রোগ আরোগ্য করতে হবে তার সদৃশ একটি কৃত্রিম রোগোৎপাদিকা শক্তি বাহির করার জন্য রোগের অপেক্ষাকৃত বিস্ময়কর, সুস্পষ্ট দৃষ্টি আকর্ষক, একক, অসাধারণ, অদ্ভুত, বিশেষ পরিচায়ক বিরল লক্ষণের মূল্যই সর্বাধিক।

চিকিৎসাশাস্ত্রানুসারে, যে সকল লক্ষণের কোন ব্যাখ্যা করা যায় না, চিকিৎসকের কাছে অদ্ভুত মনে হয়, বিস্ময়ের সৃষ্টি করে তারাই আসাধারণ লক্ষণ, আর এ জাতীয় লক্ষণই ঔষধ নির্বাচনে সবচেয়ে বেশী মূল্যবান। কোন রোগের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ঔষধ বলে স্থিরকৃত ঔষধের লক্ষণসমূহ হতে, রোগের অনুরূপ যে চিত্র প্রস্তুত হয়, তার মধ্যে যদি ঐ রোগের বিশেষ, আসাধারণ অদ্ভুত ও পরিচায়ক লক্ষণগুলি অধিকতর সংখ্যায় এবং অধিকতর সাদৃশ্যসহ বর্তমান থাকে, তবেই সে ঔষধ যে রোগের মহৌষধ।

অতএব, উপরিউক্ত আলোচনা হতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, সুস্পষ্ট দৃষ্টি আকর্ষক, অসাধারণ, অদ্ভুত, বিরল প্রকৃতির পরিচায়ক লক্ষণের প্রয়োজনীয়তা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে সুদূরপ্রসারী। সুতরাং ইহার গুরুত্ব অপরিসীম।

২০। প্রশ্ন ঃ অদ্ভুত লক্ষণ কাকে বলে ? "অদ্ভুত লক্ষণের উপর ভিত্তি করে ঔষধ নির্বাচন করলে সাফল্য অনিবার্য "– ব্যাখ্যা কর। ০৯, ১০
বা, অদ্ভুত লক্ষণ কি? ইহার উপর ভিত্তি করে ঔষধ নির্বাচন সহজ কেন?
বা, দুর্লভ উপসর্গগুলি কি? রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে ইহার কতটুকু মূল্য? ১৫

অদ্ভুত লক্ষণ (Peculiar symptom) ঃ যে সব অদ্ভুত অবস্থা রোগী ও ঔষধের বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে, উহাকে অদ্ভুত লক্ষণ (Peculiar symptom) বলে যেমন- বুক ধড়ফড়ানি, তাড়াতাড়ি হাঁটলে উপশম-আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম ও সিপিয়া ইত্যাদি।

"অদ্ভুত লক্ষণের উপর ভিত্তি করে ঔষধ নির্বাচন করলে সাফল্য অনিবার্য "– ব্যাখ্যা ঃ

ডাঃ হানিম্যান 'অর্গানন অব মেডিসিন' গ্রন্থের ১৫৩-১৫৪ নং অনুচ্ছেদে উক্ত লক্ষণ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।

যে ঔষধে সংখ্যায়-সাদৃশ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি বিশেষ, অসাধারণ, একক এবং পরিচায়ক লক্ষণগুলোর বর্তমান থাকে, সর্বাপেক্ষা উপযোগী ঔষধের লক্ষণসমূহের তালিকা হতে যে প্রতিচ্ছবি প্রস্তুত করা হয়, যদি তা যে রোগারোগ্য করতে হবে তার সাথে মিলে যায় তাহলে ইহাই হবে এই রুগ্নাবস্থার সর্বাপেক্ষা উপযোগী আরোগ্যদায়ক ঔষধ। রোগটি বেশিদিনের পুরাতন না হলে বিশেষ কোন গোলযোগ ছাড়াই প্রথম মাত্রাতে তা দূরীভূত ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। মানবস্বাস্থ্য পরিবর্তন করার শক্তি সম্বন্ধে যে সকল ঔষধ অনুসন্ধান করা হয়েছে তাদের মধ্যে যে ঔষধটির লক্ষণাবলী সহিত কোন প্রাকৃতিক রোগের লক্ষণসমষ্টির সর্বাধিক সাদৃশ্য হবে সে ঔষধটিই ঐ রোগের সর্বাপেক্ষা উপযোগী ও সুনির্শ্চিত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

অতএব, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অদ্ভুত লক্ষণের উপর ভিত্তি করে ঔষধ নির্বাচন করলে সাফল্য অনিবার্য এবং সহজেই রোগী আরোগ্যে হয়।

৭। প্রশ্ন ঃ কোন লক্ষণগুলি ঔষধ নির্বাচনের জন্য বেশী প্রয়োজন হয়?
বা, ঔষধ নির্বাচনে কোন লক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ? ১১, ১৩
বা, কোন লক্ষণগুলি ঔষধ নির্বাচনে অধিক মূল্যবান ? ০৮, ০৯

কোন লক্ষণগুলি ঔষধ নির্বাচনে অধিক মূল্যবান ঃ

যে সকল লক্ষণ দ্বারা রোগীর মনোবৃত্তি অর্থাৎ মানসিক অবস্থা এবং আচরণের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে, তাকে মানসিক লক্ষণ বলে। অর্থাৎ যে সকল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আচরণ রোগীর মনের ভাব, আবেগ, আকাংখা ও ভালবাসা প্রভৃতি প্রকাশ করে, সে সকল লক্ষণসমূহকে, মানসিক লক্ষণ বলে। রোগীর মানসিক লক্ষণই বেশির ভাগ সদৃশ ঔষধ নির্বাচনের প্রধান অবলম্বন হিসাবে পরিগণিত হয়। কারণ খুব নিশ্চিতভাবে নির্দেশক লক্ষণ বলেই তা কোন যথার্থ অনুসন্ধানী চিকিৎসকের দৃষ্টি এড়াতে পারে না। সর্বপ্রকার রোগের প্রধান বৈচিত্র স্বরূপ এ প্রকৃতিগত এবং মানসিক বিকৃতি সম্বন্ধে রোগ আরোগ্যকারী বস্তুসমূহের স্রষ্টাও বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন কারণ পৃথিবীতে এমন কোন ঔষধ নেই যা পরীক্ষাকারী সুস্থ ব্যক্তির প্রকৃতিতে ও মানসিক অবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন করতে অপারগ। প্রত্যেকটি ঔষধই বিভিন্নভাবে ইহা করে থাকে।

আবার যে ঔষধে লক্ষণ সাদৃশ্য সর্বাপেক্ষা বেশি বিশেষ, অসাধারণ, একক এবং পরিচায়ক লক্ষণগুলোর বর্তমান থাকে, সর্বাপেক্ষা উপযোগী ঔষধের লক্ষণসমূহের তালিকা হতে যে প্রতিচ্ছবি প্রস্তুত করা হয়, যদি তা যে রোগারোগ্য করতে হবে তার সাথে মিলে যায় তাহলে ইহাই হবে এই রুগ্নাবস্থার সর্বাপেক্ষা উপযোগী আরোগ্যদায়ক ঔষধ। রোগটি বেশিদিনের পুরাতন না হলে বিশেষ কোন গোলযোগ ছাড়াই প্রথম মাত্রাতে তা দূরীভূত ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

একাদশ অধ্যায়

অচির ও চিররোগ এবং অচির রোগের চিকিৎসা
অনুচ্ছেদ – ১৫০- ১৫৬

১। প্রশ্ন ঃ রোগ কি? ইহার শ্রেণীবিভাগ কর।

রোগের সংজ্ঞা (Define of Diseaese) ঃ

জীবন বিরোধী কোন শক্তি বা প্রভাবের দ্বারা মানুষের জীবনীশক্তির বিশৃংখলা হেতু দেহ ও মনে প্রকাশিত অস্বাভাবিক চিহ্ন ও লক্ষণাবলীকে রোগ বলা হয়। রোগ হলো অজড়, অশুভ, প্রাকৃতিক শক্তি যা জীবনীশক্তির উপরে প্রভাব বিস্তার করলে দেহ ও মনে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ জীবনীশক্তি বিশৃংখলার ফলে শারীরিক ও মানসিক অস্বাভাবিক পরিবর্তন হওয়াকেই রোগ বলে।

রোগের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Diseaese) ঃ

হোমিওপ্যাথির নিয়মনীতি অনুসারে রোগকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ-

১। তরুণ রোগ (Acute Diseases) বা অচির রোগ ।

২। পুরাতন রোগ (Chronic Diseases) বা চির রোগ।

তরুণ রোগ আবার তিন প্রকার যথা ঃ

(i) ব্যক্তিগত তরুণ রোগ,

(ii) বিক্ষিপ্ত তরুণ রোগ ও

(iii) মহামারী তরুণ রোগ।

পুরাতন রোগ আবার তিন প্রকার। যথা ঃ

(i) মিথ্যা চিররোগ,

(ii) প্রকৃত চিররোগ ও

(iii) ঔষধজনিত চিররোগ।

২। প্রশ্ন ঃ অর্গানন অব মেডিসিনে কিভাবে তরুণ রোগগুলির শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে ? আলোচনা কর। ১১

তরুণ রোগের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে বর্ণনা ঃ

ডাঃ স্যামুয়েল হ্যানিম্যান "অর্গানন অব মেডিসিন" গ্রন্থের ৭৩নং অনুচ্ছেদে তরুণ রোগের প্রকারভেদ সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর বর্ণনা মতে তরুণ রোগ তিন প্রকার। যথাঃ- ১। ব্যক্তিগত তরুণ রোগ, ২। বিক্ষিপ্ত তরুণ রোগ ও ৩। মহামারী তরুণ রোগ।

ব্যক্তিগত তরুণ রোগ ঃ যে সকল রোগ ব্যক্তিগত অনিয়মের কারণে সৃষ্টি হয়, তাকে ব্যক্তিগত তরুণ রোগ বলে। কারণ- অতিভোজন, খাদ্যাভাব, তাপ-শীত, শারীরিক ও মানসিক উত্তেজনা, অতিরিক্ত পরিশ্রম ইত্যাদি মানুষের ব্যক্তিগত মানসিক ও শারীরিক অনিয়ম।

উদাহরণঃ অতিভোজনের পর উদরাময়, উপযুক্ত খাদ্যাভাবে রক্তামাশয়, অতিরিক্ত ঠান্ডা লাগার ফলে জ্বর, সর্দ্দিকাশি- অতিরিক্ত উত্তাপে/ঠান্ডার ফলে, মানসিক ও শারীরিক আবেগ উদ্বেগের ফলে জ্বর ইত্যাদি।

বিক্ষিপ্ত তরুণ রোগ ঃ যে রোগগুলি কিছু দূরে দুই একটি ব্যক্তির মধ্যে ছড়ানো ছিটানোভাবে আক্রমন করে, তাকে বিক্ষিপ্ত তরুণ রোগ বলে। এ প্রকারের তরুণ রোগসমূহ বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন স্থানে উৎপন্ন হয়।

কারণ ঃ ডাঃ হ্যানিম্যানের মতে বাহ্যিক ভৌতিক কারণ যেমন আকাশ, বায়ু, পানি ও মাটি দোষ, ইহাতে মানুষের বিশেষ কোন হাত নেই।

উদারণ- হাম, বসন্ত, উদরাময়, কলেরা ইত্যাদি।

মহামারী তরুণ রোগ ঃ- যে সকল রোগ বাহ্যিক উত্তেজক কারণে কোন বিশেষ জনপদে ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হয়ে থাকে, তাকে মহামারী তরুণ রোগ বলে।

কারণ ঃ সাধারণতঃ যুদ্ধ, প্লাবন, দূর্ভিক্ষ প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় বাহ্যিক উত্তেজক কারণে বহুলোক একই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়।

উদাহরণ- কলেরা, বসন্ত, হাম ইত্যাদি।

৩। প্রশ্ন ঃ হোমিওপ্যাথিতে রোগ বলতে কি বুঝ ? ১৫
হোমিওপ্যাথিতে রোগের সংজ্ঞা ঃ

জীবন বিরোধী কোন উপাদান বা শক্তি বা প্রভাবের দ্বারা মানুষের জীবনীশক্তির বিশৃংখলা হেতু দেহে ও মনে প্রকাশিত অস্বাভাবিক চিহ্ন ও লক্ষণাবলীকে রোগ বলা হয়। রোগ হলো অজড়, অশুভ, প্রাকৃতিক শক্তি যা জীবনীশক্তির উপরে প্রভাব বিস্তার করলে দেহ ও মনে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ জীবনীশক্তির বিশৃংখলার ফলে শারীরিক ও মানসিক অস্বাভাবিক পরিবর্তন হওয়াকেই রোগ বলে। এক কথায় জীবনীশক্তির বিশৃংলাই রোগ।

৪। প্রশ্ন ঃ পীড়ার প্রধান কারণ কি কি? ০৮, ১২, ১৪
বা, রোগের প্রধান কারণসমূহ কি কি ?

পীড়ার প্রধান কারণ/রোগের প্রধান কারণসমূহ ঃ

মহাত্মা ডাঃ হ্যানিম্যান হোমিওপ্যাথির আইন সম্বলিত গ্রন্থ " অর্গানন অব মেডিসিন" এর ৫নং অনুচ্ছেদে চির রোগের কারণ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

ক. মূল কারণ ঃ

(i) সোরা, (ii) সিফিলিস, (iii) সাইকোসিস,
(iv) টিউবারকুলার ডায়াথেসিস, (v) মিশ্র মায়াজম।

উত্তেজক/ আনুসঙ্গিক কারণ ঃ

(i) বংশগত কারণে, (ii) বয়স, (iii) লিঙ্গ (পুরুষ/মহিলা), (iv) ঋতু, (v) আবহাওয়া, (vi) পেশা, (vii) পারিবারিক অবস্থা, (viii) সামাজিক অবস্থা, (ix) ব্যক্তিগত অভ্যাস, (x) শারিরীক গঠন (xi) পুষ্টির অবস্থা (xii) বাসস্থান (xiii) বিভিন্ন ধরনের মাইক্রোঅর্গানিজম।

৫। প্রশ্ন ঃ রোগের পরিপোষক কারণ বলতে কি বুঝ ? উদাহরণসহ লিখ। ১৬

বা, রোগের উদ্দীপক ও পরিপোষক কারণ কাকে বলে ? ১২

বা, রোগের পরিপোষক কারণগুলি লিখ।

বা, রোগের উত্তেজক কারণগুলি কি কি ?

উত্তেজক কারণ এর সংজ্ঞা ঃ

বিজ্ঞানী ডাঃ হ্যানিম্যান, "অর্গানন অব মেডিসিন" গ্রন্থের ৫নং অনুচেছদে রোগের কারণ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যে সকল আনুসংঙ্গিক কারণে রোগের উৎপত্তি ও বিস্তার লাভ সহায়তা করে, তাকে উত্তেজক কারণ বলে। অর্থাৎ হঠাৎ কোন কারণে যদি কোন ব্যক্তি অসুস্থ হয়, তাকে রোগের উত্তেজক কারণ বলে।

রোগের উত্তেজক/ পরিপোষক কারণসমূহ নিম্নরূপ ঃ

(i) বংশগত কারণে, (ii) বয়স, (iii) লিঙ্গ (পুরুষ/মহিলা), (iv) ঋতু, (v) আবহাওয়া, (vi) পেশা, (vii) পারিবারিক অবস্থা, (viii) সামাজিক অবস্থা, (ix) ব্যক্তিগত অভ্যাস, (x) শারিরীক গঠন, (xi) পুষ্টির অবস্থা, (xii) বাসস্থান, (xiii) বিভিন্ন ধরনের মাইক্রোঅর্গানিজম।

উত্তেজক কারণের উদাহরণ- অতিরিক্ত আহারের কারণে বদহজমজনিত পেটে ব্যথা, দূষিত পানি পান করার ফলে ডায়রিয়া, প্রচন্ড রৌদ্রে হাটার কারণে জ্বর আসা, অতিরিক্ত ঠান্ডা খাদ্য ও পানীয় গ্রহনের ফলে গলা ব্যথা প্রভৃতি।

৫। প্রশ্ন ঃ রোগের পরিপোষক কারণ বলতে কি বুঝ ? উদাহরণসহ লিখ। ১৬
বা, রোগের উদ্দীপক ও পরিপোষক কারণ কাকে বলে ? ১২
বা, রোগের পরিপোষক কারণগুলি লিখ।
বা, রোগের উত্তেজক কারণগুলি কি কি ?

উত্তেজক কারণ এর সংজ্ঞা ঃ

বিজ্ঞানী ডাঃ হ্যানিম্যান, "অর্গানন অব মেডিসিন" গ্রন্থের ৫নং অনুচ্ছেদে রোগের কারণ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যে সকল আনুসংঙ্গিক কারণে রোগের উৎপত্তি ও বিস্তার লাভ সহায়তা করে, তাকে উত্তেজক কারণ বলে। অর্থাৎ হঠাৎ কোন কারণে যদি কোন ব্যক্তি অসুস্থ হয়, তাকে রোগের উত্তেজক কারণ বলে।

রোগের উত্তেজক/ পরিপোষক কারণসমূহ নিম্নরূপ ঃ

(i) বংশগত কারণে, (ii) বয়স, (iii) লিঙ্গ (পুরুষ/মহিলা), (iv) ঋতু, (v) আবহাওয়া, (vi) পেশা, (vii) পারিবারিক অবস্থা, (viii) সামাজিক অবস্থা, (ix) ব্যক্তিগত অভ্যাস, (x) শারিরীক গঠন, (xi) পুষ্টির অবস্থা, (xii) বাসস্থান, (xiii) বিভিন্ন ধরনের মাইক্রোঅর্গানিজম।

উত্তেজক কারণের উদাহরণ- অতিরিক্ত আহারের কারণে বদহজমজনিত পেটে ব্যথা, দূষিত পানি পান করার ফলে ডায়রিয়া, প্রচন্ড রৌদ্রে হাটার কারণে জ্বর আসা, অতিরিক্ত ঠান্ডা খাদ্য ও পানীয় গ্রহনের ফলে গলা ব্যথা প্রভৃতি।

৮। প্রশ্ন ঃ চিররোগের প্রকৃতি বর্ণনা কর।

চিররোগের প্রকৃতি বর্ণনা ঃ

চিররোগ অজ্ঞাতসারে মানবদেহে প্রবেশ করে। ইহার সৃষ্টিকারী অশুভ শক্তি তথা মায়াজম ও বিভিন্ন প্যাথজেনিক ক্ষুদ্র অনুজীব দেহে প্রবেশ করে দেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসমূহতে অবস্থান করে। সেখানে রোগ সৃষ্টিকারী শক্তি তাদের বংশবৃদ্ধি করে। পরবর্তীতে দেহের সুশৃংখলা ভেঙ্গে দেহ ও মনে কিছু লক্ষণ প্রকাশ করে। উক্ত প্রকাশিত লক্ষণাবলী মাধ্যমে দেহ অর্থাৎ দেহ পরিচালনাকারী জীবনীশক্তি মুক্তির জন্য ঔষধ প্রার্থণা করে। চিররোগ দেহের মধ্যে খুব ধীরে ধীরে বংশবৃদ্ধি করে রোগীকে মৃত্যুর মুখে পতিত করে। রোগী অজ্ঞাতেই দুই একটি লক্ষণ প্রকাশ করে। যার সূত্রধরে চিকিৎসা করা কষ্টকর হয়। চিররোগ এমন সময় প্রচন্ডভাবে রোগী ও চিকিৎসকের দৃষ্টি গোচর হয়, তখন রোগীর তৃতীয় স্টেজে বা শেষ অবস্থা।

৯। প্রশ্ন ঃ চির রোগের বৈশিষ্ট্যসমূহ কি কি ? ১৪

চির রোগের বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

(i) চির রোগ মানবদেহে ধীরে ধীরে ও অজ্ঞাতসারে প্রকাশ পায়।

(ii) ইহার কারণ মায়াজম অর্থাৎ সোরা, সিফিলিস ও সাইকোসিস এবং বিভিন্ন ধরনের মিশ্র মায়াজম ও বংশগত প্রভাব ইত্যাদি।

(iii) ইহা সুস্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ করে না, তাই সহজে সনাক্ত করা যায় না।

(iv) ইহার ভোগকাল অনির্দিষ্ট, সদৃশ বিধান মতে চিকিৎসা না করলে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত থাকে।

(v) ইহা মহামারী আকার ধারণ করে না।

(vi) ইহার চিকিৎসা সম্পর্কে ডাঃ হ্যানিম্যান অর্গানন অব মেডিসিন গ্রন্থের ২০৪-২০৯ নং অনুচ্ছেদে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

(vii) এতে কোন অবস্থাতেই রোগের কারণ নির্ণয় ছাড়া অর্থাৎ মায়াজমেটিক অবস্থা নির্ধারণ করে এন্টিমায়াজমেটিক ঔষধ বিনা রোগী আদর্শ আরোগ্য হয় না।

(viii) এতে বংশানুক্রমিক ধাতু প্রবণতার প্রভাব বেশি থাকে।

১০। প্রশ্ন ঃ চিররোগ চিকিৎসায় রোগীলিপি প্রস্তুতপ্রণালী আলোচনা কর।

চিররোগ চিকিৎসায় রোগীলিপি প্রস্তুতপ্রণালী ঃ

(i) চিকিৎসক প্রথমে রোগীর নাম, বয়স, বিবাহিত অবস্থা, পেশা ও ঠিকানা লিখবেন।

(ii) রোগী নিজেই চিকিৎসকের কাছে তার রোগ যন্ত্রণার কথা বলবে এবং চিকিৎসক রোগীর বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন বা পরিচর্যাকারীর কাছ থেকে শুনবেন।

(iii) তারপর চিকিৎসক রোগীর বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন বা পরিচর্যাকারীর কাছ থেকে শুনবেন।

(iv) রোগী যে ভাষায় বর্ণনা করে সেভাবেই লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(v) তারপর চিকিৎসকের কিছু জানার থাকলে তা অন্য সকলের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করবেন।

(vi) চিকিৎসককে ধৈর্য্য ও মনোযোগের সাথে রোগীকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করবেন। (vii) রোগীকে পরীক্ষার সময় তার দৈহিক গঠন, মানসিক লক্ষণ, ইচ্ছা অনিচ্ছা প্রভৃতি বিষয়ে জানতে হবে।

(viii) চিকিৎসক রোগীকে এমনভাবে প্রশ্ন করবেন না যাতে রোগী হাঁ বা না বলে উত্তর দেয়।

(ix) রোগীর বর্ণিত প্রত্যেকটি লক্ষণের বিবরণ, অবস্থান ও হ্রাস বৃদ্ধি সম্বন্ধে জানতে হবে।

(x) রোগীর বর্ণিত বিষয় লিখার সময় ফাঁকা রাখতে হবে যাতে পরে চিকিৎসক, অজানা লক্ষণাবলী সে স্থানে লিখতে পারে।

(xi) রোগী পূর্বে কোন চিকিৎসকের অধীনে ঔষধ খেয়ে থাকলে তা জানতে হবে।

পরিশেষে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করার পর চিকিৎসক নিজে রোগীকে পর্যবেক্ষণ করে যে সমস্ত বিষয় জানবেন তা লিপিবদ্ধ করতে হবে। যেমন ঃ রোগীর দৈহিক গঠন, আচরণ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, কিংবা নাড়ীর গতি প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করার পর তা লিপিবদ্ধ করতে হবে।

১১। প্রশ্ন ঃ চিররোগের চিকিৎসা পদ্ধতি আলোচনা কর।

চিররোগের চিকিৎসা পদ্ধতি আলোচনা ঃ

(i) চিকিৎসক প্রথমে রোগীর নাম, বয়স, বিবাহিত অবস্থা, পেশা ও ঠিকানা লিখবেন।

(ii) রোগী নিজেই চিকিৎসকের কাছে তার রোগ যন্ত্রণার কথা বলবে এবং চিকিৎসক রোগীর বন্ধু-বান্ধব, আত্নীয় বা পরিচর্যাকারীর কাছ থেকে শুনবেন।

(iii) রোগী যে ভাষায় বর্ণনা করে সেভাবেই লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(iv) তারপর চিকিৎসকের কিছু জানার থাকলে তা অন্য সকলের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করবেন।

(v) চিকিৎসককে ধৈর্য্য ও মনোযোগের সাথে রোগীর পালস, ব্লাড প্রেসার, বুক, জন্ডিস, এনিমিয়া ইত্যাদি পরীক্ষা নিরীক্ষা করবেন।

(vi) রোগীকে পরীক্ষার সময় তার দৈহিক গঠন, মানসিক লক্ষণ, ইচ্ছা অনিচ্ছা প্রভৃতি বিষয়ে জানতে হবে।

(vii) রোগীর বর্ণিত প্রত্যেকটি লক্ষণের বিবরণ, অবস্থান ও হ্রাস বৃদ্ধি সম্বন্ধে জানতে হবে।

(viii) রোগীর বর্ণিত বিষয় লিখার সময় ফাঁকা রাখতে হবে যাতে পরে চিকিৎসক, অজানা লক্ষণাবলী সে স্থানে লিখতে পারে।

(ix) রোগী পূর্বে কোন চিকিৎসকের অধীনে ঔষধ খেয়ে থাকলে তা জানতে হবে।

(x) রোগীর সকল তত্ত্ব নিয়ে ও চিকিৎসক স্বয়ং পরীক্ষা করে রোগীর দেহে যে মায়াজমের লক্ষণাবলী বর্তমান থাকে সে মায়াজমের এন্টিমায়াজমেটিক ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে।

(xi) ঔষধ প্রয়োগের পর রোগীর অবস্থা ও উন্নতির দিক দেখে পরবর্তীতে রোগীর রোগ লক্ষণ নিয়ে আর একটি এন্টিমায়াজমেটিক ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে।

(xii) এভাবে রোগীর অবস্থার উপর নির্ভর করে এন্টিমায়াজমেটিক ঔষধ প্রয়োগ করে রোগী আরোগ্য হলে পরবর্তীতে একটি এন্টিসোরিক ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা সমাপ্ত করতে হবে।

১২। প্রশ্ন ঃ মিথ্যা চিররোগ বলতে কি বুঝ ? ১৪, ১৭

মিথ্যা চিররোগ ঃ

যে সকল রোগ স্বাস্থ্য বিধি লংঘণের ফলে উৎপন্ন হয়, তাদেরকে মিথ্যা চিররোগ বলা হয়। যেমন- রাত্রি জাগরণ, মদ্যপান, স্যাঁতস্যাঁতে স্থানে বসবাস ইত্যাদি। ইহাতে বিনা ঔষধে রোগী আরোগ্য লাভ করে, শুধুমাত্র রোগের কারণ, পথ্য নিয়ন্ত্রণ, রোগীকে স্বাস্থ্যকর স্থানে স্থানান্তরিত করা, উপযুক্ত পরিচর্যার ব্যবস্থা করলে রোগী আরোগ্য হয়।

১৩। প্রশ্ন ঃ অচির রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি বর্ণনা কর। ১২

অচির রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি বর্ণনা ঃ

মহাত্মা ডাঃ হ্যানিম্যান হোমিওপ্যাথির চিকিৎসা আইন গ্রন্থ "অর্গানন অব মেডিসিন" গ্রন্থের ১৫০-১৫৬নং অনুচ্ছেদে অচির রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

রোগীর রোগ লক্ষণ সম্বন্ধে বর্ণনা শুনে এবং চিকিৎসক অনুসন্ধান করে আরও কতকগুলো অপেক্ষাকৃত মৃদু প্রকৃতির লক্ষণ দেখতে পাবেন। সবগুলো মিলিয়ে রোগের একটি পূর্ণাংগ রোগীলিপি তৈরির পরে, ঔষধের লক্ষণসমূহের তালিকার মধ্যে এমন একটি ঔষধ নির্বাচন করতে হবে যা প্রাকৃতিক রোগের লক্ষণ সমষ্টির সদৃশ আরোগ্যকর কৃত্রিম রোগের চিত্র অংকন করা যায়।

সদৃশ বিধান মতে সুনির্দিষ্ট অনুসন্ধানের জন্য অর্থাৎ চিকিৎসাধীন রোগের সদৃশ একটি কৃত্রিম রোগ সৃষ্টিকারী ঔষধ নির্বাচন করার জন্য পরিচিত ঔষধসমূহের সহিত প্রাকৃতিক রোগের সামগ্রিক লক্ষণসমূহের তুলনা করতে হলে রোগীর অধিকতর সুস্পষ্ট একক অনন্য এবং বিশেষ পরিচায়ক সংকেত ও লক্ষণসমূহের প্রতি বিশেষভাবে ও সর্বতোভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ আরোগ্য সাধনের জন্য

সর্বাপেক্ষা উপযোগী ঔষধ নির্বাচন করতে হলে বিশেষত এগুলোর সহিত নির্বাচিত ঔষধের লক্ষণসমূহের অত্যন্ত সাদৃশ্য থাকা বাঞ্ছনীয়।

অদ্ভুত, অসাধারণ, একক এবং সর্বাপেক্ষা উপযোগী ঔষধের লক্ষণসমূহের তালিকা হতে যে প্রতিচ্ছবি প্রস্তুত করা হয়, যদি তা রোগী রোগ লক্ষণের সাথে মিলে যায় তাহলে উক্ত ঔষধ হবে অচির রোগে সর্বাপেক্ষা উপযোগী আরোগ্যদায়ক ঔষধ। ইহা বিশেষ কোন গোলযোগ ছাড়াই প্রথম মাত্রাতে তা দূরীভূত হয়।

১৪। প্রশ্ন ঃ কোন শ্রেণীর উপসর্গ ব্যবস্থাপত্র রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ? ১৫
নিম্নলিখিত শ্রেণীর উপসর্গ ব্যবস্থাপত্র রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ঃ

মহাত্মা ডাঃ হ্যানিম্যান হোমিওপ্যাথির চিকিৎসা আইন গ্রন্থ "অর্গানন অব মেডিসিন" গ্রন্থের ২১০-২১৩ নং অনুচ্ছেদে কোন শ্রেণীর উপসর্গ ব্যবস্থাপত্র রচনায় গুরুত্বপূর্ণ তা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

যে সকল রোগী আমরা দেখি তাঁদের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই রোগের যথার্থ আলেখ্য অংকন করে সদৃশ বিধান মতে চিকিৎসা করে সফলতা অর্জন করার সংকল্প আমাদের মধ্যে থাকে তাহলে রোগ লক্ষণসমষ্টির মধ্যে রোগীর মানসিক অবস্থার প্রতি আমাদের বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

রোগীর মানসিক লক্ষণই বেশির ভাগ সদৃশ ঔষধ নির্বাচনের প্রধান অবলম্বন হিসাবে পরিগণিত হয়। কারণ খুব নিশ্চিতভাবে চরিত্রগত লক্ষণ বলেই তা কোন যথার্থ অনুসন্ধানী চিকিৎসকের দৃষ্টি এড়াতে পারে না।

প্রত্যেকটি রোগীর ক্ষেত্রে এমন কি অচির রোগীর ক্ষেত্রেও আমরা যদি অন্যান্য লক্ষণের সঙ্গে রোগীর মানসিক ও প্রকৃতিগত পরিবর্তন লক্ষ্য না করি এবং রোগীর যন্ত্রণা দূর করার জন্য অন্যান্য সদৃশ লক্ষণের সহিত রোগীর স্বভাব ও মানসিক অবস্থার সদৃশ রোগ সৃষ্টিকারী শক্তি ঔষধরাজী হতে নির্বাচন না করি তাহলে আমরা কখনও প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে অর্থাৎ সদৃশ বিধান মতে আরোগ্য সাধন করতে সমর্থ হবে না।

১৫। প্রশ্ন ঃ কি কি কারণে তরুণ রোগের চিকিৎসা সহজ সাধ্য?

নিম্ন লিখিত কারণে তরুণ রোগের চিকিৎসা সহজসাধ্য ঃ

মহান ডাঃ হ্যানিম্যান তাঁর বিখ্যাত "অর্গানন অব মেডিসিন" গ্রন্থে অচির রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে ১৫০-১৫৬ নং অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

(i) অচির রোগে চিররোগের মত লক্ষণসমূহ অস্পষ্ট থাকার প্রবণতা থাকে না।

(ii) তরুণ রোগে লক্ষণগুলি দ্রুত সাংঘাতিকভাবে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়।

(iii) তরুণ রোগ যত বেশি গুরুতর প্রকৃতির হয় তাতে তত বেশী সংখ্যক ও সুস্পষ্ট লক্ষণাবলী বর্তমান থাকে।

(iv) সুস্পষ্ট লক্ষণাবলী দ্বারা মেটেরিয়া মেডিকা থেকে অধিকতর সদৃশ একটি একক, অনন্য এবং অধিকতর উপযোগী ঔষধ সহজেই নির্বাচন করা যায়।

(vi) তরুণ রোগে রোগীর আকাংখা অনুযায়ী তাঁকে 'খাদ্য ও পানীয় ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু চিররোগে তা সম্ভব নয়।

১৬। প্রশ্ন ঃ চিররোগের ক্ষেত্রে কখন হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি ঘটে থাকে? ১৬

চিররোগের ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি সময় ঃ

সুনির্বাচিত ঔষধ প্রায় প্রতিদিন সেবন করার সময় চিররোগের শেষের দিকে তথাকিথিত হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি দেখা দিলে রোগের অবশিষ্ট লক্ষণরাজী কিছুটা আবার বৃদ্ধি হয়েছে বলে মনে হয়। মূল রোগের সদৃশ ঔষধজনিত রোগই এখন শুধু ক্রমাগত বিকশিত হতে থাকে। সদৃশ বিধান মতে সুনির্বাচিত ঔষধের স্বল্পমাত্রার প্রয়োগে রোগ অতিসহজেই দূরীভূত হয়ে যায়। কিন্তু যদি নির্বাচিত ঔষধ অতিরিক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করা হয়, তখন রোগশক্তির চেয়ে ঔষধশক্তি বেশি হওয়ায় সদৃশ বিধান মতে জীবনীশক্তি রোগশক্তির কবল হতে মুক্ত হলেও প্রবলতর ঔষধশক্তি স্বাভাবিক নিয়মে সদ্যমুক্ত জীবনীশক্তিকে আক্রমণ করে পীড়িত করে।

১৭। প্রশ্ন ঃ অচির ও চিররোগের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। ১১, ১৩, ১৫

অচির রোগের বৈশিষ্ট্য আলোচনা ঃ

(i) অচির রোগ হঠাৎ আবির্ভূত হয় এবং দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

(ii) ইহার কারণ সোরার সাময়িক উচ্ছ্বাস, অতিরিক্ত রৌদ্র, বৃষ্টি, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, বিভিন্ন ধরনের মাইক্রোঅর্গানিজম ইত্যাদি।

(iii) ইহার ভোগকাল নির্দিষ্ট, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রোগী মারা যায় অথবা রোগ নিজে ধ্বংস হয়ে যায়।

(iv) ইহা মহামারী আকার ধারণ করে।

চিররোগের বৈশিষ্ট্য আলোচনা ঃ

(i) চিররোগ মানব দেহে ধীরে ধীরে ও অজ্ঞাতসারে প্রকাশ পায়।

(ii) ইহার কারণ মায়াজম অর্থাৎ সোরা, সিফিলিস ও সাইকোসিস ও বিভিন্ন ধরনের মিশ্র মায়াজম ও বংশগত প্রভাব ইত্যাদি।
চিররোগ মানব দেহে ধীরে ধীরে ও অজ্ঞাতসারে প্রকাশ পায়।

(iii) ইহা সুস্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ করে না, তাই সহজে সনাক্ত করা যায় না।

(iv) ইহা মহামারী আকার ধারণ করে না।

১৮। প্রশ্ন ঃ সাধ্য ও অসাধ্য ব্যাধির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।

সাধ্য ও অসাধ্য ব্যাধির পার্থক্য ঃ

সাধ্য ব্যাধি ঃ যে সকল ব্যাধি ঔষধ প্রয়োগ করলে আরোগ্য হয়, তাদেরকে সাধ্য ব্যাধি বলে। সাধ্য ব্যাধি সোরার সাময়িক উচ্ছ্বাস বা চির মায়াজম দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। তাই লক্ষণ ও চিহ্ন ভিত্তিতে সদৃশ বিধান মতে চিকিৎসা করলে আরোগ্য ধারা অব্যাহত থাকে।

অসাধ্য ব্যধি ঃ যে সকল ব্যাধি ঔষধ প্রয়োগ করলে আরোগ্য হয় না, তাদেরকে অসাধ্য ব্যাধি বলে। ঔষধের অপব্যবহার জনিত চিররোগ সমূহ সর্বাপেক্ষা শোচনীয় ও চিকিৎসার সর্বাপেক্ষা অসাধ্য।

২৯। প্রশ্ন ঃ অচিররোগ ও চিররোগের মধ্যে পার্থক্য কি? ০৯, '১৭
বা, চির ও অচির ব্যাধির মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা কর। ০৮
বা, তরুণ ও চিররোগের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।

চির ও অচির ব্যাধির মধ্যে পার্থক্য ঃ

চিররোগ		অচির রোগ
চির রোগ মানবদেহে ধীরে ধীরে ও অজ্ঞাতসারে প্রকাশ পায়।	১	অচির রোগ হঠাৎ আবির্ভূত হয় এবং দ্রুত বৃদ্ধি পায়।
ইহার কারণ মায়াজম অর্থাৎ সোরা, সিফিলিস ও সাইকোসিস এবং বিভিন্ন ধরনের মিশ্র মায়াজম ও বংশগত প্রভাব ইত্যাদি।	২	ইহার কারণ সোরার সাময়িক উচ্ছ্বাস, অতিরিক্ত রৌদ্র, বৃষ্টি, প্রাকৃতিক দূর্যোগ এবং বিভিন্ন ধরনের মাইক্রোঅর্গানিজম ইত্যাদি।
ইহা সুস্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ করে না, তাই সহজে ইহাকে সনাক্ত করা যায় না।	৩	ইহা সুস্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ করে তাই সহজে ইহাকে সনাক্ত করা যায়।
ইহার ভোগকাল অনির্দিষ্ট, সদৃশ বিধান মতে চিকিৎসা না করলে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত থাকে।	৪	ইহার ভোগকাল নির্দিষ্ট, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রোগী মারা যায় অথবা রোগ নিজে ধ্বংস হয়ে যায়।
ইহা মহামারী আকার ধারণ করে না।	৫	ইহা মহামারী আকার ধারণ করে।
ইহার চিকিৎসা সম্পর্কে ডাঃ হ্যানিম্যান অর্গানন অব মেডিসিন গ্রন্থের ২০৪-২০৯ নং অনুচ্ছেদে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।	৬	ইহার চিকিৎসা সর্ম্পকে ডাঃ হ্যানিম্যান অর্গানন অব মেডিসিন গ্রন্থে ১৫০-১৫৬ নং অনুচ্ছেদে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।
ইহাতে কোন অবস্থাতেই রোগের কারণ নির্ণয় ছাড়া অর্থাৎ মায়াজমেটিক অবস্থা নির্ধারণ করে এন্টিমায়াজমেটিক ঔষধ বিনা রোগী আদর্শ আরোগ্য হয় না।	৭	ইহাতে বিনা ঔষধে রোগী আরোগ্য লাভ করে, শুধুমাত্র রোগের কারণ, পথ্য নিয়ন্ত্রণ, রোগীকে স্বাস্থ্যকর স্থানে স্থানান্তরিত করা, উপযুক্ত পরিচর্যার ব্যবস্থা করলে রোগী আরোগ্য হয়।
ইহাতে বংশানুক্রমিক ধাতু প্রবণতার প্রভাব বেশি থাকে।	৮	ইহাতে সাধারণত: বংশানুক্রমিক ধাতু প্রবণতার প্রভাব থাকে না।

২০। প্রশ্ন ঃ যথার্থ চিররোগ কাকে বলে ? যথার্থ চিররোগের কারণগুলো লিখ। ১০

যথার্থ চিররোগ সংজ্ঞা ঃ

কোন চির মায়াজম অর্থাৎ সোরা, সিফিলিস ও সাইকোসিস হতে উৎপন্ন রোগগুলিকেই, যথার্থ প্রাকৃতিক চিররোগ বলা হয়। এন্টিমায়াজমেটিক ঔষধের দ্বারা আরোগ্য করা না হলে দৈহিক-মানসিক সর্বপ্রকার যত্ন নেয়া সত্ত্বেও ইহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে, ক্রমশ অবনতির পথে চলতে থাকে ও অধিকতর যন্ত্রণা দিয়ে রোগীকে আজীবন কষ্ট দেয়। কু-চিকিৎসা হতে উৎপন্ন রোগসমূহ ছাড়া এগুলি হচ্ছে মানবজাতির সর্বাপেক্ষা অধিক ও সবচাইতে বড় শত্রু। কারণ বলিষ্ট দেহ, নিয়মনিষ্ঠ জীবন-যাপন ও জীবনীশক্তির সতেজ কার্যকরীতা এদেরকে নির্মূল করতে সক্ষম হয় না।

যথার্থ চিররোগের কারণগুলো (Causes of Real Chronic disease) ঃ

ক. মূল কারণ ঃ (i) সোরা, (ii) সিফিলিস, (iii) সাইকোসিস, (iv) টিউবারকুলার ডায়াথেসিস, (v) মিশ্র মায়াজম।

উত্তেজক/ আনুসঙ্গিক কারণ ঃ (i) বংশগত কারণে, (ii) বয়স, (iii) লিঙ্গ (পুরুষ/মহিলা), (iv) ঋতু, (v) আবহাওয়া, (vi) পেশা, (vii) পারিবারিক অবস্থা, (viii) সামাজিক অবস্থা, (ix) ব্যক্তিগত অভ্যাস, (x) শারিরীক গঠন (xi) পুষ্টির অবস্থা (xii) বাসস্থান (xiii) বিভিন্ন ধরনের মাইক্রোঅর্গানিজম।

২১। প্রশ্ন ঃ অ-রতিজ বা অযথা চিররোগ বলিতে কি বুঝ ?
বা, অ-রতিজ চিররোগ বলতে কি বুঝ ? ০৯

অযথা চিররোগের সংজ্ঞা ঃ

যে সকল রোগ মায়াজম ব্যতিত শুধুমাত্র স্বাস্থ্যবিধি লংগনের কারণে বা এলোপ্যাথিক চিকিৎসকদের অপ-চিকিৎসা দ্বারা সৃষ্টি হয়, তাকে অযথা চিররোগ বা অ-রতিজ বলে। এগুলি প্রকৃত চিররোগের পর্যায়ের নয়। সেগুলি সাধারণতঃ বিভিন্ন অস্বাস্থ্যকর বসবাস ও পরিবেশ পরিবর্তন করলে বা স্বাস্থ্যবিধি সঠিকভাবে পালন করলে রোগী আরোগ্য হয়।

২২। প্রশ্ন ঃ অ-রতিজ চিররোগ আরোগ্যের ঔষধ নির্বাচন ও প্রয়োগ পদ্ধতি আলোচনা কর। ১০

অ-রতিজ চিররোগ আরোগ্যের ঔষধ নির্বাচন ও প্রয়োগ পদ্ধতি আলোচনা ঃ ডাঃ স্যামুয়েল হ্যানিম্যান "অর্গানন অব মেডিসিন" গ্রন্থের ১৭১নং অনুচ্ছেদে অ-রতিজ চিররোগ আরোগ্যে ঔষধ নির্বাচন ও প্রয়োগ পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

ডাঃ স্যামুয়েল হ্যানিম্যান মতে, যে সব রোগ অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে সোরা হতে উৎপন্ন হয় সেসব অ-রতিজ চিররোগ আরোগ্যের জন্য প্রায়ই চিকিৎসককে পরপর কয়েকটি সোরা বিরোধী ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে। পূর্ববর্তী ঔষধের ক্রিয়া শেষ হবার পর যে সকল লক্ষণসমষ্টি অবশিষ্ট থাকে তাদের সঙ্গে সর্বতোভাবে সদৃশ পরবর্তী ঔষধ নির্বাচন করতে হবে।

সোরার সাময়িক উচ্ছাসের জন্য মানবদেহে রোগ লক্ষণাবলী প্রকাশিত হয়, সে লক্ষণাবলী যদি কোন ভেনারেল অর্থাৎ সাইকোসিস বা সিফিলিস মায়াজমের সংস্পর্শে না আসে তাহলে জটিলতা ছাড়া রোগ আরোগ্য হয়। এক্ষেত্রে ঔষধ নির্বাচন ও প্রয়োগ পদ্ধতি সহজ হয়।

২৩। প্রশ্ন ঃ প্রকৃত স্থায়ী রোগ ও কৃত্রিম স্থায়ী রোগের মধ্যে পার্থক্য কর। ১৭

বা, প্রকৃত চির রোগ ও মিথ্যা চির রোগের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।

প্রকৃত চিররোগ ও মিথ্যা চিররোগের পার্থক্য নির্ণয় ঃ

প্রকৃত চিররোগ/প্রকৃত স্থায়ী রোগ		মিথ্যা চিররোগ/ কৃত্রিম স্থায়ী রোগ
প্রকৃত চির রোগের মূলকারণ সোরা, সিফিলিস ও সাইকোসিস নামক চিররোগ উপবিষ।	১	স্বাস্থ্য বিধি লংঘনের ফলে মিথ্যা চির রোগ সৃষ্টি হয়। যেমন- রাত্রি জাগরণ, মদ্যপান, স্যাঁতস্যাঁতে স্থানে বসবাস ইত্যাদি।
ইহাতে বংশগত ধাতু প্রবণতার প্রভাব থাকে।	২	ইহাতে বংশগত ধাতু প্রবণতার প্রভাব থাকে না।
ইহাতে সদৃশ বিধান মতে চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্য করা সহজ।	৩	ইহাতে পরিপোষক কারণ নির্ণয় করে সদৃশ চিকিৎসা দিলে আরোগ্য ক্রিয়া সহজ হয়।
ইহাতে কোন অবস্থাতেই রোগের কারণ নির্ণয় ছাড়া অর্থাৎ মায়াজমেটিক অবস্থা নির্ধারণ করে এন্টিমায়াজমেটিক ঔষধ বিনা রোগী আদর্শ আরোগ্য হয় না।	৪	ইহাতে বিনা ঔষধে রোগী আরোগ্য লাভ করে, শুধুমাত্র রোগের কারণ, পথ্য নিয়ন্ত্রণ, রোগীকে স্বাস্থ্যকর স্থানে স্থানান্তরিত করা, উপযুক্ত পরিচর্যার ব্যবস্থা করলে রোগী আরোগ্য হয়।
উদাহরণ- পেপটিক আলসার, ডায়াবেটিস, যক্ষ্মা, হাঁপানি, চর্মরোগ ইত্যাদি প্রকৃত চির রোগ।	৫	উদাহরণ- দুধ পানজনিত অজীর্ণতা, স্যাঁতস্যাঁতে ঘরে বসবাসের জন্য শ্বাসকষ্ট, রাত্রি জাগরণের জন্য অসুস্থতা মিথ্যা চির রোগ।

২৪। প্রশ্ন ঃ অলীক চিররোগের সম্পর্কে আলোচনা কর। ০৮, ১২, ১৪

অলীক চিররোগের সম্পর্কে বর্ণনা /মিথ্যা চিররোগ/অযথা চির রোগ এর সংজ্ঞা ঃ

মহাত্মা ডাঃ হ্যানিম্যান হোমিওপ্যাথির চিকিৎসা আইন গ্রন্থ "অর্গানন অব মেডিসিন" এর ৭৪-৭৮ নং অনুচ্ছেদে চিররোগের প্রকার সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এর মধ্যে ৭৭ নং অনুচ্ছেদে ডাঃ হ্যানিম্যান অযথা/মিথ্যা চির রোগের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

যে সকল চির রোগ সৃষ্টিতে চির মায়াজমের প্রভাব থাকে না, শুধুমাত্র অস্বাভাবিক জীবন-যাপন প্রণালী কারণে রোগ বলে মনে হয় অর্থাৎ সব সময় বর্জনসাধ্য ক্ষতিকর প্রভাবসমূহের অধীনে থেকে মানুষ যে সকল রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয় সে সকল রোগকে, মিথ্যা/অযথাই চির রোগ বলা হয়। যেমন- অনিষ্টকর বিবিধ মদ বা খাদ্যে আসক্ত হওয়া, স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বিভিন্ন প্রকার অসংযত আচরণে লিপ্ত হওয়া, জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ হতে সুদীর্ঘকাল বঞ্চিত থাকা, অস্বাস্থ্যকর স্থানে, বিশেষতঃ স্যাঁতস্যাঁতে ভূমিতে, গুহায় বা আবদ্ধ ঘরে বাস করে, ব্যায়াম বা মুক্ত বাতাস হতে বঞ্চিত, শারীরিক-মানসিক গুরুতর পরিশ্রমে স্বাস্থ্য নষ্ট করা, সর্বদা মানসিক দুশ্চিন্তা ইত্যাদি হতে এ প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়। যদি কোন চির রোগ মায়াজম (chronic miasm) দেহের ভিতরে লুকিয়ে না থাকে তা হলে এ ধরণের স্ব-কৃত অসুস্থ অবস্থা উন্নততর জীবনযাপন আরম্ভ করলে দুরীভূত হয়। সুতরাং এদেরকে প্রকৃত চিররোগ বলা যায় না।

২৫। প্রশ্ন ঃ একদেশিক রোগের সংজ্ঞা লিখ। ১২, ১৪, ১৫
বা, একদৈশিক ব্যাধি বলতে কি বুঝ ? ০৮

একদৈশিক রোগের সংজ্ঞা ঃ

মহাত্মা ডাঃ হ্যানিম্যান হোমিওপ্যাথির চিকিৎসা আইন গ্রন্থ "অর্গানন অব মেডিসিন" এর ১৭২-১৭৩ নং অনুচ্ছেদে একদৈশিক রোগের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

যে সকল রোগে একটি বা দুইটি লক্ষণ প্রকাশিত হয় এবং অন্যান লক্ষণ অপ্রকাশিত থাকে; তাকে একদৈশিক রোগ বা এক তরফা এক পার্শ্বিক রোগ বলে। এ সকল রোগ চিররোগের অন্তর্ভূক্ত। অত্যন্ত কম লক্ষণ প্রকাশ করে তাই এ ধরনের রোগ আরোগ্য দুঃসাধ্য।

২৬। প্রশ্ন ঃ একদৈশিক রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি আলোচনা কর। ১৫
বা একদৈশিক রোগের চিকিৎসা বর্ণনা কর।
বা রোগের লক্ষণ অতি অল্প হলে কিভাবে চিকিৎসা করতে হবে ?

একদৈশিক রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি আলোচনা ঃ

(i) একদৈশিক রোগের অত্যন্ত কম লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

(ii) দুই-একটি লক্ষণ প্রকাশ করে অবশিষ্ট লক্ষণসমূহ অস্পষ্টভাবে থাকে।

(iii) এই প্রকাশিত দুই-একটি লক্ষণ নিয়ে আংশিক সদৃশ একটি ঔষধ নিবার্চন করে রোগীকে সেবন করতে দিতে হবে।

(iv) আংশিক সদৃশ ঔষধ প্রয়োগের পর প্রকাশিত লক্ষণ সমূহ সংগ্রহ করে পরবর্তী ঔষধ নির্বাচন করতে হবে।

(v) এভাবে লুকায়িত লক্ষণ প্রকাশিত হলে তার সদৃশ ঔষধ প্রয়োগ করে রোগীকে আরোগ্য করতে হবে।

(vi) সর্বশেষ একটি এন্টিসোরিক ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে।

২৭। প্রশ্ন ঃ একদৈশিক রোগ ও স্থানীয় রোগের মধ্যে পার্থক্য লিখ।
১২, ১৪

একদৈশিক রোগ ও স্থানীয় রোগের মধ্যে পার্থক্য ঃ

একদৈশিক রোগ		স্থানীয় রোগ
যে সকল রোগে একটি বা দুইটি লক্ষণ প্রকাশিত হয় এবং অন্যান লক্ষণ অপ্রকাশিত থাকে, তাকে একদৈশিক রোগ বলে।	১	যে সকল রোগ শরীরের স্থান বিশেষে অর্থাৎ বিভিন্ন অংশে প্রকাশিত হয়, তাকে স্থানীয় রোগ বলে।
ইহার কারণ মায়াজম। অর্থাৎ সোরা, সিফিলিস ও সাইকোসিস।	২	ইহার কারণ মায়াজম ও দূর্ঘটনাজনিত।
ইহা চিররোগের অর্ন্তভূক্ত।	৩	ইহা একদৈশিক রোগের অর্ন্তভূক্ত।
ইহা বংশগতভাবে হয়।	৪	ইহা বংশগত ও অর্জিত উভয় ভাবে হতে পারে।
ইহাতে অধিকাংশ লক্ষণ অপ্রকাশিত থাকে বলে চিকিৎসক সঠিক রোগচিত্র অংকন করতে পারে না, তাই সঠিক ঔষধ নির্বাচন কষ্টকর হয়।	৫	ইহাতে রোগীর অবস্থা, রোগ লক্ষণাবলী নিয়ে সহজেই রোগচিত্র অংকন করা যায় এবং সঠিক ঔষধ নির্বাচন ও ব্যবস্থা করা যায়।
ইহা আভ্যন্তরীন, অনুভব করা যায়।	৬	ইহা বাহ্যিকভাবে দেখা যায়।
ইহার চিকৎসা শুধুমাত্র আভ্যন্তরীন ঔষধ প্রয়োগের আরোগ্য করতে হয়।	৭	ইহাতে আভ্যন্তরীন ঔষধ প্রয়োগের সাথে দূর্ঘটনার পর সার্জারীর ব্যবস্থা গ্রহন করতে হয়।
ইহার চিকিৎসা অত্যন্ত কঠিন। উদাহরণ দীর্ঘদিনের মাথা ব্যথা, টিউমার ইত্যাদি।	৮	ইহার চিকিৎসা একদৈশিক রোগ হতে সহজতর। উদাহরণ- চর্মরোগ, অস্থিভংগ, পুড়ে যাওয়া ইত্যাদি।

২৮। প্রশ্ন ঃ হোমিওপ্যাথিতে রোগ নয়, রোগীর চিকিৎসা করা হয়- ব্যাখ্যা কর ?

বা, "রোগ নয়, রোগীর চিকিৎসা"- ব্যাখ্যা কর। ১৭

হোমিওপ্যাথিতে রোগ নয়, রোগীর চিকিৎসা করা হয় কারণ ঃ

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি কোন রোগের নাম ধরে চিকিৎসা করা হয় না, রোগীর সামগ্রীক বৈশিষ্ট্যর উপর ভিত্তি করে চিকিৎসা করা হয়। ডাঃ হ্যানিম্যানের মতে- রোগের নয়, রোগীর চিকিৎসা কর রোগীকে আংশিক বা আংশিকভাবে নয়, সামগ্রিকভাবে চিকিৎসা কর। রোগ নয়, রোগীকে চিকিৎসা কর, ইহা হোমিওপ্যাথির একটা মৌলিক নিয়মনীতি। কারণ এর মতে ভিন্ন ব্যক্তি- সত্তাভিত্তিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের রোগীর রোগ লক্ষণ ও ভিন্ন হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক রোগীকে ব্যক্তিগতভাবে পর্যবেক্ষণ করে সে মত ব্যবস্থা করা সংগত। প্রত্যেক রোগে রোগীর মধ্যে কিছু বিকৃত লক্ষণ থাকে। উক্ত লক্ষণগুলো চিকিৎসক অবগত হয়ে সেগুলোর বিশিষ্টতা নির্ধারণপূর্বক ঔষধ নির্বাচন করতে হবে। যেমন- কোষ্ঠবদ্ধতা, শ্লৈষ্মিকঝিল্লির শুষ্কতা, অনেকক্ষণ পরপর অনেক খানি ঠান্ডা পানি পান করে, নড়াচড়ায় বৃদ্ধি, মাথার যাতনা, অঙ্গের ব্যথা কাশিতে বুকে ব্যথা অনুভব ইত্যাদি। এ সকল লক্ষণের মধ্যে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর শুষ্কতা, অনেকক্ষণ পরপর অনেকখানি ঠান্ডা পানি পান ও নড়াচড়ায় বৃদ্ধি- এ বিশেষত্বের উপর ব্রায়োনিয়া ঔষধটা নির্বাচন করা যেতে পারে। যে কোন রোগী বা ঔষধের লক্ষণ সমষ্টির বিশেষত্ব জানতে পারলেই প্রকৃত সদৃশ ঔষধ নির্বাচন করা সম্ভব হয়ে থাকে, রোগের নাম যাই হোক না কেন। হোমিওপ্যাথিক প্রত্যেকটি ঔষধ সুস্থ মানবদেহে পরীক্ষা করে দেখা গেছে প্রত্যেকটি ঔষধ সুস্থ মানবদেহের কতগুলি লক্ষণ প্রকাশ করে, যা প্রাকৃতিক রোগে উক্ত লক্ষণাবলী সদৃশ রোগকে আরোগ্য করতে পারে।

২৯। প্রশ্ন ঃ "আংশিকভাবে নহে, সামগ্রীকভাবে চিকিৎসা করতে হবে" : ব্যাখ্যা কর।

"আংশিকভাবে নহে, সামগ্রীকভাবে চিকিৎসা করতে হবে" - ব্যাখ্যা ঃ

জীবনীশক্তি মানবদেহকে স্বীয়কার্য সাধনে সঞ্জীবিত রাখে। জীবনীশক্তি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অজড়। অজড় রোগ শক্তি অজড় জীবনী শক্তিকে পরাভূত করে, ফলে জীবনীশক্তি রোগাক্রান্ত হয়। জীবনীশক্তির বিশৃংঙ্খলাই রোগ। জীবনীশক্তির অসুস্থতার কারণে দেহের মধ্যে বিশৃংঙ্খলার সৃষ্টি হয়। এই বিশৃংঙ্খলা বিশেষ বিশেষ রোগের প্রকৃতি অনুসারে বিশেষ বিশেষ অঙ্গে বিকৃতি আকারে প্রকাশ পায়। এখানে রোগ কোন আঙ্গিক বিষয় নয়, তা সমগ্র দেহের রোগগ্রস্থ অবস্থাকে প্রকাশ করে। জীবনীশক্তির এই রোগাক্রান্ত হবার নির্দেশন হিসাবে আমরা যে সকল লক্ষণ প্রত্যক্ষ করি তার প্রকাশস্থল দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। সুতরাং রোগ সমগ্র মানুষটির, তার কোন অঙ্গ বা অংশের নয়। বিকৃত লক্ষণসমূহ দ্বারা জীবনীশক্তি ঔষধের সাহায্য প্রার্থনা করে। লক্ষণসমষ্টি অসুস্থ জীবনীশক্তির সাহায্য প্রার্থনার ভাষা। চিকিৎসকের কর্তব্য হল জীবনীশক্তির এই বিকৃত লক্ষণসমূহের সদৃশ একটি শক্তিকৃত সূক্ষ্মমাত্রার ঔষধ প্রয়োগ করা।

অতএব, হোমিওপ্যাথিতে রোগাক্রান্ত জীবনীশক্তির চিকিৎসা করা হয়, অর্থাৎ রোগীর সমগ্র দেহ ও মনের সামগ্রীক চিকিৎসা করা হয়। কোন অঙ্গ বা অংশের নয়।

৩০। প্রশ্ন ঃ অলীক জীর্ণ রোগ বলতে কি বুঝ? এই রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি বর্ণনা কর। ১০

অলীক জীর্ণ রোগের সংজ্ঞা ঃ

মহাত্মা ডাঃ হ্যানিম্যান হোমিওপ্যাথির চিকিৎসা আইন গ্রন্থ "অর্গানন অব মেডিসিন" এর ৭৪-৭৮ নং অনুচ্ছেদে চির রোগের প্রত্যক

প্রকার সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এর মধ্যে ৭৭ নং অনুচ্ছেদে ডাঃ হ্যানিম্যান অযথা/মিথ্যা চির রোগের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

যে সকল চির রোগ সৃষ্টিতে চির মায়াজমের প্রভাব থাকে না, শুধুমাত্র অস্বাভাবিক জীবন-যাপন প্রণালীর কারণে রোগ বলে মনে হয় অর্থাৎ সব সময় বর্জনসাধ্য ক্ষতিকর প্রভাবসমূহের অধীনে থেকে মানুষ যে সকল রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয় সে সকল রোগকে, মিথ্যা/অযথা চির রোগ বলা হয়। যেমন- নিয়মিত খাদ্য গ্রহন না করা, রাত্রি জাগরণ, পুষ্টিকর খাদ্যাভাব, মানসিক দুঃচিন্তা, রাগ, অনাকাংখিত শোক, অনিষ্টকর বিবিধ মদ বা খাদ্যে আসক্ত হওয়া, স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বিভিন্ন প্রকার অসংযত আচরণে লিপ্ত হওয়া, জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ হতে সুদীর্ঘকাল বঞ্চিত থাকা, অস্বাস্থ্যকর স্থানে, বিশেষতঃ স্যাঁতসেঁতে ভূমিতে, গুহায় বা আবদ্ধ ঘরে বাস করে, ব্যায়াম বা মুক্ত বাতাস হতে বঞ্চিত, শারীরিক-মানসিক গুরুতর পরিশ্রমে স্বাস্থ্য নষ্ট করা, সর্বদা মানসিক দুশ্চিন্তা ইত্যাদি হতে এ প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়।

অলীক জীর্ণ রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি বর্ণনা ঃ

(i) স্বাভাবিক জীবন-যাপনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ii) নিয়মিত খাদ্য গ্রহন করা, নিয়মিত রাত্রি নিদ্রা, পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহন, মানসিক প্রশান্তি ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে।

(iii) যদি কোন চির রোগ মায়াজম দেহের ভিতরে লুকিয়ে না থাকে তা হলে এ ধরণের স্ব-কৃত অসুস্থ অবস্থা-উন্নততর জীবনযাপন আরম্ভ করলে দুরীভূত হয়। সুতরাং এদেরকে প্রকৃত চিররোগ বলা যায় না।

৩১। প্রশ্ন ঃ সাধ্য ও অসাধ্য ব্যাধি কাকে বলে ? সর্বাপেক্ষা অসাধ্য ব্যাধি কোনগুলি এবং কেন ? ১২

বা, সাধ্য ও অসাধ্য রোগ কাকে বলে? সর্বাপেক্ষা অসাধ্য রোগ কোনগুলি এবং কেন ?

সাধ্য ব্যাধি ঃ যে সকল ব্যাধি ঔষধ প্রয়োগ করলে আরোগ্য হয়, তাদেরকে সাধ্য ব্যাধি বলে। সাধ্য ব্যাধি সোরার সাময়িক উচ্ছ্বাস বা চির মায়াজম দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। তাই লক্ষণ ও চিহ্নের ভিত্তিতে সদৃশ বিধান মতে চিকিৎসা করলে আরোগ্য ধারা অব্যাহত থাকে।

অসাধ্য ব্যাধি ঃ যে সকল ব্যাধি ঔষধ প্রয়োগ করলে আরোগ্য হয় না, তাদেরকে অসাধ্য ব্যাধি বলে। ঔষধের অপব্যবহার জনিত চিররোগ সমূহ সর্বাপেক্ষা শোচনীয় ও চিকিৎসার সর্বাপেক্ষা অসাধ্য।

সর্বাপেক্ষা অসাধ্য ব্যাধি নিম্নলিখিতগুলি এবং কারণ/ঔষধ সৃষ্ট রোগ আরোগ্য করা কঠিন কারণ ঃ

মানবদেহে প্রাকৃতিক রোগসমূহ পরস্পর মিলিত হয়ে যে জটিলতা সৃষ্টি করে তা অপেক্ষা দীর্ঘকাল ধরে অনুপযোগী ঔষধের দ্বারা অসঙ্গত চিকিৎসার ফলে যে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয় তার সংখ্যা অনেক বেশি। স্বাভাবিক রোগকে আরোগ্য করার জন্য অনুপযোগী ঔষধের বার বার প্রয়োগের ফলে তারই প্রকৃতি অনুযায়ী একটি নতুন, অনেক ক্ষেত্রে খুব কষ্ট সাধ্য রোগ প্রাকৃতিক রোগের সহিত মিলিত হয়। পরস্পরের মিলনে চিররোগটি জটিল হয়ে যায়। ঔষধ সৃষ্ট রোগ স্বাভাবিক রোগের বি-সদৃশ কাজেই চিররোগের সহিত একটি নতুন বি-সদৃশ চির প্রকৃতির কৃত্রিম রোগযুক্ত হয়। এভাবে রোগী একটির স্থলে দুইটি রোগে আক্রান্ত হন। ফলে রোগীর অবস্থা আরো বেশি জটিল হয়ে পড়ে। আরোগ্য সাধন দুঃসাধ্য হয়ে উঠে, অনেক সময় একেবারে অসাধ্য হয়ে যায়। যেমন- সিফিলিসের সহিত, বিশেষতঃ সোরা অথবা আঁচিলযুক্ত গনোরিয়া সংযুক্ত হয়ে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়, তা দীর্ঘকাল ধরে বা বারম্বার অনুপযোগী পারদঘটিত ঔষধের বড় মাত্রা সেবনে আরোগ্য হয় না। পারদজনিত রোগটি ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইহার সাথে মিলিত হয়ে এক প্রকার মারাত্মক জটিল রোগের সৃষ্টি হয়।

৩২। প্রশ্ন ঃ চিররোগ চিকিৎসায় রোগীর কি কি বিষয় অনুসন্ধান আবশ্যক ?

বা, কিভাবে চিররোগের পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায় ? ১১

চিররোগ চিকিৎসায় রোগীর নিম্নলিখিত বিষয় অনুসন্ধান আবশ্যক ঃ

মহাত্মা ডাঃ হ্যানিম্যান অর্গানন অব মেডিসিন গ্রন্থের ১৮৫-২০৩নং অনুচ্ছেদে স্থানীয় রোগের চিকিৎসা, ২০৪-২০৯ নং অনুচ্ছেদে চির রোগের চিকিৎসা, ২১০-২৩০ নং অনুচ্ছেদে মানসিক রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। উক্ত অনুচ্ছেদের রোগসমূহ চিররোগের অন্তর্ভূক্ত।

চিররোগ চিকিৎসায় রোগীলিপি সংগ্রহের সময় ঃ

(i) রোগীর লক্ষণ সমষ্টি সংগ্রহ করতে হবে।

(ii) রোগের কারণ অনুসন্ধান- অর্জিত না বংশগত জানতে হবে।

(iii) মিশ্র মায়াজম, উত্তেজক বা আনুসঙ্গিক কারণ জানতে হবে।

(iv) রোগীর রোগ সম্পর্কিত পারিবারিক বা বংশগত ইতিহাস জেনে নিতে হবে।

(v) রোগীর রোগ সম্পর্কিত অতীতের ইতিহাস জানতে হবে।

(vi) রোগীর ব্যক্তিগত বিষয়াবলী। যেমন- শখ, অভ্যাস, রোগীর সামজিক অবস্থান ও পেশাগত অবস্থান জানতে হবে।

(vii) রোগীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাধারণ চিত্র, চেহারা, শারীরিক গঠন এনিমিয়া, জন্ডিস, আঁচিল, তাপমাত্রা, শ্বাস-প্রশ্বাসের হার, পালস, ব্ল্যাডপ্রেসার, চর্মের অবস্থা, মলমূত্র, ঘর্মস্রাব ইত্যাদির ইতিহাস জানতে হবে।

(viii) সার্বদৈহিক অবস্থা- কাতরতা সর্দি লাগার প্রবণতা, গোসলের ইচ্ছা অনিচ্ছা, খাদ্যের ইচ্ছা অনিচ্ছা, স্বপ্ন, ঘুম ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে হবে।

অতএব উপরিউক্ত বিষয়াবলী চিররোগ চিকিৎসায় রোগীর আদর্শ আরোগ্য জন্য আবশ্যক।

৩৩। প্রশ্ন ঃ সোরাজনিত চিররোগের চিকিৎসা পদ্ধতি বর্ণনা কর। ১৫

[illegible]

বা, [illegible]

বা, [illegible]

বা, সোরাঘটিত চিররোগে কিভাবে ঔষধ প্রয়োগ করবে? ১৬

সোরাজনিত চিররোগের চিকিৎসা পদ্ধতি (Treatment of chronic disease caused by Psora) ঃ

ডাঃ মহাত্মা হ্যানিম্যান অর্গানন অব মেডিসিন গ্রন্থের ১৭১ নং অনুচ্ছেদে সোরা হতে উৎপন্ন চিররোগ চিকিৎসায় ঔষধ কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন।

তাঁর মতে যে সকল চিররোগ সোরা হতে উৎপন্ন সেই চিররোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটি এন্টিসোরিক ঔষধ দিয়ে রোগীকে পরিপূর্ণভাবে আরোগ্য করা যাবে না। এই জন্য এরূপ রোগীতে লক্ষণ সাদৃশ্য অনুসারে যে সকল এন্টিসোরিক ঔষধের প্রয়োজন হয় তা পর্যায়ক্রমে একটির পর একটি প্রয়োগ করতে হবে। পরবর্তী প্রত্যেকটি ঔষধ পূর্ববর্তী ঔষধের ক্রিয়া শেষ হলে যে লক্ষণসমষ্টি পাওয়া যাবে তার উপর ভিত্তি করে সাদৃশ্য অনুসারে ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে। যতদিন না রোগী সোরা মায়াজম হতে মুক্ত হয়।

৩৪। প্রশ্ন ঃ চিররোগ আরোগ্যে অধিক সময় প্রয়োজন হয় কেন ?০৮

বা, চিররোগ কি? ইহার আরোগ্যে অধিক সময় লাগে কেন? ১২, ১৭

চিররোগ আরোগ্যে অধিক সময় প্রয়োজন হয় কারণ ঃ

ডাঃ মহাত্মা হ্যানিম্যান অর্গানন অব মেডিসিন গ্রন্থের ২০৪-২০৯ নং অনুচ্ছেদে চিররোগ চিকিৎসার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন। তাঁর মতে রোগের উৎপত্তি বিভিন্ন চির মায়াজম অর্থাৎ সোরা, সিফিলিস, সাইকোসিস এর সংমিশ্রণ দ্বারা। চিররোগ একাধিক

মায়াজমের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয়, তাই ইহার আরোগ্যের সময়ও অধিক লাগে। যেমন- সোরা হতে উৎপন্ন সেই চিররোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটি এন্টিসোরিক ঔষধ দিয়ে রোগীকে পরিপূর্ণভাবে আরোগ্য করা যাবে না। এই জন্য এরূপ রোগীতে লক্ষণ সাদৃশ্য অনুসারে যে সকল এন্টিসোরিক ঔষধের প্রয়োজন হয় তা পর্যায়ক্রমে একটির পর একটি প্রয়োগ করতে হবে। পরবর্তী প্রত্যেকটি ঔষধ পূর্ববর্তী ঔষধের ক্রিয়া শেষ হলে যে লক্ষণসমষ্টি পাওয়া যাবে তার উপর ভিত্তি করে সাদৃশ্য অনুসারে ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে। যতদিন না রোগী সোরা মায়াজম হতে মুক্ত হয়। অনুরূপভাবে সোরা ও সিফিলিস, সোরা ও সাইকোসিস এবং সোরা, সিফিলিস, সাইকোসিস একত্রে সংমিশ্রিত যে চিররোগ সৃষ্টি হয় তার চিকিৎসা করতে হয়। উক্ত কারণে চিররোগ আরোগ্যে অধিক সময় প্রয়োজন হয়।

৩৫। প্রশ্ন ঃ রোগ চাপা দেয়ার কুফলগুলি কি কি ?

রোগ চাপা দেয়ার কুফলসমূহ ঃ

রোগ চাপা দেওয়ার ফলে রোগের গতি বাহিরাভিমুখী হতে অর্ন্তরমুখী হয় এবং অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ অর্গান হতে অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে স্থানান্তরিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- খোঁস, পাঁচড়া, দাঁদ প্রভৃতি রোগের প্রথমে বাহিরাভিমুখী থাকা এবং চর্মের উপর এরা দৃষ্ট হয়। কিন্তু বিভিন্ন প্রকার বাহ্যিক মলম প্রয়োগে উহারা চর্মে অদৃশ্য হয়ে অর্ন্তরমুখী হয় এবং অপেক্ষাকৃত অধিক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ যেমন- মস্তিষ্ক, লিভার, ফুসফুস প্রভৃতিতে আক্রান্ত করে। এখানে রোগের বাহিরাভিমুখী অবস্থান থেকে অর্ন্তরমুখী অবস্থানের কারণে রোগীর গুরুত্বপূর্ণ অর্গানগুলো বেশী আক্রান্ত হয়। ফলে রোগীর রোগারোগ্য জটিলতর হয়।

৩৬। প্রশ্ন ঃ চিররোগ নিরাময়ের উপায় কি ? ১০

চিররোগ নিরাময়ের উপায় ঃ

মহাত্মা ডাঃ হ্যানিম্যান অর্গানন অব মেডিসিন গ্রন্থের ১৮৫-২০৩ নং অনুচ্ছেদে স্থানীয় রোগের চিকিৎসা ও ২০৪-২০৯ নং অনুচ্ছেদে চির রোগের চিকিৎসা এবং ২১০-২৩০ নং অনুচ্ছেদে মানসিক রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

সদৃশ বিধান মতে সর্বাপেক্ষা উপযোগী ঔষধ নির্বাচনের জন্য প্রথমতঃ রোগীলিপি নিয়ে রোগীর রোগের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করতে হবে। রোগের কারণ নির্ণয় করার পর সুস্থ মানবদেহে পরীক্ষিত ঔষধসমূহের পরীক্ষালব্ধ লক্ষণসমূহ হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকাতে লিপিবদ্ধ আছে তা হতে সর্বাধিক একটি ঔষধ নির্বাচন করতে হবে।

সদৃশ বিধান মতে সুনির্দিষ্ট অনুসন্ধানের জন্য অর্থাৎ চিকিৎসাধীন রোগের সদৃশ একটি কৃত্রিম রোগ সৃষ্টিকারী ঔষধ নির্বাচন করার জন্য পরিচিত ঔষধসমূহের সহিত প্রাকৃতিক রোগের সামগ্রিক লক্ষণসমূহের তুলনা করতে হলে রোগীর অধিকতর সুস্পষ্ট একক অনন্য এবং বিশেষ পরিচায়ক সংকেত ও লক্ষণসমূহের প্রতি বিশেষভাবে ও সর্বতোভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ আরোগ্য সাধনের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযোগী ঔষধ নির্বাচন করতে হলে বিশেষত এগুলোর সহিত নির্বাচিত ঔষধের লক্ষণসমূহের অত্যন্ত সাদৃশ্য থাকা বাঞ্ছনীয়।

৩৭। প্রশ্ন ঃ ঔষধ জনিত ব্যাধি বলতে কি বুঝ ? ১০

বা, ঔষধ জনিত রোগ বলতে কি বুঝ ? ১১

ঔষধজনিত ব্যাধি (Medicinal disease) ঃ

ঔষধ সৃষ্ট রোগ স্বাভাবিক রোগের বি-সদৃশ কাজেই চির রোগের সহিত একটি নতুন বি-সদৃশ চির প্রকৃতির কৃত্রিম রোগ যোগ হয়। এভাবে রোগী একটির স্থলে দুইটি রোগে আক্রান্ত হন। ফলে

রোগীর অবস্থা আরো বেশি জটিল হয়ে পড়ে। আরোগ্য সাধন দুঃসাধ্য হয়ে উঠে, অনেক সময় একেবারে অসাধ্য হয়ে যায়। আরো অনেক রোগী দেখা যায় সিফিলিসের সহিত, বিশেষতঃ সোরা অথবা আঁচিলযুক্ত গণোরিয়া সংযুক্ত হয়ে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়, তা দীর্ঘকাল ধরে বা বারম্বার অনুপযোগী পারদঘটিত ঔষধের বড়মাত্রা সেবনে আরোগ্য হয় না, অধিকিন্তু চির প্রকৃতির পারদঘটিত রোগের সাথে ইহা দেহতন্ত্রে স্বীয় আসন প্রতিষ্ঠা করে নেয়। ইতিমধ্যে পারদজনিত রোগটি ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইহার সাথে মিলিত হয়ে এভাবেই এক মারাত্মক জটিল রোগের সৃষ্টি হয়। তখন পর্যন্ত ইহা একেবারে অসাধ্য না হলেও সেসব রোগীদের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনা একান্ত কষ্টকর। এর ফলে জীবনী শক্তি কখনও কখনও অত্যন্ত বলহীন হয়ে পড়ে।

৩৮। প্রশ্ন ঃ হোমিওপ্যাথিক ঔষধজনিত বৃদ্ধি কি এবং ইহা রোগীর উপর কি প্রভাব বিস্তার করে ? ১৫

হোমিওপ্যাথিক ঔষধজনিত বৃদ্ধি ঃ

ঔষধের মাত্রা যথেষ্ট ক্ষুদ্র না হলে ঔষধ প্রয়োগের অব্যবহিত পরেই প্রথম ঘন্টায় বা কয়ক ঘন্টার জন্য রোগের সামান্য একটু বৃদ্ধি দেখা যায়। এই বৃদ্ধি মূল রোগের এত সদৃশ হয় যে রোগী মনে করেন ইহা তাঁর নিজ রোগেরই বৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু ইহা প্রকৃত পক্ষে মূল রোগ অপেক্ষা কিছু বেশী শক্তিশালী সদৃশ ঔষধজাত রোগ ছাড়া আর কিছুই নয়, তাকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধজনিত বৃদ্ধি বলে।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধজনিত বৃদ্ধি রোগীর উপর নিম্নরূপ প্রভাব বিস্তার করে ঃ হোমিওপ্যাথিক ঔষধজনিত বৃদ্ধি প্রকৃতপক্ষে মূলরোগের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হয়। ইহাতে রোগী রোগ প্রচন্ডভাবে বৃদ্ধি পায়, ফলে রোগী পূর্বের রোগ অবস্থা হতে আরও বেশি দুর্বল ও যন্ত্রণায় অত্যানুভূতি হয়ে পড়ে।

৩৮। প্রশ্নঃ সদৃশ বিধান মতে, প্রাকৃতিক রোগ কিভাবে আরোগ্য সাধিত হয়, আলোচনা কর। ১১

সদৃশ বিধান মতে প্রাকৃতিক রোগের আরোগ্য সাধন ঃ

আরোগ্যের বিশ্বজনীন নিয়ম "সিমিলিয়া সিমিলিবাস কিউরেন্টার" অর্থাৎ সদৃশ বিধান মতে আরোগ্য সাধন। সুস্থ মানবদেহে কোন ঔষধ প্রয়োগ করলে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় ঐ সমস্ত লক্ষণ বিশিষ্ট কোন রোগীতে সে ঔষধ সূক্ষ্মমাত্রায় প্রয়োগ করলে রোগী আরোগ্য লাভ করে। হোমিওপ্যাথিক আরোগ্যনীতি নিউটনের গতি বিষয়ক তৃতীয় সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ নীতিটি হল প্রতিটি ক্রিয়ার একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। সুস্থ জীবনীশক্তি যদি রোগশক্তি দ্বারা আক্রান্ত হয় তা হলে জীবনীশক্তির বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং বিভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ করে। ইহার নাম রোগ।

আবার সদৃশবিধান মতে সুস্থদেহে যদি ঔষধ প্রয়োগ করা হয় তা হলে ঔষধের রোগাৎপাদিকা শক্তি সজীব সত্ত্বার সংস্পর্শে এসে প্রাকৃতিক রোগের অনুরূপ অথচ প্রবলতর এক কৃত্রিম রোগ সৃষ্টি করে। যেহেতু সদৃশ বিধান মতে প্রয়োগকৃত ঔষধ শক্তিশালী তাই ঔষধ দ্বারা সৃষ্ট লক্ষণরাজিও প্রাকৃতিক রোগ লক্ষণ অপেক্ষা প্রবলতর হবে।

অতএব ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় যে প্রবলতর সদৃশ রোগ লক্ষণের দুর্বলতর লক্ষণগুলি বিলীন হয়ে যায়। দুর্বলতর রোগ লক্ষণসমূহ বিলীন হয়ে যাওয়ার পর জীবনীশক্তি রোগশক্তির প্রভাব মুক্ত হয় ঠিকই কিন্তু ঔষধ শক্তির প্রভাবে আচ্ছন্ন থাকে। যেহেতু ঔষধ সুক্ষ্মমাত্রায় প্রয়োগ হয় তাই ইহার ক্রিয়া যদিও প্রবলতর কিন্তু ক্রিয়াকাল ক্ষণস্থায়ী। ঔষধের ক্রিয়াকাল শেষ হলেই ঔষধজাত সমস্ত লক্ষণ তিরোহিত হয় এবং জীবনীশক্তি ইহার প্রভাব মুক্ত হয়ে সুস্থ হয়ে ওঠে। সুতরাং সদৃশ বিধান মতে আদর্শ আরোগ্য সাধিত হয়।

৩৯। প্রশ্ন ঃ ঔষধ সৃষ্ট কৃত্রিম রোগের চিকিৎসা কঠিন কেন ? ০৮
বা, ঔষধ সৃষ্ট রোগ আরোগ্য করা কঠিন কেন? ব্যাখ্যা কর। ১১
বা, ঔষধজাত চিররোগ বলতে কি বুঝ? এইগুলি সবচেয়ে দুশ্চিকিৎস্য কেন ?
বা, বিসদৃশ চিকিৎসার ফলাফল বর্ণনা কর। ১০

ঔষধ সৃষ্ট কৃত্রিম রোগের চিকিৎসা কঠিন/ঔষধ সৃষ্ট রোগ আরোগ্য করা কঠিন কারণ ঃ মানবদেহে প্রাকৃতিক রোগসমূহ পরস্পর মিলিত হয়ে যে জটিলতা সৃষ্টি করে তা অপেক্ষা দীর্ঘকাল ধরে অনুপযোগী ঔষধের দ্বারা অসঙ্গত চিকিৎসার ফলে যে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয় তার সংখ্যা অনেক বেশি। স্বাভাবিক রোগকে আরোগ্য করার জন্য অনুপযোগী ঔষধের বার বার প্রয়োগের ফলে তারই প্রকৃতি অনুযায়ী একটি নতুন, অনেক ক্ষেত্রে খুব কষ্ট সাধ্য রোগ প্রাকৃতিক রোগের সহিত মিলিত হয়। পরস্পরের মিলনে চির রোগটি জটিল হয়ে যায়। ঔষধ সৃষ্ট রোগ স্বাভাবিক রোগের বি-সদৃশ কাজেই চির রোগের সহিত একটি নতুন বি-সদৃশ চির প্রকৃতির কৃত্রিম রোগ যুক্ত হয়। এভাবে রোগী একটির স্থলে দুইটি রোগে আক্রান্ত হন। ফলে রোগীর অবস্থা আরো বেশি জটিল হয়ে পড়ে। আরোগ্য সাধন দুঃসাধ্য হয়ে উঠে, অনেক সময় একেবারে অসাধ্য হয়ে যায়। আরো অনেক রোগী দেখা যায় সিফিলিসের সাথে, বিশেষতঃ সোরা অথবা আঁচিলযুক্ত গণোরিয়া সংযুক্ত হয়ে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়, তা দীর্ঘকাল ধরে বা বারম্বার অনুপযোগী পারদঘটিত ঔষধের বড় মাত্রা সেবনে আরোগ্য হয় না, চির প্রকৃতির পারদঘটিত রোগের সাথে ইহা দেহতন্ত্রে স্বীয় আসন প্রতিষ্ঠা করে নেয়। ইতিমধ্যে পারদজনিত রোগটি ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইহার সাথে মিলিত হয়ে এভাবেই এক মারাত্মক জটিল রোগের সৃষ্টি হয়।

চিররোগের মধ্যে মানবের স্বাস্থ্যক্ষয়কারী এলোপ্যাথিক আরোগ্যভাণকারী প্রথায় সৃষ্টরোগ সমূহ সর্বাপেক্ষা শোচনীয় ও দূরারোগ্য। উহাদের মারাত্মক অবস্থাকে আরোগ্যসাধন করার জন্য কোন ঔষধ আবিষ্কার বা নির্বাচন করা দৃশ্যতঃ একান্ত দুঃসাধ্য।

দ্বাদশ অধ্যায়

সদৃশ- বৃদ্ধি- ঔষধজঃ রোগ

লক্ষণ বিকাশে তারতম্য ও সন্তাপপ্রবণতা ঃ অনুচ্ছেদ – ১১৬ - ১১৯

সর্বাপেক্ষা উপযোগী ও সুনির্দিষ্ট ঔষধ ঃ অনুচ্ছেদ ১৪৬-১৪৯

১। প্রশ্ন ঃ সন্তাপপ্রবণতা বলতে কি বুঝ ?

সন্তাপপ্ররণতা ঃ প্রত্যেক ভেষজেরই মানবদেহের নির্দিষ্ট কিছু বিকৃতি করার ক্ষমতা আছে। এই বিকৃতি দুটি জিনিষের উপর নির্ভরশীল ঃ

(i) ভেষজের স্বাভাবিক রোগ সৃষ্টি ক্ষমতা।

(ii) জীবনীশক্তির রোগ প্রবণতা।

জীবনীশক্তির রোগ প্রবণতা বা ব্যক্তিগত ধাতু প্রকৃতি বা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের জন্য কোন কোন ভেষজের কতকগুলি লক্ষণ ১০০% লোকের মধ্যেই প্রকাশিত হয়। কিছু কিছু লক্ষণ অধিকাংশ লোকের মধ্যে প্রকাশিত হয়। আর কতগুলো লক্ষণ মাত্র ২/১ জনের মধ্যে প্রকাশিত হয় বা অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশিত নাও হতে পারে। লক্ষণ প্রকাশের এই তারতম্যের জন্য যে ধাতুগত প্রকৃতি বা প্রবণতা দায়ী তাই সন্তাপপ্রবণতা। পরীক্ষাকালে দেখা গেছে কোন কোন ভেষজ কোন ব্যক্তির সুস্থ শরীরে নির্দিষ্ট একটি লক্ষণ সৃষ্টি করতে পারে নাই কিন্তু ঐ ব্যক্তির অসুস্থবস্থায় ঐ নির্দিষ্ট লক্ষণ দেখা দিলে ঐ ঔষধটি প্রয়োগ করলে রোগী সুস্থ হয়ে যায়। পডোফাইলামের পরীক্ষাকালে ফুসফুসের কোন প্রদাহ পাওয়া যায় নাই বলে মেটেরিয়া মেডিকাতে ফুসফুস প্রদাহের উল্লেখ নাই। কিন্তু পরবর্তিতে দেখা গেয়েছে সদৃশ নিয়মে ফুসফুস প্রদাহে পডোফাইলাম আরোগ্য হয়।

২। প্রশ্ন ঃ ঔষধের মুখ্য ও গৌণ ক্রিয়া বলতে কি বুঝ? উদাহরণসহ লিখ?

ঔষধের মুখ্য ক্রিয়া (Primary action) ঃ

প্রতিটি ঔষধ জীবনীশক্তির উপর কার্যকর অর্থাৎ ব্যক্তিকে ঔষধ প্রয়োগ করলে তা কিছু সময়ের জন্য জীবনীশক্তিকে বিকৃত করে, স্বাস্থ্যের পরিবর্তন ঘটায় এরই নাম ঔষধের মুখ্যক্রিয়া বা প্রাথমিক ক্রিয়া। জীবনীশক্তি কর্তৃক ঔষধ গ্রহণ করে নেয়াটাই হলো ঔষধের মুখ্য ক্রিয়া। যেমন- গরম পানিতে একটি হাত ডুবালে, প্রথমে (প্রাথমিক ক্রিয়া ফলে) সে হাতটি অন্য হাত অপেক্ষা বেশী গরম হয় কিন্তু পরক্ষণেই গরম পানি হতে হাতটি তুলে মুছে শুষ্ক করলে, অল্পক্ষণের মধ্যেই তা ক্রমশঃ যে হাতটি পানিতে ডুবান হয় নাই তা অপেক্ষা খুব বেশী ঠান্ডা বলে বোধ হয়। (গৌণ ক্রিয়া)

ঔষধের গৌণ ক্রিয়া (Secondary action) ঃ

ঔষধ গ্রহন করার পর জীবনীশক্তি ঔষধের ক্রিয়ার বিরুদ্ধে স্বীয় প্রভাব প্রয়োগ করে। এ প্রতিরোধ ক্রিয়া আমাদের জীবন রক্ষাকারী শক্তির নিজেস্ব ক্ষমতা এবং এটা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সম্পাদিত হয় তখন তাকে ঔষধের গৌণ ক্রিয়া (Secondary action) বলে। যেমন- কফি সেবনে প্রথমতঃ খুব ফূর্তি ঘটে (মুখ্যক্রিয়া) কিন্তু পরে অবসাদ উপস্থিত হয় (গৌণ ক্রিয়া)।

৩। প্রশ্ন ঃ গৌণ ক্রিয়া বলতে কি বুঝ ? উদাহরণসহ লিখ ?

ঔষধের গৌণ ক্রিয়া (Secondary action) ঃ

ঔষধ গ্রহন করার পর জীবনীশক্তি ঔষধের ক্রিয়ার বিরুদ্ধে স্বীয় প্রভাব প্রয়োগ করে। এ প্রতিরোধ ক্রিয়া আমাদের জীবন রক্ষাকারী শক্তির নিজস্ব ক্ষমতা এবং এটা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সম্পাদিত হয়, তখন তাকে ঔষধের গৌণক্রিয়া বলে। যেমন- কফি সেবনে প্রথমত: খুব ফূর্তি ঘটে (মুখ্যক্রিয়া) কিন্তু পরে অবসাদ উপস্থিত হয় (গৌণ ক্রিয়া)।

৪। প্রশ্ন ঃ ঔষধের মুখ্য ক্রিয়া বলিতে কি বুঝ ? উদাহরণসহ লিখ ? ১২

ঔষধের মুখ্য ক্রিয়া (Primary action) ঃ প্রতিটি ঔষধ জীবনীশক্তির উপর কার্যকর অর্থাৎ ব্যক্তিকে ঔষধ প্রয়োগ করলে তা কিছু সময়ের জন্য জীবনীশক্তিকে বিকৃত করে, স্বাস্থ্যের পরিবর্তন ঘটায় এরই নাম ঔষধের মুখ্যক্রিয়া বা প্রাথমিক ক্রিয়া। জীবনীশক্তি কর্তৃক ঔষধ গ্রহণ করে নেয়াটাই হলো ঔষধের মুখ্যক্রিয়া। যেমন- গরম পানিতে একটি হাত ডুবালে, প্রথমে (প্রাথমিক ক্রিয়াফলে) সে হাতটি অন্য হাত অপেক্ষা বেশী গরম হয় কিন্তু পরক্ষণেই গরম পানি হতে হাতটি তুলে মুছে শুষ্ক করলে, অল্পক্ষণের মধ্যেই তা ক্রমশঃ যে হাতটি পানিতে ডুবানো হয় নাই তা অপেক্ষা খুব বেশী ঠান্ডা বলে বোধ হয়। (গৌণ ক্রিয়া)

৫। প্রশ্ন ঃ ঔষধের পর্যায়শীল ক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা কর। ০৮, ১০, ১২

ঔষধের পর্যায়শীল ক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা (Alternating action) ঃ

ঔষধের পর্যায়শীল ক্রিয়া (পর্যায়ক্রমিক ক্রিয়া) সম্বন্ধে ডাঃ হ্যানিম্যান অর্গানন অব মেডিসিনের ১১৫নং অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

তাঁর মতে, এ সমস্ত লক্ষণরাজীর মধ্যে কতগুলি ভেষজের ক্ষেত্রে এমন অনেক লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় যে গুলি আংশিকভাবে বা কোন বিশেষ অবস্থায় পূর্ববর্তী বা পরবর্তী লক্ষণসমূহের ঠিক বিপরীত কিন্তু সেজন্য তাদের বাস্তবিক গৌণক্রিয়া বা জীবনী শক্তির প্রতিক্রিয়া বলে ধরা উচিত নয়। তার প্রাথমিক ক্রিয়ারই ক্রমাগত পরিবর্তনশীল বা বিভিন্ন উচ্ছ্বাসময় বিপরীত অবস্থা। তাদেরকে পর্যায়ক্রমিক ক্রিয়া বলা হয়। প্রাথমিক ক্রিয়াগত লক্ষণগুলির মধ্যে এমন অনেক লক্ষণ দেখা যায়, যারা পূর্বে বা পরে লক্ষিত লক্ষণসমূহের ঠিক বিপরীত। যেমন ব্রাইওনিয়া, এপিস প্রভৃতি ঔষধের কখনও তৃষ্ণাহীনতা, কখনও বা অতিরিক্ত তৃষ্ণা দেখা যায়।

৬। প্রশ্ন ঃ বহুদিন স্থায়ী রোগসমূহ আরোগ্য করতে অধিক সময়ের প্রয়োজন হয় কেন? বর্ণনা কর।

বহুদিন স্থায়ী রোগসমূহ আরোগ্য করতে অধিক সময়ের প্রয়োজন কারণ নিম্নরূপ ঃ বহুদিন স্থায়ী চিররোগসমূহের জটিল প্রকৃতির রোগসমূহের আরোগ্য বিধানের জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়। বিশেষতঃ এল্যোপ্যাথিক চিকিৎসায় অনারোগ্য ও তার কুফল অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়। বিশেষত এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় অনারোগ্য ও তার কুফল সংযুক্ত প্রাকৃতিক রোগসমূহ আরোগ্যের জন্য আরো অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়ে থাকে। প্রচন্ডভাবে কার্যকর ঔষধসমূহ দীর্ঘকাল ধরে বড় মাত্রায় প্রয়োগ করা হয়। অনুপযোগী খনিজ পদার্থ মিশ্রিত জলে স্নান করানো হয়। এরূপ এলোপ্যাথিক চিকিৎসার তথাকথিত পদ্ধতির মুখ্য কৌশল অবলম্বন করার ফলে এই রোগসমূহ বাস্তবিক পথে প্রায়ই আরোগ্যের বাইরে চলে যায়।

৭। প্রশ্ন ঃ পর্যাক্রমিক ক্রিয়া এবং গৌণ প্রতিক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য কি?১৫

পর্যাক্রমিক ক্রিয়া এবং গৌণ প্রতিক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য ঃ

পর্যাক্রমিক ক্রিয়া ঃ কতগুলি ভেষজের ক্ষেত্রে এমন অনেক লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় যেগুলি আংশিকভাবে বা কোন বিশেষ অবস্থায় অগ্রবর্তী বা পরবর্তী প্রকাশিত লক্ষণের সম্পূর্ণ বিপরীত। এরূপ লক্ষণকে কখনও গৌণক্রিয়া বা জীবনীশক্তির প্রতিক্রিয়া নয়। উপরন্তু সেগুলি প্রাথমিক ক্রিয়াই বিভিন্ন উচ্ছ্বাসময় বিপরীত অবস্থা। উহাদেরকে পর্যায়ক্রমিক ক্রিয়া বলা হয়। যেমন-পডোফাইলামের সকালে উদরাময় এবং বিকালে কোষ্ঠবদ্ধতা পর্যায়ক্রমে দেখা যায়।

গৌণ প্রতিক্রিয়া ঃ ঔষধ গ্রহন করার পর জীবনীশক্তি ঔষধের ক্রিয়ার বিরুদ্ধে স্বীয় প্রভাব প্রয়োগ করে। এ প্রতিরোধ ক্রিয়া আমাদের জীবন রক্ষাকারী শক্তির নিজস্ব ক্ষমতা এবং এটা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সম্পাদিত হয়, তখন তাকে ঔষধের গৌণক্রিয়া বলে। যেমন- কফি সেবনে প্রথমত: খুব ফূর্তি ঘটে (মুখ্যক্রিয়া) কিন্তু পরে অবসাদ উপস্থিত হয় (গৌণ প্রতিক্রিয়া)।

ত্রয়োদশ অধ্যায়
ঔষধের প্রয়োগ, মাত্রা ও শক্তি

১। প্রশ্ন ঃ ঘ্রাণে ঔষধ কি? কখন ঘ্রাণে ঔষধ প্রয়োগ করা হয়?

ঘ্রাণে ঔষধ ঃ মহাত্মা হ্যানিম্যান অর্গানন অব মেডিসিনের ২৮৪ নং অনুচ্ছেদে ঘ্রাণে ঔষধ প্রয়োগের কথা বলেছেন। ঘ্রাণে ঔষধ প্রয়োগ বলতে বুঝায় নাক দিয়ে তরল ঔষধের ঘ্রাণ নেয়া এবং শ্বাস গ্রহন করা। অথবা কোন রোগী যখন অচেতন অবস্থায় বা স্পর্শকাতর অবস্থায় থাকে তখন রোগীকে মুখের মাধ্যমে না দিয়ে ঘ্রাণের মাধ্যমে দেয়া হয়। দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর কোন রোগী দুর্বল হয়ে পড়লে সে রোগী যদি স্নায়ুবিক প্রবণ হয় তবে এই সকল রোগীর সামান্য মাত্রার ঔষধের প্রতিক্রিয়াও সহ্য করতে পারে না। এ সকল রোগীর ক্ষেত্রে ঘ্রাণে ঔষধ প্রয়োগ করা হয়।

২। প্রশ্ন ঃ ক্ষুদ্রতম মাত্রা কি? হোমিওপ্যাথিতে ক্ষুদ্রতম মাত্রার গুরুত্ব লিখ?

বা "সূক্ষ্ম মাত্রা অধিক কার্যকর"-ব্যাখ্যা কর।

ক্ষুদ্রতম মাত্রা ঃ

একই আকৃতির ১০০টা অনুবটিকা ওজন এক গ্রেণ হয়, এমন একটা অনুবটিকা শক্তিকৃত ঔষধের দ্বারা ঔষধিকৃত করে, ইহাকে মাত্রা হিসাবে রোগীকে সেবন করতে দেয়াকে, ক্ষুদ্রতম বা সূক্ষ্মমাত্রা বলে।

মহাত্মা ডাঃ হ্যানিম্যান বলেছেন যে, এক ফোঁটা ঔষধ ৫০০টির বেশি অনুবটিকাকে সিক্ত করে ব্লটিং পেপারে শুকিয়ে নিলে এর একটি অনুবটিকা যে টুকু ঔষধ ধারণ করতে পারে, তাকে সূক্ষ্ম বা ক্ষুদ্রতম মাত্রা বলে।

হোমিওপ্যাথিতে ক্ষুদ্রতম মাত্রার গুরুত্ব/"সূক্ষ্ম মাত্রা অধিক কার্যকর" ঃ

হোমিওপ্যাথির অন্যতম নীতি হচ্ছে সদৃশ নিয়মে চিকিৎসা পদ্ধতি। সদৃশ লক্ষণ মতে সদৃশ লক্ষণ সম্পন্ন রোগে সদৃশ ঔষধ দ্বারা রোগারোগ্য করতে হলে ঔষধের অতি সূক্ষ্ম মাত্রাই প্রয়োজন হয়ে থাকে। উচ্চ শক্তি সম্পন্ন ঔষধ, মাত্রা ক্ষুদ্র হওয়ায়, ঔষধের প্রভাব শরীর হতে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দূরীভূত হয়ে যায়। ক্ষুদ্রতম মাত্রার ঔষধ ব্যবহার করার অর্থই হল সদৃশ লক্ষণ মতে ব্যবহার করার পর ঔষধশক্তি রোগশক্তির স্থানসমূহ দখল করে এবং রোগশক্তিকে দূরীভূত করায় পর ঔষধশক্তির প্রাবল্যতা দেহের অর্গানসমূহের মধ্যে তখনও স্বল্প সময়ের জন্য থাকে। ক্ষুদ্রতম মাত্রা দেয়ার কারণে ঔষধের স্থিতিকাল ও আক্রান্ত কোষ বা টিস্যুসমূহকে স্বল্প সময়ের জন্য প্রভাবিত করে। মাত্রা যত ক্ষুদ্র হবে হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি তত সামান্য ও ক্ষণস্থায়ী হবে। বৃহৎমাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করলে ইহার ক্রিয়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, ফলে রোগী দুর্বল হয় ও রোগারোগ্য হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি বেশি হয়।

সুতরাং মহাত্মা ডাঃ হ্যানিম্যানের মতে, আর্দশ আরোগ্য করতে হলে, ক্ষুদ্রতম মাত্রা ব্যবহার করতে হবে। অতএব, হোমিওপ্যাথিতে ক্ষুদ্রতম মাত্রায় প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম।

৩। প্রশ্ন ঃ কখন আংশিক সদৃশ ঔষধ প্রয়োগ করতে হয় ?

আংশিক সদৃশ ঔষধ প্রয়োগ করার সময় ঃ

মহাত্মা ডাঃ হ্যানিম্যান কর্তৃক আবিষ্কৃত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি লক্ষণ ভিত্তিক চিকিৎসা ব্যবস্থা। যখন কোন রোগীর পরিপূর্ণ লক্ষণ পাওয়া না যায় বা প্রয়োজনের তুলনায় অতি অল্প সংখক লক্ষণ পাওয়া যা সদৃশ বিধান মতে রোগারোগ্যের জন্য ঔষধের লক্ষণের সাথে রোগীর রোগ লক্ষণের আংশিক মিল পাওয়া যায়, তখন আংশিক সদৃশ ঔষধ প্রয়োগ করতে হয়।

৪। প্রশ্ন ঃ স্থূলমাত্রার ঔষধের কুফলগুলি উল্লেখ কর ?
বা, বৃহৎমাত্রা ব্যবহারের ফলাফল আলোচনা কর।
বা, স্থূলমাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ সঠিক নহে কেন ?
স্থূলমাত্রার ঔষধের কুফলসমূহ নিম্নরূপ ঃ

স্থূলমাত্রার ঔষধের কুফলসমূহ বা বৃহৎমাত্রা ব্যবহারের ফলাফল নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

(i) স্থূলমাত্রার ঔষধ প্রয়োগের ফলে সদৃশ লক্ষণ হলেও রোগীর মধ্যে ঔষধের পরিমাণ বেশি মাত্রায় হওয়ার কারণে লক্ষণ বৃদ্ধি পায়, একে হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি বলে।

(ii) স্থূলমাত্রার ঔষধের ব্যবহারের কারণে ইহার ক্রিয়া দীর্ঘকাল থাকার ফলে রোগীকে অত্যন্ত দুর্বল করে ফেলে।

(iii) স্থূলমাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করলে ঔষধের প্রাথমিক বা মুখ্য ক্রিয়ায় কিছুটা উপশম হলেও গৌণ বা জীবনীশক্তির প্রতিক্রিয়ার কুফলে রোগী আরও অধিকতর ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

(iv) ঔষধ নির্বাচন সঠিক হলেও স্থূলমাত্রার কারণে ঔষধজ রোগে রোগীর জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনে।

(v) শক্তিকৃত হোমিওপ্যাথি ঔষধ বড় মাত্রায় প্রয়োগের ফলে ইহার তীব্রতা রোগীর মৃত্যু হতে পারে।

উপরিউক্ত বর্ণনা হতে ইহার প্রতীয়মান হয় যে, স্থূলমাত্রার ঔষধ বিশেষ কোন অর্গান বা দেহের বৃহৎ স্নায়ুতন্ত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে রোগীর প্রচন্ড ক্ষতিসাধন করে।

৫। প্রশ্ন ঃ একক মাত্রা কাকে বলে ? একক মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগের উপকারিতা কি ?
বা একবারে একমাত্রা কেন প্রয়োগ করা হয় ?
একক মাত্রা এর সংজ্ঞা ঃ

একক মাত্রা সম্পর্কে বিভিন্ন চিকিৎসক বিভিন্ন মতামত পোষণ করেন। সাধারণতঃ কোন রোগী বা প্রুভারদেরকে একবার যতটুকু ঔষধ প্রয়োগ করা হয়, তাকে একক মাত্রা বলা হয়। অর্গানন অব মেডিসিন গ্রন্থের ৬ষ্ঠ সংস্করণে এসে ডাঃ হ্যানিম্যান একক মাত্রার পরিমাণ নতুন শক্তিকরণ পদ্ধতির (সহস্রতামিক পদ্ধতির) ঔষধের দ্বারা ঔষধিকৃত $\frac{১}{১০০}$ গ্রেণ আকৃতির একটি অনুবটিকা হবে বলে উল্লেখ করেন। অর্থাৎ একই আকৃতির ১০০টা অনুবটিকার ওজন ১ গ্রেণ হয়, এমন একটা অনুবটিকা এ ঔষধের দ্বারা ঔষধিকৃত করলে এটা এককমাত্রা হবে বলে নির্দেশ করেন।

একক মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগের উপকারিতা ঃ

রোগীর জন্য সুনির্বাচিত ঔষধ সব সময় একবারে একটা মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে। ইহার হোমিওপ্যাথির অন্যতম নিয়মনীতি। ঔষধ একবারে একটা করে মাত্রায় প্রয়োগ করলে তা অত্যন্ত কার্যকরী হয়। অর্গানন অব মেডিসিন গ্রন্থের ৬ষ্ঠ সংস্করণে মতে একটা মাত্রাকে পানিতে গুলে বিভক্ত করে প্রত্যেকবার প্রয়োগের পূর্বে ৮ থেকে ১২ বার সজোরে ঝাঁকি দিয়ে পরিবর্তিত মাত্রায় প্রয়োগ করা হয়, তবে তা আরও বেশি কার্যকরী হয়। ঔষধকে পরিবর্তিত একক মাত্রায় প্রয়োগ করলে মাত্রাটা আরও অনেক সূক্ষ্ম হয়। যে কোন ঔষধ রোগীর লক্ষণের সাথে যত বেশি সদৃশ লক্ষণ সম্পন্ন হয় ও এর মাত্রা যত বেশি ক্ষুদ্র বা সূক্ষ্ম হবে, ততই দ্রুত আরোগ্যকারী পরিবর্তন পাওয়া যায়। এজন্য ঔষধকে একক মাত্রায় প্রয়োগ করতে হয়।

উপরিউক্ত আলোচনা হতে ইহাই প্রতীয়মান যে, হোমিওপ্যাথির অন্যতম অনন্য নিয়মনীতি একক মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ। সুতরাং একক মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগের উপকারিতা সুদূরপ্রসারী।

৬। প্রশ্ন ঃ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় শক্তিকৃত ঔষধ ব্যবহার করা হয় কেন ?
বা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় শক্তিকৃত ঔষধের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় শক্তিকৃত ঔষধ ব্যবহার করা হয় কারণ ঃ

ডাঃ স্যামুয়েল হ্যানিম্যান "অর্গানন অব মেডিসিন" গ্রন্থে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় শক্তিকৃত ঔষধ ব্যবহার সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

রোগ সম্বন্ধে হোমিওপ্যাথিতে যে ধারণা পোষণ করা হয়, তা হলো রোগ অশুভ প্রাকৃতিক সূক্ষ্ম শক্তি। বিশ্বজনীন প্রাকৃতিক আরোগ্যনীতি হল "Similia Similibus Curentur" অর্থাৎ সদৃশ বিধানে আরোগ্য সাধন। সুস্থ মানবদেহে কোন ভেষজ প্রয়োগ করলে যে লক্ষণ প্রকাশ পায় সে সমস্ত লক্ষণ বিশিষ্ট কোন রোগীতে উক্ত ভেষজকে ফার্মাকোপিয়ার মতে সূক্ষ্ম ঔষধে রূপান্তরিত করে সূক্ষ্মমাত্রায় প্রয়োগ করলে রোগী আরোগ্য লাভ করে। তাই ভেষজকে ফার্মাকোপিয়ার নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় শক্তিকৃত করে ঔষধে রূপান্তর করতে হয়। ঔষধের ভেষজ অংশ যতই পরিমাণে কম হবে তার শক্তি বিকাশ ততই প্রবল হবে। সদৃশ বিধান মতে প্রয়োগকৃত ঔষধের শক্তি রোগশক্তি অপেক্ষা শক্তিশালী, তাই ঔষধ দ্বারা সৃষ্ট লক্ষণাবলীও প্রাকৃতিক রোগলক্ষণ অপেক্ষা প্রবলতর হবে।

সুতরাং প্রতিটি জীবন্ত মানব শরীরে ঔষধের দ্বারা সব সময়ে নিশ্চিতভাবে আক্রান্ত ও অভিভূত হতে বাধ্য। কিন্তু প্রকৃতিতে রোগের দ্বারা কোন সময়েই এরূপ হতে পারে না। রোগ সৃষ্টিকারী ক্ষতিকর উপাদানসমূহের দ্বারা মানবের সুস্থ শরীরকে অসুস্থ করার শক্তি গৌণ ও শর্তসাপেক্ষ এমন কি একান্ত শর্তসাপেক্ষ। কিন্তু ভেষজ পদার্থের শক্তি সম্পূর্ন শর্তহীন এমন কি পূর্বোক্ত শক্তি অপেক্ষা অনেক বেশি শক্তিশালী। সজীব দেহে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম রোগ একসাথে দুইটি

রোগের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে প্রাকৃতিক দুর্বলতর রোগ লক্ষণগুলি দুরীভূত হয়।

সুতরাং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎয়া শক্তিকৃত ঔষধ ব্যবহার করা

৭। প্রশ্ন ঃ কেন একবার একটিমাত্র ঔষধ প্রয়োগ করা উচিৎ ? ১০
বা, চিকিৎসা ক্ষেত্রে একক ঔষধ ব্যবহারের গুরুত্ব লিখ। ১২, ১৬, ১৭

নিম্নলিখিত কারণে একবার একটিমাত্র ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত ঃ

ডাঃ হ্যানিম্যান তাঁর বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আইন "অর্গানন অব মেডিসিন" গ্রন্থে আদর্শ চিকিৎসকের বৈশিষ্ট্য, লক্ষ্য, গুণাবলী এবং রোগ ও রোগী, ঔষধ প্রস্তুত প্রয়োগ, আরোগ্য পথে বাধা বিভিন্ন ধরণের রোগ চিকিৎসা পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে প্রাকৃতিক আরোগ্যনীতি- সিমিলিয়া সিমিলিবাস কিউরেন্টার অর্থাৎ সদৃশ দ্বারা সদৃশ আরোগ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

হোমিওপ্যাথিতে ঔষধ প্রুভ হয়েছে এককভাবে সুস্থ, শিক্ষিত সৎ আদর্শবান ব্যক্তির উপর। ইহাতে প্রতিটি ঔষধের সুনির্দিষ্ট লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে। প্রয়োগনীতি হল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও বস্তুস্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে ঔষধ নির্বাচন করা। অর্থাৎ ব্যক্তিগত রোগীর রোগচিত্রের অনুরূপ ঔষধের একটি কৃত্রিম রোগচিত্র অনুসারে ঔষধ প্রয়োগ করা। হোমিওপ্যাথিক অনন্য বিধান, বস্তু ও ব্যক্তি স্বতন্ত্র্যতার কারণে একাধিক ঔষধ কখনও সদৃশ্য হতে পারে না। দুইটি ঔষধ একত্রে প্রয়োগ করলে উভয়ের ক্রিয়ার মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠে। হোমিওপ্যাথির নিয়মনীতি অনুসারে কখনও দুইটি ঔষধ একত্রে পরিক্ষিত হয় নাই। সুতরাং আকাঙ্খিত আর্দশ আরোগ্য আশা করা যায় না।

অতএব উপরিউক্ত কারণে একবার একটিমাত্র ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত।

৮। প্রশ্ন ঃ শক্তি কি ? শক্তি ও মাত্রার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। ০৯, ১১, ১৩
বা, ঔষধের মাত্রা ও শক্তির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।

শক্তি ও মাত্রার মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ ঃ

শক্তি		মাত্রা
হোমিওপ্যাথিক ফার্মাকোপিয়ার নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার অনুসারে মূল আরককে (ধাতব বা কঠিন জাতীয় পদার্থকে) দুগ্ধ শর্করা সহযোগে বিচূর্ণ করে সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর অংশে বিভাজিত করা এবং মূল আরককে তরল ভেষজবহ সহযোগে সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতম অংশে বিভাজিত করার পদ্ধতিকে শক্তিকরণ বলে। আর সূক্ষ্মতম অংশে বিভাজিত করা অংশকে ঔষধের শক্তি বলে।	১	Posos গ্রীক শব্দটি হতে উৎপন্ন Dose যার অর্থ হল পরিমাণ। মাত্রা বলতে ঔষধের পরিমাণকে বুঝায়। সাধারণতঃ কোন রোগীকে একবার যতটুকু ঔষধ প্রয়োগ করা হয়, তাকে মাত্রা বলে।
বিচূর্ণ বা সাক্কাশন পদ্ধতির মাধ্যমে ঔষধের শক্তির সৃষ্টি করা হয়। যেমন- দশমিক পদ্ধতিতে 1X, শততমিক-১, সহস্রতমিক পদ্ধতিতে-M/১ ইত্যাদি।	২	ভেষজ ও ভেষজবহের সংমিশ্রণের ঔষধের মাত্রা তৈরী করা হয়। যেমন- ১টি ১০ নং অনুবটিকা, ১ গ্রেণ, ১ ফোঁটা ইত্যাদি।
ঘর্ষণ, ঝাঁকির মাধ্যমে ঔষধের শক্তি পরিবর্তন করা হয়।	৩	শক্তিকৃত ঔষধের সাথে ভেষজবহের পরিমাণ বাড়িয়ে ঔষধের মাত্রা তৈরী করা হয়।
ইহাতে ঔষধের শক্তি যত বাড়তে থাকে সেই অনুপাতে ভেষজ পদার্থের পরিমাণ তত কমতে থাকে।	৪	ইহাতে ঔষধের শক্তির সাথে ভেষজবহের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

৯। প্রশ্ন ঃ হোমিওপ্যাথিতে একাধিক ঔষধ প্রয়োগ করা হয় না কেন?

হোমিওপ্যাথিতে একাধিক ঔষধ প্রয়োগ না হওয়ার কারণ ঃ

ডাঃ হ্যানিম্যান তাঁর বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আইন "অর্গানন অব মেডিসিন" গ্রন্থে আদর্শ চিকিৎসকের বৈশিষ্ট্য, লক্ষ্য গুণাবলী এবং রোগ ও রোগী, ঔষধ প্রস্তুত প্রয়োগ, আরোগ্য পথে বাধা, বিভিন্ন ধরণের রোগী চিকিৎসা পদ্ধতিসমূহ বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে প্রাকৃতিক আরোগ্যনীতি- সিমিলিয়া সিমিলিবাস কিউরেন্টার অর্থাৎ সদৃশ দ্বারা সদৃশ আরোগ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

হোমিওপ্যাথিতে ঔষধ প্রুভ হয়েছে এককভাবে সুস্থ, শিক্ষিত সৎ আদর্শবান ব্যক্তির উপর। ইহাতে প্রতিটি ঔষধের সুনির্দিষ্ট লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে। প্রয়োগনীতি হল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও বস্তুস্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে ঔষধ নির্বাচন অর্থাৎ ব্যক্তিগত রোগীর রোগচিত্রের অনুরূপ ঔষধের একটি কৃত্রিম রোগচিত্র অনুসারে ঔষধ প্রয়োগ করা হোমিওপ্যাথিক অনন্য বিধান, বস্তু ও ব্যক্তি স্বতন্ত্র্যতার কারণে একাধিক ঔষধ কখনও সদৃশ্য হতে পারে না। দুইটি ঔষধ একত্রে প্রয়োগ করলে উভয়ের ক্রিয়ার মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠে। সুতরাং আকাঙ্খিত আরোগ্য আশা করা যায় না।

অতএব হোমিওপ্যাথিতে একাধিক ঔষধ প্রয়োগ করা হয় না।

চতুর্দশ অধ্যায়
ব্যবস্থাপত্র (Prescription)

১। প্রশ্ন ঃ ব্যবস্থাপত্র কাকে বলে ? ব্যবস্থাপত্রের কয়টি অংশ ও কি কি?

ব্যবস্থাপত্র (Prescription) ঃ

চিকিৎসক রোগীর নিজের বর্ণনা, আপনজনের বর্ণনা, সেবাকারীর বর্ণনা হতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ সমষ্টি ও এ লক্ষণগুলো কারণের গুরুত্ব অনুসারে এবং চিকিৎসক স্বয়ং রোগীর স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করে রোগের বিষয় অবগত হয়ে রোগীর আরোগ্য উপযোগী মনে করে রোগীলিপি অনুযায়ী যে সদৃশতম ঔষধ নির্বাচন করে সেবন করার জন্য লিখিত নির্দেশ প্রদান করেন, তাকেই ব্যবস্থাপত্র বলে।

ব্যবস্থাপত্রের অংশ ঃ ব্যবস্থাপত্রের অংশ ৪টি। যথা-

(i) সুপারস্ক্রিপশন (Superscription)
(ii) ইন্সক্রিপশন (Inscription)
(iii) সাবস্ক্রিপশন (Subscription)
(iv) সিগনেচার (Signature)

(i) সুপারস্ক্রিপশন (Superscription) ঃ ইহাতে রোগীর নাম, বয়স, ঠিকানা প্রভৃতি উল্লেখ থাকে। এ অংশের পর ব্যবস্থাপত্র লেখার সময়ে প্রথমে Rx লেখা হয়।

(ii) ইন্সক্রিপশন (Inscription) ঃ ব্যবস্থাপত্রের এ অংশে ঔষধের নাম, শক্তি ও পরিমাণ এবং ভেষজের নাম ও পরিমাণ উল্লেখ করা থাকে।

(iii) সাবস্ক্রিপশন (Subscription) ঃ এ অংশে কম্পাউন্ডারকে নির্দেশ প্রদান করা হয়, যাতে কম্পাউন্ডার সেই মোতাবেক ঔষধ তৈরী করবে।

(iv) সিগনেচার (Signature) ঃ এ অংশে রোগীর প্রতি নির্দেশ থাকে কখন ঔষধ সেবন করতে হবে। কি পরিমাণে সেবন করতে হবে এবং পরবর্তী সময়ে কতদিন পর রোগীকে দেখা করতে হবে প্রভৃতির নির্দেশ থাকে। পরে চিকিৎসকের স্বাক্ষরসহ রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও তারিখ লেখা হয়।

২। প্রশ্ন ঃ ব্যবস্থাপত্রের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর। ১১

ব্যবস্থাপত্রের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা ঃ

(i) হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে রোগীর লক্ষণসমষ্টি ও অসুস্থতার কারণের প্রাধান্য অনুসারে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বা অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণসমষ্টির সাথে যে ঔষধের লক্ষণের বেশি সাদৃশ আছে তা প্রয়োগ করতে হবে।

(ii) লক্ষণ সমষ্টি যদি ব্যবস্থাপত্রের সময় ব্যবহারিত ঔষধের লক্ষণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়, তবে ঐ ঔষধকেই উচ্চতর শক্তি ও পরিবর্তিত সূক্ষ্ম মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।

(iii) এভাবে অবস্থা বিশেষে ঔষধের শক্তি ও মাত্রার পরিবর্তন করে এবং লক্ষণ সাদৃশ্যে এক সময় একটা করে ঔষধ প্রয়োগ করে রোগীকে সামগ্রীকভাবে আরোগ্য করতে হবে।

(iv) ব্যবস্থাপত্রে আদর্শ আরোগ্যের জন্য রোগীকে প্রদত্ত ঔষধের নাম, শক্তি ও মাত্রা এবং কোন ভেষজবহের সাথে ঔষধ সংমিশ্রন করে ঔষধ তৈরী করা হবে তার নির্দেশনা থাকে। কম্পাউন্ডারের প্রতি নির্দেশনা থাকে, কিভাবে রোগীর সেবন উপযোগী ঔষধ তৈরী করা যায়।

(v) রোগীর প্রতি নির্দেশনা থাকে কিভাবে ও কখন ঔষধ সেবন করবেন এবং কত দিন পরে ডাক্তারের সাথে দেখা করবেন।

(vi) সর্বশেষে চিকিৎসকের স্বাক্ষরসহ রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ও তারিখ লেখা হয়।

উপরিউক্ত আলোচনা হতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে রোগীর চিকিৎসায় ব্যবস্থাপত্রের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

৩। প্রশ্ন ঃ একটি ব্যবস্থাপত্রের নমুনা লিখ।
বা, ক্যান্থারিসের রোগীর একটি ব্যবস্থাপত্র তৈরি কর। ১৩
একটি ব্যবস্থাপত্রের নমুনা নিম্নরূপ/ ক্যান্থারিসের রোগীর একটি ব্যবস্থাপত্র ঃ

সুপারস্ক্রিপশন	রোগীর নাম............. বয়স.... পুরুষ/মহিলা....... ঠিকানা.................ধর্ম.......বৈবাহিক অবস্থা ...... Rx
ইনস্ক্রিপশন	ক্যান্থারিস ২০০ শক্তি ১ ফোঁটা ১ আউন্স ডিস্টিল ওয়াটার মধ্যে নাও।
সাবস্ক্রিপশন	১ ফোঁটা ২০০ শক্তির ক্যান্থারিস ১ আউন্স ডিষ্টিল ওয়াটার এর সাথে মিশ্রিত করে ৬ দাগ করে দাও।
সিগনেচার	প্রতিদিন সকালে খাওয়ার আগে সেবন করবেন। ৭ দিন পর পুনঃরায় দেখা করতে হবে। স্বাক্ষর ঃ রেজি নং- তারিখ ঃ

৪। প্রশ্ন ঃ দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র সম্পর্কে আলোচনা কর। ১০, ১১, ১৩
অথবা কখন দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র করতে হয় ?
বা, দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র কি? কখন ইহার প্রয়োজন হয় ? ১৪, ১৬, ১৭
দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র সম্পর্কে বর্ণনা ঃ

প্রথম ব্যবস্থাপত্র করার পর রোগীর লক্ষণগুলোর ভিতরে যে সব পরিবর্তন পাওয়া যায়, উহার অবস্থা অনুসারে অবশিষ্ট লক্ষণসমষ্টি সাদৃশ্যে একটি ঔষধ নির্বাচন করতে হবে। কিন্তু এ লক্ষণগুলোর সাথে যদি একাধিক ঔষধের আংশিক সাদৃশ্য থাকে, তবে রোগীর লক্ষণসমষ্টি ও অসুস্থ্যতার কারণের প্রাধান্য অনুসারে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বা অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণসমষ্টির সাথে যে ঔষধের লক্ষণের বেশি সাদৃশ আছে তা প্রয়োগ করতে হবে অথবা ঐ লক্ষণসমষ্টি যদি প্রথম ব্যবস্থাপত্রের সময় ব্যবহারিত ঔষধের লক্ষণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়, তবে ঐ

ঔষধকেই উচ্চতর শক্তি ও পরিবর্তিত সূক্ষ্ম মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে। এভাবে অবস্থা বিশেষে ঔষধের শক্তি ও মাত্রার পরিবর্তন করে এবং লক্ষণ সাদৃশ্যে এক সময় একটা করে ঔষধ প্রয়োগ করে রোগীকে সামগ্রীকভাবে আরোগ্য করতে হবে। রোগীকে প্রথম ব্যবস্থাপত্র করার পর এভাবে দ্বিতীয় বা পরবর্তী সময়ে ঔষধের শক্তি ও মাত্রার পরিবর্তন করে প্রয়োগ করা বা পরবর্তী উপযোগী প্রয়োগ করাকে, দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র (Second Prescription) বলে।

৫। প্রশ্ন ঃ ব্যবস্থাপত্র কি ? কিভাবে বুঝিবে ব্যবস্থাপত্র ভুল হয়েছে ? ০৯

ব্যবস্থাপত্র (Prescription) ঃ

চিকিৎসক রোগীর নিজের বর্ণনা, আপনজনের বর্ণনা, সেবাকারীর বর্ণনা হতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ সমষ্টি ও এ লক্ষণগুলো কারণের গুরুত্ব অনুসারে এবং চিকিৎসক স্বয়ং রোগীর স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করে রোগের বিষয় অবগত হয়ে রোগীর আরোগ্য উপযোগী মনে করে রোগীলিপি অনুযায়ী যে সদৃশতম ঔষধ নির্বাচন করে সেবন করার জন্য লিখিত নির্দেশ প্রদান করেন, তাকেই ব্যবস্থাপত্র বলে।

ব্যবস্থাপত্র ভুল হয়েছে তা নির্ধারণের উপায় ঃ

ব্যবস্থাপত্র ভুল হয়েছে কিনা তা রোগের হ্রাস-বৃদ্ধি দেখে বুঝতে পারা যায়। তরুণ বা পুরাতন রোগের ঔষধ প্রয়োগের পর অনেক সময় রোগীরা তাদের রোগের সামান্য হ্রাস বা বৃদ্ধির কথা জানায়। কিন্তু ঐ সামান্য হ্রাস বা বৃদ্ধির কথা সকলে হয়ত লক্ষ্য নাও করতে পারে এ ক্ষেত্রে রোগীর মানসিক ও সর্বাঙ্গীন অবস্থা দ্বারা ঔষধের প্রকৃত ক্রিয়া বুঝতে পারা যায়। রোগের সামান্য বৃদ্ধির সাথে সাথে রোগী আক্রান্ত বিমর্ষ ও নিরাশ হয়ে পড়ে এবং তার ভাবভঙ্গি ও ক্রিয়া কলাপ দ্বারাই বুঝতে পারা যায় বা প্রকাশ হয়ে পড়ে যে রোগীর রোগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তখন তার মানসিক যন্ত্রণাগুলি বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা না গেলেও রোগীকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করলেই বেশ বুঝতে পারা যায় যে তার রোগ বৃদ্ধি পেয়েছে, ইহা হতেই চিকিৎসক বুঝতে পারেন যে অনুপোযুক্ত ঔষধ প্রদত্ত হয়েছে অর্থাৎ ব্যবস্থাপত্র ভুল হয়েছে।

৬। প্রশ্ন ঃ ব্যবস্থাপত্র ভুল হলে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে ? ১১, ১৩, ১৭

ব্যবস্থাপত্র ভুল হলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহন ঃ

(i) চিকিৎসক যদি বুঝতে পারেন তাঁর ব্যবস্থাপত্র ভুল হয়েছে তখন তিনি সাথে সাথে ব্যবস্থাপত্রে প্রদেয় ঔষধের ক্রিয়ানাশক ঔষধ দিয়ে পূর্বের ঔষধের ক্রিয়া নষ্ট করতে হবে।

(ii) পরবর্তীতে দ্রুত রোগীলিপি পর্যালোচনা করে অধিক সদৃশ একটি ঔষধ সেবন করতে হবে।

(iii) নতুন ঔষধ সেবনের পর রোগীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

(iv) রোগীর রোগ যন্ত্রণার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাঁর অবস্থার উপর নির্ভর করে, ঔষধ দিতে হবে।

(v) রোগীকে দ্রুত আরোগ্য ব্যবস্থা করতে হবে।

৭। প্রশ্ন ঃ ব্যবস্থাপত্র লিখার সময় একজন চিকিৎসককে কি কি বিষয়ের প্রতি সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় ?

ব্যবস্থাপত্র লিখার সময় একজন চিকিৎসককে নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় ঃ

(i) ডাঃ হ্যানিম্যানের মতে রোগীর ব্যবস্থাপত্র সহজ ও রোগীর ভাষায় করতে হবে।

(ii) রোগীর ব্যবস্থাপত্র কখনও জটিল ও অস্পষ্টভাবে লেখা উচিত হবে না।

(iii) চিকিৎসকে অবশ্যই ব্যবস্থাপত্রে উল্লেখিত ঔষধের নাম ও শক্তি স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।

(iv) কম্পাউন্ডারকে সঠিকভাবে ঔষধ প্রস্তুতের নির্দেশনা থাকতে হবে।

(v) কোন ভেষজবহের সাথে ঔষধ মিশ্রিত বা সহযোগে ঔষধ রোগীর জন্য প্রস্তুত করবে তা সুস্পষ্টভাবে লিখতে হবে।

(vi) রোগী কিভাবে, কতবার, কোন সময় ঔষধ সেবন করবে তা নির্দিষ্টভাবে লিখতে হবে।

(vii) ডকট্রিন অব সিগনেচার এ চিকিৎসকের স্বাক্ষর, রেজিস্ট্রেশন নং ও তারিখ দিতে হবে।

৮। প্রশ্ন ঃ দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র কাকে বলে ? ১৬

দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র (Second Prescription) ঃ

রোগীকে প্রথম ব্যবস্থাপত্র করার পর এভাবে দ্বিতীয় বা পরবর্তী সময়ে ঔষধের শক্তি ও মাত্রার পরিবর্তন করে প্রয়োগ করা বা পরবর্তী উপযোগী ঔষধ প্রয়োগ করাকে, দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র (Second Prescription) বলে।

৯। প্রশ্ন ঃ দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র দেয়ার পূর্বে কি কি সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় ? ১৬

দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র দেয়ার পূর্বে নিম্নলিখিত সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়ঃ

(i) রোগীকে প্রথম ব্যবস্থাপত্র দেয়ার পর রোগীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

(ii) রোগীর প্রথম ব্যবস্থাপত্রের ঔষধ সেবনের পর কি কি লক্ষণাবলী দূর হয়েছে এবং কি কি লক্ষণাবলী নতুনভাবে দেখা দিয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

(iii) রোগীর সার্বিক অবস্থার পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

(iv) প্রথম ব্যবস্থাপত্র পর্যবেক্ষণ করে যদি প্রয়োগকৃত ঔষধ দ্বারা রোগীর আরোগ্য সম্পাদিত হচ্ছে মনে হয়, তাহলে একই ঔষধের পরবর্তী শক্তি প্রয়োগ করতে হবে।

(v) প্রথম ব্যবস্থাপত্রের ঔষধ প্রয়োগ করা পর যদি রোগের বৃদ্ধি পায়, তাহলে এটি কি হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি না মেডিসিনাল বৃদ্ধি তা পর্যবেক্ষণ করে ক্রিয়ানাশক ঔষধ সেবন করাতে হবে।

(vi) পরবর্তীতে রোগীর সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে রোগীর রোগলক্ষণের সাথে সর্বাধিক সদৃশ একটি ঔষধ ব্যবস্থা করতে হবে।

১০। প্রশ্নঃ ব্যবস্থাপত্রের সাবক্রিপশন এবং সিগনেচার বলতে কি বুঝায়? ১৬

সাবক্রিপশন (Subscription) ঃ

ব্যবস্থাপত্র এর যে অংশে কম্পাউন্ডারকে রোগীর জন্য ঔষধ প্রস্তুতের নির্দেশ প্রদান করা হয়, যা দেখে কম্পাউন্ডার ঐ মোতাবেক ঔষধ তৈরী করবে, তাকে সাবক্রিশন বলে।

সিগনেচার (Signature) ঃ

ব্যবস্থাপত্র এর যে অংশে রোগীর প্রতি নির্দেশ থাকে, কখন ঔষধ সেবন করবে, কি পরিমাণে সেবন করবে ও কতবার সেবন করবে এবং পরবর্তী সময়ে কতদিন পর রোগীকে দেখা করতে হবে প্রভৃতির নির্দেশ থাকে, পরে চিকিৎসকের স্বাক্ষরসহ রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ও তারিখ লেখা হয়, তাকে সিগনেচার বলে।

১১। প্রশ্ন ঃ দ্বিতীয়বার রোগী আমাদের নিকট আসিলে আমাদের কর্তব্য কাজ কি কি? ১৫

(Qus. What are the functions of ours when a patient comes to us in second time?)

দ্বিতীয়বার রোগী আমাদের নিকট আসিলে আমাদের কর্তব্য কাজ ঃ

দ্বিতীয়বার রোগী আমাদের নিকট আসলে প্রথমে রোগীর প্রথম ব্যবস্থাপত্র বের করে রোগীকে কি ঔষধ প্রদান করা হয়েছে তা দেখব। তারপর উক্ত ঔষধে রোগীর কোন কোন লক্ষণসমূহ দূরীভূত হয়েছে তা ব্যবস্থাপত্রের দাগ কেটে চিহ্নত করব। পরবর্তীতে রোগীর ঔষধ সেবনকালীন সময় কোন নতুন লক্ষণ বা কষ্ট দেখা দিলে তা লিখে নিব। এরপর ব্যবস্থাপত্র ও রোগীকে পর্যবেক্ষণ করে পরবর্তী ঔষধ নির্বাচন করে রোগীকে সেবনের জন্য দিতে হবে।

১২। প্রশ্ন ঃ কখন এবং কেন দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র প্রদান করা হয় ?

দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র প্রদান সময় ও কারণ ঃ

প্রথম ব্যবস্থাপত্রের ক্রিয়া পর্যবেক্ষণে যখন রোগীর অবস্থার পরিবর্তন লক্ষিত হয় তখন দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র প্রদান করা হয়।

দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র পরিপূরক হিসাবে প্রদান করা যেতে পারে। প্রথম ব্যবস্থা পত্রের পর দেখা গেল যে ধীরে ধীরে রোগীর অবস্থা ক্রমাগত উন্নতির দিকে যাচ্ছে। এরূপ উন্নতি বেশ কিছুদিন চলার পর আর কোন ক্রমোন্নতি অথবা কোন অবনতি পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু প্রথম ব্যবস্থাপত্রে ঔষধের লক্ষণাবলী তখনও বর্তমান আছে। দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র প্রথম ব্যবস্থাপত্রের পূর্ণমূল্যায়ন হিসাবে প্রদান করা হয়। আবার যদি প্রথম ব্যবস্থাপত্রের ঔষধের লক্ষণাবলী বর্তমান না থাকে, অন্য কোন একটি ঔষধের লক্ষণাবলীর সদৃশ হয়, তখন দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র প্রথম ব্যবস্থাপত্রের পরিপূরক হিসাবে প্রদান করা হয়। যখন প্রথম ব্যবস্থাপত্রের পর রোগীর অবস্থা ক্রমাগত উন্নতির দিকে না গিয়ে ক্রমাগত অবনতির দিকে যায়, তখন দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র প্রথম ব্যবস্থাপত্রের প্রতিষেধক হিসাবে গণ্য হয়। এভাবে প্রথম ব্যবস্থাপত্রের ঔষধ প্রয়োগের পর রোগীর লক্ষণের অবস্থা উপলব্ধি করে, রোগীর অবস্থা বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিটি লক্ষণের সুচিন্তিত বিশ্লেষণ দ্বারা আমরা দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র সম্বন্ধে একটি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি। প্রথম দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র নির্বাচনে এভাবে যুক্তিপূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করে রোগী সম্ভাব্য ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে আরোগ্যের পথে অগ্রসর হবে, কখনও বিপথে যাবে না।

পঞ্চদশ অধ্যায়

হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি ও ঔষধজ বৃদ্ধি এবং আংশিক সদৃশ রোগে ঔষধ নির্বাচন পদ্ধতি অনুচ্ছেদ- ১৫৭ - ১৭১

১। প্রশ্ন ঃ ডাঃ হ্যানিম্যানের উক্তি অনুযায়ী স্পেসিফিক রিমেডি বলতে কি বুঝ ? ১০

বা, অমোঘ ঔষধ বলতে কি বুঝ। বর্ণনা কর।

ডাঃ হ্যানিম্যানের উক্তি অনুযায়ী স্পেসিফিক রেমিডি ঃ ডাঃ স্যামুয়েল হ্যানিম্যান "অর্গানন অব মেডিসিন" গ্রন্থের ১৪৭নং অনুচ্ছেদে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় স্পেসিফিক রিমেডি ব্যবহার সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

তাঁর মতে "মানব স্বাস্থ্য পরিবর্তন করার শক্তি সম্বন্ধে যে সকল ঔষধ অনুসন্ধান করা হয়েছে এদের মধ্যে যে ঔষধটির লক্ষণাবলীর সহিত কোন প্রাকৃতিক রোগের লক্ষণসমষ্টির সর্বাধিক সাদৃশ্য হবে সে ঔষধটিই ঐ রোগের সর্বাপেক্ষা উপযোগী ও সুনিশ্চিত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ। এ রোগের জন্যই ইহা অমোঘ ঔষধরূপে পরিগণিত হবে।"

কোন রোগীর জন্য নির্বাচিত ঔষধ যদি ঐ রোগীর অধিক সংখ্যক রোগলক্ষণ পাওয়া যায় বা ঐ রোগীর অধিক সাদৃশ্য হয়, তবে ঐ ঔষধটি ঐ নির্দিষ্ট রোগীর জন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত যাকে ডাঃ হ্যানিম্যানের উক্তি অনুযায়ী স্পেসিফিক রেমিডি বলা হয়। তবে কোন রোগীর অদ্ভুত, বিশেষ অসাধারণ বা একক লক্ষণের সাথে ঐ ঔষধের লক্ষণ সাদৃশ হলেও তাকে অমোঘ ঔষধ হিসাবে বিবেচনা করা যায়।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতি। এখানে লক্ষণের গুরুত্ব সর্বাধিক। অতএব, সুস্থ মানুষের দেহে পরীক্ষিত ঔষধের লক্ষণের সাথে যদি রোগীর রোগ লক্ষণের সাথে মিলে যায়, তবে তাই ঐ রোগীর জন্য স্পেসিফিক রিমেডি।

২। প্রশ্ন ঃ সদৃশ বিধান মতে সর্বাপেক্ষা উপযোগী ঔষধ কিভাবে নির্বাচন করা হয় ? ০৮

সদৃশ বিধান মতে সর্বাপেক্ষা উপযোগী ঔষধ নির্বাচন করার উপায় নিম্নরূপ ঃ

সদৃশ বিধান মতে সর্বাপেক্ষা উপযোগী ঔষধ নির্বাচনের জন্য প্রথমতঃ রোগীলিপি নিয়ে রোগীর রোগের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করতে হবে। রোগের কারণ নির্ণয় করার পর সুস্থ মানবদেহে পরীক্ষিত ঔষধসমূহের পরীক্ষালব্ধ লক্ষণসমূহ হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকাতে লিপিবদ্ধ আছে তা হতে সর্বাধিক একটি ঔষধ নির্বাচন করতে হবে। সদৃশ বিধানে অর্থাৎ হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বিশেষ সুবিধা এই যে, সুস্থদেহে ঔষধ যে সকল রোগ লক্ষণ উৎপন্ন করে, কোন রোগীতে যদি অনুরূপ সদৃশ প্রকাশিত রোগ লক্ষণ দৃষ্ট হয় তবে সদৃশ লক্ষণ সম্পন্ন ঔষধ প্রয়োগে প্রাকৃতিক রোগ নিরাময় সম্ভব। তাই কোন রোগীর প্রাকৃতিক রোগের সৃষ্ট লক্ষণাবলী ঔষধের লক্ষণাবলীর সঙ্গে সদৃশ হলে তা প্রয়োগ করা হয়।

সদৃশ বিধান মতে সুনির্দিষ্ট অনুসন্ধানের জন্য অর্থাৎ চিকিৎসাধীন রোগের সদৃশ একটি কৃত্রিম রোগ সৃষ্টিকারী ঔষধ নির্বাচন করার জন্য পরিচিত ঔষধসমূহের সহিত প্রাকৃতিক রোগের সামগ্রিক লক্ষণসমূহের তুলনা করতে হলে রোগীর অধিকতর সুস্পষ্ট একক অনন্য এবং বিশেষ পরিচায়ক সংকেত ও লক্ষণসমূহের প্রতি বিশেষভাবে ও সর্বতোভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ আরোগ্য সাধনের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযোগী ঔষধ নির্বাচন করতে হলে বিশেষত এগুলোর সহিত নির্বাচিত ঔষধের লক্ষণসমূহের অত্যন্ত সাদৃশ্য থাকা বাঞ্ছনীয়।

৩। প্রশ্ন ঃ এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মধ্যে পাঁচটি পার্থক্য লিখ।

এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মধ্যে পার্থক্য ঃ

এলোপ্যাথি চিকিৎসা		হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা
ইহাতে রোগের নামানুসারে আঙ্গিক ভিত্তিক চিকিৎসা করা হয়।	১	ইহাতে রোগের নয় রোগীর চিকিৎসা করা হয়।
ইহার জনক ডাঃ হিপোক্রেটিস।	২	ইহার জনক ডাঃ হ্যানিম্যান।
ইহার আরোগ্যের প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং এটি বিভিন্ন ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত মতামতের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।	৩	ইহার আরোগ্য প্রাকৃতিক নিয়ম নীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
ইহাতে একজন চিকিৎসকের জীবনের উদ্দেশ্য বিভিন্ন অসদৃশ পদ্ধতিতে চিকিৎসা করে রোগকে উপশম দেয়া ও স্বাস্থ্য রক্ষার চেষ্টা করা।	৪	ইহাতে একজন চিকিৎসকের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য রোগীকে পূর্ব স্বাস্থ্যে ফিরিয়ে নিয়ে আরোগ্য করা ও স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা করা।
ইহাতে সুস্থ অবস্থায়, রোগে ও আরোগ্যের উপর জীবন শক্তির ক্রিয়া কলাপ ও প্রাধান্যকে স্বীকার করে না।	৫	ইহাতে শরীরের সুস্থ অবস্থায় রোগে ও আরোগ্যের উপর জীবনী শক্তির ক্রিয়া কলাপ স্বীকার করে।
ইহাতে রোগ তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছে। যথা একিউট, সাব একিউট ও ক্রনিক।	৬	ইহাতে রোগ ২টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা ঃ একিউট ও ক্রনিক
ইহাতে রোগের কারণ বিভিন্ন রাসায়নিক বিকৃতি ও অনুজীব	৭	ইহাতে রোগের মূল কারণ মায়াজম, যথাঃ সোরা, সিফিলিস ও সাইকোসিস এবং উত্তেজক কারণ।
ইহার ঔষধ ইতর প্রাণীর উপর পরীক্ষিত।	৮	ইহার ঔষধ সুস্থ মানব দেহে পরীক্ষিত।
ইহাতে বিসদৃশ স্থূল মাত্রায় একাধিক ঔষধ ব্যবহার করা হয়।	৯	ইহাতে সদৃশ সূক্ষ্ম মাত্রায় একক ঔষধ ব্যবহার করা হয়।

৪। প্রশ্ন ঃ উপশম কাকে বলে ?

উপশম (Palliation) ঃ

রোগীর দেহ ও মনে প্রকাশিত কষ্টকর লক্ষণাবলীসমূহ সাময়িকভাবে দূরীভূত করে রোগীকে আরাম বিধান করাকে উপশম বলে। উপশমে রোগীর স্বাস্থ্যের পুনঃরুদ্ধার হয় না। রোগ লক্ষণসমূহ চাপা পড়ে এবং উপশমের রোগী সাময়িকভাবে আরাম বোধ করে।

৫। প্রশ্ন ঃ চেতনা নাশক ঔষধের বৈশিষ্ট্য কি ?

চেতনা নাশক ঔষধের বৈশিষ্ট্য ঃ

যে সব ঔষধ সেবন করলে দেহ অবশ বা নিস্তেজ হয়ে জ্ঞান লোপ পায়, উহাকে চেতনা নাশক ঔষধ বলে। যেমনঃ- কফিয়া, ওপিয়াম ইত্যাদি। চেতনা নাশক ঔষধের বৈশিষ্ট্য হল ইহা সেবন করলে শরীর নিস্তেজ ও অজ্ঞান হয়ে মস্তিষ্কের কার্যকারিতা ব্যাহত হয়। স্নায়ুবিক অনুভূতি নষ্ট হয়, ফলে দৈহিক উত্তেজনা হ্রাস পায় এবং অচেতন হয়ে যায়।

৬। প্রশ্ন ঃ ঔষধজনিত কুফল কিরূপে দূর করা সম্ভব ? ০৮, ১৩

ঔষধজনিত কুফল নিম্নরূপে দূর করা সম্ভব ঃ

ঔষধজনিত কুফল দূর করতে হলে প্রথমে রোগীকে প্রয়োগকৃত ঔষধ বন্ধ করতে হবে। প্রয়োগকৃত ঔষধ বন্ধ করার পর যদি রোগীর অবস্থার উন্নতি না হয় তাহলে ঐ ঔষধের ক্রিয়ানাশক ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে। ক্রিয়ানাশক ঔষধ প্রয়োগের পর রোগীর অবস্থা উন্নতি হলে তাঁর লক্ষণাবলী নিয়ে আবার রোগীলিপি করে ঔষধ প্রয়োগ করে রোগ মুক্ত করতে হবে। ঔষধ দেহে কৃত্রিম রোগ সৃষ্টি করলে জীবনীশক্তি তাকে বাধা সৃষ্টি করে না কিন্তু প্রাকৃতিকভাবে দেহে রোগ সৃষ্টিতে জীবনীশক্তি বাধা দান করে। তাই ঔষধজনিত কুফল রোগীকে অত্যন্ত দুর্বল করে। সুতরাং ঔষধজনিত কুফলের চিকিৎসায় দ্রুত ব্যবস্থা করতে হবে। নতুবা রোগীর চরম ক্ষতি সাধিত হবে।

৬। প্রশ্ন ঃ বিসদৃশ রোগ বলতে কি বুঝ? একই মানবদেহে দুইটি বা তিনটি বিসদৃশ রোগ মিলিত হলে কি অবস্থা সৃষ্টি হয় ?

বিসদৃশ রোগের সংজ্ঞা ঃ রোগ-লক্ষণের বিপরীত পদ্ধতিতে অর্থাৎ বি-সদৃশ মতে ঔষধ প্রয়োগ করে রোগ লক্ষণের সাময়িক উপশম করা হলে, তাকে বিসদৃশ রোগ বলে। বি-সদৃশ পদ্ধতিতে ঔষধ প্রয়োগ করা হলে সাময়িকের উপশম হলেও, তাতে পরবর্তীতে রোগীর অবস্থা আরও জটিলতর হয়।

একই মানবদেহে দুইটি বা তিনটি বিসদৃশ রোগ মিলিত হলে নিম্নরূপ অবস্থা সৃষ্টি হয় ঃ একই মানবদেহে দুইটি বা তিনটি বিসদৃশ রোগ মিলিত হলে নতুন রোগটি শরীরতন্ত্রে সক্রিয় থাকার পর পরিশেষে বি-সদৃশ পুরাতন রোগটির সহিত মিলে একটি জটিল রোগের সৃষ্টি হয়। তখন দুইটি রোগই শরীরতন্ত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে বসে। অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজ নিজ উপযোগী স্থান নির্বাচন করে নেয়। কারণ পরস্পর বি-সদৃশ দুইটি রোগ একটি অপরটিকে অপসারিত বা আরোগ্য করতে সক্ষম হয় না। অবশ্য যথা সময়ে এরা উভয়ের একত্র সমাবেশ ঘটে। অর্থাৎ প্রত্যেক নিজ নিজ উপযোগী শরীরতন্ত্রের অংশসমূহ অধিকার করে নেয়। সুতরাং রোগী আরো অধিক রোগগ্রস্থ হয়ে পড়েন, আরোগ্য সাধনও অধিকতর কষ্ট সাধ্য হয়ে উঠে। দুইটি বি-সদৃশ অচির সংক্রামক রোগ পরস্পর মিলিত হলে একটি অপরটিকে চাপা দেয়, যথা-বসন্ত ও হাম একযোগে দেখা দিলে সাধারণতঃ একটি অপরটিকে চাপা রাখে। প্রাকৃতিক নিয়মেই কোন কোন সময়ে মানব দেহের দুইটি রোগের মিলন ঘটে থাকে। দুইটি বি-সদৃশ রোগের ক্ষেত্রে শুধু এ ধরনের জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে নিশ্চিতভাবে এটা লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতির শাশ্বত নিয়ম অনুসারে একটি অপরটিকে নির্মূল, ধ্বংস বা আরোগ্য করতে পারে না। প্রত্যেকে নিজের নিজের বিশেষ উপযোগী

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ও কেন্দ্রসমূহ অধিকার করে নেয়। এ সকল রোগের পরস্পরের মধ্যে কোন সাদৃশ্য নাই বলেই এরূপ ঘটতে পারে।

৭। প্রশ্ন ঃ আরোগ্য ও উপশমের মধ্যে পার্থক্য লিখ।

আরোগ্য ও উপশমের মধ্যে পার্থক্য ঃ

আরোগ্য		উপশম
রোগীর সার্বদেহিক লক্ষণাবলী সংগ্রহ করে, রোগের মায়াজমেটিক অবস্থা নির্ণয় করে সদৃশ বিধানমতে ঔষধ প্রয়োগ করার ফলে রোগ স্থায়ীভাবে দূরীভূত হলে তাকে আরোগ্য বলে।	১	রোগীর রোগ লক্ষণ সমূহ সাময়িকভাবে দূরীভূত করাকে উপশম বলে।
সদৃশ চিকিৎসা বিধানে স্থায়ী আরোগ্য দান করে।	২	বিসদৃশ চিকিৎসা বিধানে উপশমদায়ক চিকিৎসা ব্যবস্থা দান করে।
আরোগ্য সামগ্রিকভাবে হয়।	৩	উপশম আঙ্গিকভাবে হয়।
আরোগ্যের পর রোগ লক্ষণাবলী আর ফিরে আসে না।	৪	ইহাতে রোগ লক্ষণাদি বারবার ফিরে আসে
ইহাতে রোগী তার পূর্বের স্বাস্থ্যে ফিরে পায়।	৫	ইহাতে রোগী তার পূর্বের স্বাস্থ্য ফিরে পায় না।
ইহাতে বর্তমান লক্ষণসহ পূর্বের চাপা পড়া লক্ষণাবলীও ধ্বংস হয়।	৬	ইহাতে রোগের লক্ষণাবলী চাপা পড়ে।
ইহাতে রোগী স্থায়ীভাবে আরামবোধ করে।	৭	ইহাতে রোগী সাময়িকভাবে আরাম বোধ করে।

৮। প্রশ্ন ঃ হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি কি? ইহার কারণ আলোচনা কর।

হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি ঃ

সদৃশ বিধান মতে সুনির্বাচিত ঔষধের স্বল্পমাত্রার প্রয়োগে রোগ নিরূপদ্রবে দূরীভূত হয়ে যায়। কিন্তু যদি নির্বাচিত ঔষধ অতিরিক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করা হয়। তখন রোগশক্তির চেয়ে ঔষধশক্তি বেশি হওয়ায় সদৃশ বিধান মতে জীবনীশক্তি রোগশক্তির কবল হতে মুক্ত হলে ও প্রবলতর ঔষধশক্তি স্বাভাবিক নিয়মে সদ্যমুক্ত জীবনীশক্তিকে আক্রমণ করে পীড়িত করে। হোমিওপ্যাথিক সদৃশ ঔষধের কারণে এই বৃদ্ধি ঘটে থাকে বলে ইহাকে হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি বলে।

হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধির কারণ ঃ

জীবনীশক্তির এই পীড়িত লক্ষণ বিগত রোগের লক্ষণের চেয়ে প্রবলতর কারণ ইহা ঔষধজনিত। রোগী মনেকরে যে, তার মূল রোগটি বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে উহা কিঞ্চিত বর্ধিত আকারে ঔষধের রোগ ছাড়া আর কিছুই নয়। হোমিওপ্যাথিক সদৃশ ঔষধের কারণে এই বৃদ্ধি ঘটে। রোগশক্তি অপেক্ষা সদৃশ লক্ষণে অধিকতর শক্তিশালী ঔষধ শক্তির প্রয়োগ ফল।

৯। প্রশ্ন ঃ হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি কি? ইহার সহিত ঔষধজঃ বৃদ্ধির পার্থক্য নির্ণয় কর। ০৮

বা, হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি ও ঔষধজ বৃদ্ধির মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা কর।

হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি ঃ

সদৃশ বিধান মতে সুনির্বাচিত ঔষধের স্বল্পমাত্রার প্রয়োগে রোগ নিরূপদ্রবে দূরীভূত হয়ে যায়। কিন্তু যদি নির্বাচিত ঔষধ অতিরিক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করা হয়, তখন রোগশক্তির চেয়ে ঔষধশক্তি বেশি হওয়ায় সদৃশ বিধান মতে জীবনীশক্তি রোগশক্তির কবল হতে মুক্ত হলেও প্রবলতর ঔষধশক্তি স্বাভাবিক নিয়মে সদ্যমুক্ত জীবনীশক্তিকে

আক্রমণ করে পীড়িত করে। হোমিওপ্যাথিক সদৃশ ঔষধের কারণে এই বৃদ্ধি ঘটে থাকে বলে ইহাকে হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি বলে।

হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি ও ঔষধজ বৃদ্ধির মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা ঃ

হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি		ঔষধজ বৃদ্ধি
সদৃশ বিধানে নির্বাচিত ঔষধ সঠিক হলে এবং ঔষধের মাত্রা বেশি হলে হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি দেখা দেয়।	১	রোগীর দেহে প্রয়োগকৃত ঔষধ ভুল হলে ঔষধজ বৃদ্ধি দেখা দেয়।
ইহা ক্ষণস্থায়ী।	২	ইহা দীর্ঘস্থায়ী।
এ বৃদ্ধিতে রোগীর মানসিক অবস্থার উন্নতি ঘটে।	৩	এ বৃদ্ধিতে রোগীর মানসিক অবস্থার বিপর্যয় ঘটে।
ইহাতে রোগীর জীবনীশক্তি তেমন ক্ষতি হয় না।	৪	ইহাতে রোগীর জীবনীশক্তির বিপর্যয় ঘটে।
ইহাতে মাত্রা বেশী হওয়ার কারণে বৃদ্ধি পায়।	৫	ইহাতে ভুল ঔষধ প্রয়োগের কারণে বৃদ্ধি।
এই বৃদ্ধিতে নতুন লক্ষণের সমাহার থাকে না।	৬	এই বৃদ্ধিতে নতুন লক্ষণের সমাহার থাকে।
ইহাতে ঔষধ প্রয়োগের সাথে সাথে বৃদ্ধি হবে না।	৭	ইহাতে ঔষধ প্রয়োগের সাথে সাথে বৃদ্ধি হবে।
ইহাতে রোগীর কষ্ট বৃদ্ধি স্বত্ত্বেও রোগী সামগ্রিকভাবে সুস্থতা অনুভব করে।	৮	ইহাতে রোগীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে যায়।
হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি মোটামুটি শুভ।	৯	ঔষধজ বৃদ্ধি রোগীর জন্য অশুভ, এতে রোগীর জীবনে আর্দশ আরোগ্য ব্যাঘাত ঘটে।
ইহাতে ক্রিয়ানাশক ঔষধের প্রয়োজন হয় না।	১০	ইহাতে ক্রিয়ানাশক ঔষধের প্রয়োজন হয়।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

৭। সংক্ষেপে লিখ ঃ-

(১) ল- অব নেচার (Homoeopathic law of Nature) ঃ

ল- অব নেচার ঃ

একই মানবদেহে যখন দুইটি রোগের অবস্থান ঘটে, এদের মধ্যকার অবস্থান লক্ষণ সদৃশ্য হয় কিন্তু উৎস যদি ভিন্ন হয় তাহলে শক্তিশালী রোগটি দুর্বলতম রোগটিকে ধ্বংস করে দেয়, তাকে হোমিওপ্যাথিক ল-অব নেচার (Homoeopathic law of Nature) বলে।

(২) ভেষজ (Drug)

ভেষজ (Drug) ঃ

যে সকল পদার্থ সুস্থ শরীরে প্রয়োগ করলে শরীর অসুস্থ হয়, তাকে ভেষজ বলা হয়। অর্থাৎ যে সকল পদার্থের রোগ উৎপাদিকা ও ফার্মাকোপিয়া মতে শক্তিকৃত করার পর প্রয়োগে রোগনাশক উভয় শক্তিই বর্তমান থাকে, তাকে ড্রাগ (Drug) বলে। কাজেই ভেষজ হল ঔষধীগুণ সম্পন্ন বস্তু যা থেকে ঔষধ প্রস্তুত করা হয়।

(৩) ঔষধ (Medicine)

ঔষধ (Medicine) ঃ

বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে, ফার্মাকোপিয়ার নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া বা ফর্মূলা অনুযায়ী ভেষজ পদার্থ হতে প্রস্তুতকৃত পদার্থ যা চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুসারে রোগারোগ্য করতে সক্ষম, তাকে ঔষধ (Medicine) বলে।

(৪) রিমেডি (Remady)

রিমেডি (Remady) ঃ

যখন একটি ঔষধ সদৃশ বিধান মতে প্রয়োগ করা হয় এবং প্রয়োগের ফলে শরীরে সুস্থ্যতা আনয়ন করে, তাকে রিমেডি বলা হয়। অর্থাৎ সুনির্বাচিত ঔষধকেই রিমেডি বলা হয়।

(৫) শক্তিকরণ তত্ত্ব বর্ণনা

শক্তিকরণ তত্ত্ব বর্ণনা ঃ

ল অব পটেন্টাইজেশন বা ডাইনামাইজেশন ঃ ভেষজকে যে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সুক্ষ্ম মাত্রায় ঔষধে রূপান্তর করা হয়, তাকে ল-অব-পটেন্টাইজেশন/ ডাইনামাইজেশন বলে। ইহার তিনটি রীতি বা পদ্ধতি। যথা- (i) দশমিক রীতি (Decimal scale),

(ii) শততমিক রীতি (Centesimal scale), (iii) পঞ্চাশ সহস্রতমিক রীতি (Fifty mellisimal scale) সদৃশ লক্ষণ মতে চিকিৎসা করতে হলেই ঔষধ এক বিশেষ নিয়মে শক্তিকৃত করতে হবে। এটাই হোমিওপ্যাথিক মূলনীতি।

(৬) সূক্ষ্মমাত্রা, ০৯

সূক্ষ্মমাত্রা/ ক্ষুদ্রতম মাত্রা ঃ

একই আকৃতির ১০০টা অনুবটিকা ওজন এক গ্রেণ হয়, এমন একটা অনুবটিকা শক্তিকৃত ঔষধের দ্বারা ঔষধিকৃত করে, একে মাত্রা হিসাবে রোগীকে সেবন করতে দেয়াকে, ক্ষুদ্রতম বা সূক্ষ্মমাত্রা বলে। মহাত্মা ডাঃ হ্যানিম্যান বলেছেন, এক ফোঁটা ঔষধে ৫০০টি অনুবটিকাকে সিক্ত করে ব্লটিং পেপারে শুকিয়ে নিলে এর একটি অনুবটিকা যে টুকু ঔষধ ধারণ করতে পারে, তাকে সূক্ষ্ম বা ক্ষুদ্রতম মাত্রা বলে।

(৭) ব্যবস্থাপত্র, ১৩, ১৫

ব্যবস্থাপত্র (Prescription) ঃ

চিকিৎসক রোগীর নিজের বর্ণনা, আপনজনের বর্ণনা, সেবাকারীর বর্ণনা হতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ সমষ্টি ও এ লক্ষণগুলো কারণের গুরুত্ব অনুসারে এবং চিকিৎসক স্বয়ং রোগীর স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করে রোগের বিষয় অবগত হয়ে রোগীর আরোগ্য উপযোগী মনেকরে রোগীলিপি অনুযায়ী যে সদৃশতম ঔষধ নির্বাচন করে সেবন করার জন্য লিখিত নির্দেশ প্রদান করেন, তাকেই ব্যবস্থাপত্র বলে।

(৮) হোমিও ঔষধের উৎস, ১৬

হোমিওপ্যাথিক ঔষধের উৎসগুলি নিম্নরূপ ঃ

হোমিওপ্যাথিক ফার্মাকোপিয়া প্রধানতঃ ৬টি মূল উৎস হতে পাওয়া যায়। যথা ঃ

(i) উদ্ভিজ্জ (plant kingdom),
(ii) প্রাণীজ (Animal),
(iii) খনিজ (Minerals or Chemicals)
(iv) রোগজ (Nosodes),
(v) গ্রন্থিজ (Sarcodes),
(vi) শক্তিজ (Imponderabilia)।

এছাড়াও ভেষজের আরও কয়েকটি উৎস পাওয়া গিছে। যথা-

(vii) বাওয়েল নোসোড (Bowels Nosodes),
(viii) স্টোক ভ্যাকসিন (Stock Vaccine),
(ix) এন্টিবায়োটিকস (Antibiotics)

(৯) এনামনেসিস, ০৮, ১৪

এনামনেসিস ঃ

এনামনেসিসের অর্থ রোগীর লক্ষণসমষ্টি। রোগীর বর্তমান ও অতীত লক্ষণ, রোগ লক্ষণের ক্রমবিকাশ, লক্ষণ বৃদ্ধির কারণ, রোগীর বংশানুক্রমিক ইতিহাস, রোগীর দৈহিক গঠনমূলক লক্ষণ, রোগ নিরাময়ের পারিপার্শ্বিক বাধা বিপত্তি, জীবাণুঘটিত রোগের জটিল প্রকৃতি প্রভৃতি এনামনেসিসের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ রোগী সম্বন্ধে পুংখানুপুংখভাবে জানার নাম এনামনেসিস। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় এনামনেসিস অপরিহার্য। রোগে আক্রমণে দেহ ও মনের উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটেছে এবং তাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা কিরূপ সে সম্বন্ধে পরিচয় লাভ করাই এনামনেসিসের লক্ষ্য।

(১০) জীবনীশক্তি, ১৬

জীবনীশক্তি ঃ

মানবের সুস্থ অবস্থায় ধারক ও নিয়ামক জীবনীশক্তি। যে শক্তি স্থূল মানবদেহকে জীবিত রাখে, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে অপ্রতিহত শক্তিকে শাসন করে এবং দেহতন্ত্রের সকল অংশকেই পরস্পরের সাথে জীবনকার্য পরিচালনায় রত রাখে, যে মানুষের অন্তরস্থিত বিচারশক্তি সম্পন্ন মন, অবাধে এ সচেতন ও সুস্থ দেহতন্ত্রকে জীবনের মহত্তর উদ্দেশ্যসাধনে নিযুক্ত করতে সমর্থ হয়।

জীবনীশক্তি ব্যতীত মানুষের জড় শরীর অনুভব করতে পারে না, নিজ কার্যাবলী করতে অক্ষম এবং আত্মরক্ষা বিষয়ে অপারগ হয়। যে শক্তির প্রভাবে মানবের জড় দেহ জীবিত থাকে, তাকেই জীবনীশক্তি বলে। মহাত্মা ডাঃ হ্যানিম্যান অর্গানন অব মেডিসিনের ষষ্ঠ সংস্করণে জীবনীশক্তিকে ভাইটাল প্রিন্সিপল (Vital principle) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

(১১) উপবিষ (মায়াজম)

উপবিষ (মায়াজম) ঃ

মায়াজম একটি গ্রীক শব্দ। এর অর্থ দাগ, অপবিত্রতা, দূষিত অবস্থা। যে সকল প্রাকৃতিক সূক্ষ্ম শক্তি বা কারণসমূহ হতে রোগ উৎপত্তি হয়, সে সকল সূক্ষ্ম শক্তি বা কারণসমূহকে, উপবিষ বা মায়াজম বলে। সুতরাং উপবিষ বা মায়াজম হচ্ছে এমন একটি অবস্থা যা মানবদেহে প্রবেশ করে এবং দেহের বিশৃংখলা সৃষ্টি করে রোগ লক্ষণাবলী উৎপন্ন করে। মায়াজম তিন প্রকার। যথা –

১। সোরা ২। সিফিলিস ও ৩। সাইকোসিস।

(১২) সাইকোসিস, ১৪, ১৬

সাইকোসিস (Sycosis) ঃ

সাইকোসিস হচ্ছে ডাঃ হ্যানিম্যানের আবিষ্কৃত ক্রনিক তিনটি মায়াজমের একটি যা সর্বাপেক্ষা মারাত্মক। ইহার ধ্বংশাত্মক প্রকৃতি সময়ের বিস্মৃতি, ভুলো মন, অমনোযোগী। কথা ধীরে বলে, দ্রুত উত্তর দিতে অক্ষম, কথা খুজে পায় না। ব্যবহারেও অসমন্বয় যথা– সত্যকথা বলে না। অত্যধিক সন্দেহ পরায়ন হিংসুটে, রাগী। রুক্ষ ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির। গোপন করা স্বভাব।

(১৩) হ্রাস-বৃদ্ধি। ১৩, ১৫, ১৬

হ্রাস বৃদ্ধি (Modalities) ঃ

প্রত্যেক রোগী ও ঔষধের কোন লক্ষণ বা লক্ষণসমষ্টি কোন সময় ও কোন অবস্থায় হ্রাস বৃদ্ধি হয়, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরুণের অবস্থা রোগারোগ্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রকাশ করে। ইহা দুই প্রকার। যথা-

ক) সর্বাঙ্গিন হ্রাস-বৃদ্ধি (Modalities in general) ঃ ইহা দ্বারা রোগীর ও ঔষধের ব্যক্তিভিত্তিক বা সত্ত্বাভিত্তিক সামগ্রিক হ্রাস-বৃদ্ধি

বুঝায়। যেমন- ১) সকাল ১০টায় বৃদ্ধি - নেট্রাম-মিউর, ২) গরম দুধে উপশম - চেলিডোনিয়াম মেজাজ।

খ) আঙ্গিক হ্রাস-বৃদ্ধি (Modalities in particular) ঃ ইহার দ্বারা রোগীর ও ঔষধের কোন আঙ্গিক বা আংশিক অবস্থার হ্রাস বৃদ্ধি বুঝায়। যেমন ঃ ১) মোটর গাড়িতে চড়লে মাথার বেদনা উপশম - নাইট্রিক এসিড। ২) কাশি চিৎ হয়ে শুলে উপশম - একোনাইট ন্যাপ, লাইকোপডিয়াম। ৩) মাসিক ঋতুস্রাব কেবল রাতে বৃদ্ধি - বোভিষ্টা।

(১৪) আদর্শ ভেষজ পরীক্ষক, ১৫

আদর্শ ভেষজ পরীক্ষক ঃ

(i) ভেষজ পরীক্ষককে সুস্থ, সবল ও স্বাভাবিক হতে হবে।

(ii) সম্পূর্ণ বিশ্বস্থ ও বিবেকবান হতে হবে।

(iii) পরীক্ষা চলাকালীন তাকে মানসিক শারীরিক অতিরিক্ত পরিশ্রম, সর্বপ্রকার অমিতাচার ও বিরক্তিকর উত্তেজনা সমূহ বর্জন করতে হবে।

(iv) চিত্ত চাঞ্চল্যকর কোন জরুরী কাজে তাঁর কোন আকর্ষণ থাকবে না।

(v) সর্বদা আত্ম-পর্যবেক্ষণে তিনি নিমগ্ন থাকবেন।

(vi) তার শরীর যে ভাবে সুস্থ থাকে সে ভাবে তিনি থাকবেন।

(vii) অনুভূতি সমূহ যথার্থভাবে ব্যক্ত ও বর্ণনা করার মত যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা তাঁর থাকতে হবে।

(viii) পরীক্ষককে সুশিক্ষিত হতে হবে এবং হোমিওপ্যাথির প্রতি দরদী, বিশ্বাস ও ভক্তি থাকতে হবে।

উপরিউক্ত গুণাবলীসমূহ যে পরীক্ষকের মধ্যে থাকবে তিনি হবেন একজন আদর্শ ভেষজ পরীক্ষক।

(১৫) চিররোগের উৎস, ১৫

চিররোগের উৎস ঃ

মহাত্মা ডাঃ হ্যানিম্যান হোমিওপ্যাথির আইন সম্বলিত গ্রন্থ "অর্গানন অব মেডিসিন" এর শেষে অনুচ্ছেদে চিররোগের কারণ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

(ক) মূল কারণ ঃ (i) সোরা, (ii) সিফিলিস, (iii) সাইকোসিস, (iv) টিউবারকুলার ডায়াথেসিস, (v) মিশ্র মায়াজম।

(খ) উত্তেজক/আনুষঙ্গিক কারণ ঃ (i) বংশগত কারণে, (ii) বয়স, (iii) লিঙ্গ (পুরুষ/মহিলা), (iv) ঋতু, (v) আবহাওয়া, (vi) পেশা, (vii) পারিবারিক অবস্থা, (viii) সামাজিক অবস্থা, (ix) ব্যক্তিগত অভ্যাস, (x) শারীরিক গঠন, (xi) পুষ্টির অবস্থা, (xii) বাসস্থান, (xiii) বিভিন্ন ধরনের মাইক্রোঅর্গানিজম।

(১৬) সোরা, ১৪

সোরা ঃ

সোরা হল রোগ উৎপাদনের এমন একটি কারণ যা মানবদেহে রোগ উৎপত্তি ও রোগ সংক্রমণ সৃষ্টি করে থাকে। অর্থাৎ যে সকল অদৃশ্য কারণসমূহ হতে রোগ সৃষ্টি হয়, সোরা তাদের মধ্যে অন্যতম প্রাচীন রোগবীজ। ডাঃ হ্যানিম্যান এর মতে সোরা হল মানুষের দেহে রোগ সৃষ্টিকারী আদি মায়াজম। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, ব্যাপক এবং মারাত্মক মায়াজম সোরা। যা মানবদেহে প্রবেশ করলে উহা সুচিকিৎসিত না হলে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করে যা সারা জীবন ধরে চলতে থাকে এবং বংশ পরম্পরায় চলতে থাকে।

(১৭) বিক্ষিপ্ত রোগ, ১৪

ক্ষিপ্ত রোগ ঃ

যে রোগগুলি কিছু দূরে দূরে দুই একটি ব্যক্তির মধ্যে ছড়ানো নোভাবে আক্রমন করে, তাকে বিক্ষিপ্ত তরুণ রোগ বলে। এ রের তরুণ রোগসমূহ বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন স্থানে উৎপন্ন হয়। কারণঃ হ্যানিম্যানের মতে বাহ্যিক ভৌতিক কারণ যেমন আকাশ, বায়ু, ও মাটি দোষ, ইহাতে মানুষের বিশেষ কোন হাত নেই। উদাহরণ- , বসন্ত, উদরাময়, কলেরা ইত্যাদি।

(১৮) মহামারী রোগ

মারী রোগ ঃ

যে সকল রোগ বাহ্যিক উত্তেজক কারণে কোন বিশেষ পদে ব্যাপকভাবে হয়ে থাকে, তাকে মহামারী রোগ বলে। রনতঃ যুদ্ধ, প্লাবন, দূর্ভিক্ষ প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় বাহ্যিক জক কারণে বহুলোক একই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। উদাহরণ- রা, বসন্ত, হাম ইত্যাদি।

(১৯) ফাইটাম, ১৪

টাম ঃ

ফাইটাম হচ্ছে এক ধরনের অনঔষধি যা চিররোগ চিকিৎসায় ধর ক্রিয়াকাল সমাপ্ত করার জন্য ব্যবহার করা হয়। কোন ৎসক চিররোগীকে ঔষধ প্রয়োগ করার পর যখন ঔষধ ক্রিয়া শুরু তখন ঔষধের ক্রিয়াকাল সম্পন্ন হওয়ার জন্য এবং রোগীকে া দেয়া জন্য ফাইটম সেবন করতে দেন। এতে রোগী মনেকরেন ঔষধ সেবন করতেছেন। ইহা রোগারোগ্যে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

(৫০) ঔষধের ক্রিয়াকাল, ১৬

ঔষধের ক্রিয়াকাল ঃ হোমিওপ্যাথি ঔষধ সুস্থ মানুষের উপর পরীক্ষিত ঔষধ। প্রত্যেকটি ঔষধের নির্দিষ্ট ক্রিয়াকাল আছে। কোন ঔষধ প্রয়োগ করার পর একটি নির্দিষ্ট সময় পর ঐ ঔষধ আর ক্রিয়া করে না। যখন ঔষধ ক্রিয়া শুরু করে তখন থেকে ঔষধের ক্রিয়াকাল সম্পন্ন হওয়ার সময়কে, ঔষধের ক্রিয়া কাল বলে। যেমন- ঃ কোনিয়াম মেকুলেটামের ক্রিয়াকাল ৩০ দিন, আর্জেন্টাম মেটালিকামের ক্রিয়াকাল ৩০ দিন। অরাম মেটালিকামের ক্রিয়াকাল ৫০-৬০ দিন প্রভৃতি।

(৫১) সদৃশ-বৃদ্ধি ১৫, ১৬

সদৃশ-বৃদ্ধি ঃ সদৃশ বিধান মতে সুনির্বাচিত ঔষধের স্বল্পমাত্রার প্রয়োগে রোগ নিরুপদ্রবে দূরীভূত হয়ে যায়। কিন্তু যদি নির্বাচিত ঔষধ অতিরিক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করা হয়। তখন রোগশক্তির চেয়ে ঔষধশক্তি বেশি হওয়ায় সদৃশ বিধান মতে জীবনীশক্তি রোগশক্তির কবল হতে মুক্ত হলে ও প্রবলতর ঔষধশক্তি স্বাভাবিক নিয়মে সদ্যমুক্ত জীবনীশক্তিকে আক্রমন করে পীড়িত করে। হোমিওপ্যাথিক সদৃশ ঔষধের কারণে এই বৃদ্ধি ঘটে থাকে বলে ইহাকে সদৃশ-বৃদ্ধি বলে।

(৫২) শত্রুভাবাপন্ন ঔষধ, ১৩

শত্রুভাবাপন্ন ঔষধ ঃ

যে সকল ঔষধের ক্রিয়া পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন, তাকে শত্রুভাবাপন্ন ঔষধ বলে। অর্থাৎ কোন ঔষধ কোন ঔষধের পূর্বে বা পরে প্রয়োগ করলে রোগীর ক্ষতি সাধন করে, তাকে অনিষ্টকারক/ শত্রুভাবাপন্ন ঔষধ বলে। যেমন - এপিস মেলিফিকা আগে ও পরে রাস-টক্স প্রয়োগ, সাইলিসিয়া আগে ও পরে মার্ক-সল প্রয়োগ ইত্যাদি। নাক্স-ভমিকার শত্রুভাবাপন্ন ঔষধ এসেটিক এসিড, ইগ্নেসিয়া, জিঙ্ক। ক্যামোমিলার শত্রুভাবাপন্ন ঔষধ জিঙ্কাম মেটালিকাম। বোরাক্স এর

শক্রভাবাপন্ন ঔষধ এসেটিক এসিড, ডাইনাম। বেলেডোনার শক্রভাবাপন্ন ঔষধ এসেটিক এসিড, ডালকামারা। এলো সক্রোটিনার শক্রভাবাপন্ন ঔষধ এলিয়াম স্যাট। ইথুজা সাইনেপিয়াম এর শক্রভাবাপন্ন ঔষধ এন্টিম ক্রুড, সিকুটা।

(২৩) ক্রিয়ানাশক ঔষধ

ক্রিয়ানাশক ঔষধ ঃ

একটি ঔষধের গুণাগুণ অন্য একটি ঔষধ প্রয়োগে ক্রিয়া নষ্ট বা ক্রিয়ানাশ করে, তা হলে দ্বিতীয় ঔষধটিকে প্রথম ঔষধটির ক্রিয়ানাশক ঔষধ বলে। যেমন- বেলেডোনার ক্রিয়ানাশক ওপিয়াম, ব্রায়োনিয়ার ক্রিয়ানাশক রাস-টক্স, একোনাইট ন্যাপ এর ক্রিয়ানাশক বেলেডোনা এসেটিক এসিড, বার্বেরিস ভাল, কফিয়া, নাক্স-ভমিকা, সালফার ইত্যাদি। রাস-টক্স এর ক্রিয়ানাশক ক্যাম্ফর, কফিয়া, ক্লিমেটিস, ক্রোটন টিগ ইত্যাদি।

(২৪) পরিপোষক কারণ, ১৩

পরিপোষক/উত্তেজক কারণ এর সংজ্ঞা (Maintaining Cause) ঃ

বিজ্ঞানী ডাঃ হ্যানিম্যান, "অর্গানন অব মেডিসিন" গ্রন্থের ৫নং অনুচ্ছেদে রোগের কারণ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যে সকল আনুসঙ্গিক কারণে রোগের উৎপত্তি ও বিস্তার লাভ সহায়তা করে, তাকে উত্তেজক কারণ বলে। অর্থাৎ হঠাৎ কোন কারণে যদি কোন ব্যক্তি অসুস্থ হয়, তাকে রোগের উত্তেজক কারণ বলে।

(২৫) অচিররোগ, ০৯

অচির রোগ ঃ যে সকল রোগ হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে, যাদের ভোগকাল স্বল্পসময় বা স্বল্পদিন স্থায়ী, ঐ সময়ের মধ্যে

হয় রোগী আরোগ্য লাভ করে অথবা রোগ নিজে নিজেই ধ্বংস হয়ে যায় নতুবা ঐ সময়ের মধ্যে রোগীর পরিণতি ফল মৃত্যু হয়, তাকে অচির রোগ বা তরুণ রোগ বলে।

(২৬) চিররোগ, ০৮

চির রোগের সংজ্ঞা ঃ যে সকল রোগ মানবদেহে অতি ধীরে ধীরে গোপনে প্রকাশিত হয় ও দীর্ঘ মেয়াদে আস্তে আস্তে জীবনীশিক্তকে বিকৃত করে এবং দেহের অভ্যন্তরে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে, যার রোগ লক্ষণগুলো বেশিরভাগ অস্পষ্ট থাকে, রোগের মায়াজমেটিক অবস্থা নির্ণয় করে, এন্টিমায়াজমেটিক ঔষধ ছাড়া রোগীকে প্রকৃত আরোগ্য করা অসম্ভব, তাকে চিররোগ বলে। প্রকৃত ঔষধ ব্যতীত রোগাক্রমনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জীবনীশক্তি ইহার হাত হতে মুক্তি পায় না। ইহার রোগীকে ক্রমশঃ মৃত্যু দিকে ধাবিত করে।

(২৭) মিথ্যা চিররোগ, ১৭

মিথ্যা চিররোগ ঃ যে সকল রোগ স্বাস্থ্য বিধি লংঘণের ফলে উৎপন্ন হয়, তাদেরকে মিথ্যা চিররোগ বলা হয়। যেমন- রাত্রি জাগরণ, মদ্যপান, স্যাঁতস্যাঁতে স্থানে বসবাস ইত্যাদি। ইহাতে বিনা ঔষধে রোগী আরোগ্য লাভ করে, শুধুমাত্র রোগের কারণ, পথ্য নিয়ন্ত্রণ, রোগীকে স্বাস্থ্যকর স্থানে স্থানান্তরিত করা, উপযুক্ত পরিচর্যার ব্যবস্থা করলে রোগী আরোগ্য হয়।

(২৮) অসাধ্য ব্যাধি, ০৮

অসাধ্য ব্যাধি (Incureble disease) ঃ যে সকল ব্যাধি ঔষধ প্রয়োগ করলে আরোগ্য হয় না, তাদেরকে অসাধ্য ব্যাধি বলে। ঔষধের অপব্যবহার জনিত চিররোগ সমূহ সর্বাপেক্ষা শোচনীয় ও চিকিৎসার সর্বাপেক্ষা অসাধ্য।

(২৯) উপশম (Palliation)

উপশম (Palliation) ঃ রোগীর দেহ ও মনে প্রকাশিত কষ্টকর লক্ষণাবলীসমূহ সাময়িকভাবে দূরীভূত করে রোগীকে আরাম বিধান করাকে উপশম বলে। উপশমে রোগীর স্বাস্থ্যের পুনঃরুদ্ধার হয় না। রোগ লক্ষণসমূহ চাপা পড়ে এবং উপশমের রোগী সাময়িকভাবে আরাম বোধ করে।

(৩০) প্রকৃত স্বাস্থ্য সংরক্ষক/আদর্শ চিকিৎসক

প্রকৃত স্বাস্থ্য সংরক্ষক/আদর্শ চিকিৎসক ঃ মানব স্বাস্থ্য বিকৃত করে রোগ উৎপাদনকারী অবস্থা সমূদয়কে অপসারিত করে মানুষকে সুস্থ রাখার উপায় যিনি অবগত আছেন, তিনিই স্বাস্থ্য-সংরক্ষক। অর্থাৎ যিনি ডাঃ হ্যানিম্যানের অর্গানন অব মেডিসিনের ৩নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত রোগ সম্বন্ধে জ্ঞান, ঔষধ সম্বন্ধে জ্ঞান, ঔষধ প্রয়োগ সম্বন্ধে জ্ঞান, ঔষধের মাত্র ও শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান এবং আরোগ্য পথে বাধা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকে, তাঁকে প্রকৃত স্বাস্থ্য সংরক্ষক/ আদর্শ চিকিৎসক বলা হয়।

(৩১) চিহ্ন ও লক্ষণ ০৯

চিহ্ন ও লক্ষণ ঃ

লক্ষণ ঃ রোগী যখন চিকিৎসকের নিকট নিজের রোগ সম্পর্কে বর্ণনা দেন সেগুলোকে লক্ষণ বলে। অনেক লক্ষণ শুধু রোগীই অনুভব করতে পারেন, অন্যরা অনুভব করতে পারে না। যেমন- মাথাব্যথা। ইহা অদৃশ্যমান অবস্থায় থাকতে পারে।

চিহ্ন ঃ চিকিৎসক রোগীকে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা রোগ সম্পর্কে যা জানতে পারেন তাই চিহ্ন। চিহ্নসমূহ রোগী ও চিকিৎসক উভয়ই চিহ্নিত করতে পারেন। যেমন- রক্তবমি। চিহ্ন দৃশ্যমান হয়ে থাকে।

ডাঃ জে. এম. নুরুল হক প্রণীত-

আল নূর হোমিওপ্যাথিক পাবলিকেশন্স এর বই সমূহ ঃ

❑ প্রথম বর্ষ

- ❖ প্রিন্সিপলস অব হোমিওপ্যাথি
- ❖ অর্গাননন অব মেডিসিন
- ❖ মেটেরিয়া মেডিকা
- ❖ ফিজিক্স এন্ড কেমিস্ট্রি
- ❖ বায়োলজি

❑ দ্বিতীয় বর্ষ

- ❖ অর্গাননন অব মেডিসিন
- ❖ মেটেরিয়া মেডিকা ও টিস্যু রেমেডিস
- ❖ হোমিওপ্যাথিক ফার্মেসী ও ফার্মাকোপিয়া
- ❖ হাইজিন এন্ড পাবলিক হেলথ
- ❖ এনাটমী
- ❖ ফিজিওলজি

❑ তৃতীয় বর্ষ

- ❖ অর্গাননন অব মেডিসিন
- ❖ মেটেরিয়া মেডিকা
- ❖ হোমিওপ্যাথিক ফিলোসফি
- ❖ প্র্যাকটিস অব মেডিসিন
- ❖ অবস্ট্রেটিকস এন্ড গাইনোকোলজি
- ❖ প্যাথলজি

❑ চতুর্থ বর্ষ

- ❖ মেটেরিয়া মেডিকা
- ❖ ক্রনিক ডিজিজ
- ❖ কেইস টেকিং এন্ড রেপার্টরী
- ❖ প্র্যাকটিস অব মেডিসিন
- ❖ ফরেনসিক মেডিসিক (চিকিৎসা আইন)
- ❖ সার্জারী